সৈয়দ মুজতবা আলী

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৯

প্রকাশক —ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক —রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদশিল্পী—শচীন বিশ্বাস

ছয় টাকা

নিবেদন

সৈয়দ মুজতবা আলী সিদ্ধ-লেখনী হাতে নিয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এসেছেন। ভ্রমণ-কথা উপন্যাস ছোটগল্প সাহিত্য-নিবন্ধ রম্য-রচনা কবিতা—সর্বক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস রমণীয় বিচরণ। সমাজ-সমস্যা দার্শনিকতত্ত্ব এমন কি রাজনীতিও তাঁর অনধিগম্য নয়। বৈদগ্ধ্য আশ্চর্যরূপ সরস ও লঘুপাচ্য করে তিনি পরিবেশন করেন। যা-কিছু ধরেন, লেখনী-মুখে সোনা হয়ে ফুটে ওঠে।

পৃথিবীর অগণ্য জাতি, অজস্র জীবন-ধারা, অসংখ্য সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা। লেখা পড়ে মনে হয়, পৃথিবী বিচরণ করে এলাম। কৌতুকের সঙ্গে অপরূপ বুদ্ধি-প্রদীপ্তি মিশে তাঁর প্রতিটি লেখা জীবন্ত ও মহিমময়। স্টাইল একেবারে তাঁর নিজস্ব, বিষয়-বৈচিত্র্যের তুলনা নেই। বঙ্গ-সাহিত্যের দিগন্ত তাঁর সাধনায় দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

ডক্টর আলীর লেখা-সংকলন অতিশয় দুরূহ কর্ম। যে লেখাটাই পড়ি, নিয়ে নিতে লোভ হয়। কিন্তু গ্রন্থের আয়তন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে হবে। সর্বক্ষণ রক্তচক্ষু উদ্যত করে লোভকে শাসন করতে হয়েছে। তবু মনে করি, জাদুকর লেখক ডক্টর আলীর সামগ্রিক রূপ সংকলনের মধ্যে মোটামুটি পাওয়া যাবে। এতাবৎ প্রকাশিত তাঁর সমস্ত সাহিত্যকৃতী মন্থন করে এই অমৃত-সংগ্রহ। বইয়ে ছাপা হয়নি, এমন লেখাও কিছু কিছু আছে।

প্রকাশক

ভ্রমণ-কথা

যাত্রা ২

কাবুলে বাচ্চায়ে সকাও ৭

কাইরোয় প্রবেশ ১৮

হাইকিং ২৯

উপন্যাস ও ছোটগল্প

অবিশ্বাস্য ৪৬

শব্‌নম্‌ ৮০

'ভেন্দেত্তা' ১০১

কর্নেল ১১০

নবাব-জাদী ১২৫

স্বপ্‌ ১৪১

রম্যরচনা

রসগোল্লা ১৫৪

বেদে ১৬৬

পুলিনবিহারী ১৭০

'কলচর' ১৭৪

বড়দিন ১৭৮

নেভার বাধা ১৮২

সাহিত্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ১৮৮

নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম ২০৭

কবিতা

মার্জারনিধন কাব্য ২২৮

ইন্দ্রলুপ্ত ২৩৪

নন্দলালের দেয়াল-ছবি ২৩৭

ইরানের অত্যধিক আদবকায়দা ২৩৯

ক্রিকেট ২৪০

নববর্ষ, ১৩৬৮ ২৪২

প্রবাসীর চিঠি ২৪৪

কবিগুরুর তিন প্রখ্যাত শিষ্য

শ্রীযুত পুলিনবিহারী সেন
শ্রীযুত কানাইলাল সরকার
শ্রীযুত সাগরময় ঘোষ

—অখ্যাত শিষ্য

ভ্রমণ-কথা

যাত্রা

কাবুলে বাচ্চায়ে সকাও

কাইরোয় প্রবেশ

হাইকিং

যাত্রা

চাঁদনী থেকে ন'সিকে দিয়ে একটা শর্ট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালীর জন্য ইয়োরোপীয়ন থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আনাগোনা করত।

হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিঙ্গী হেঁকে বলল, 'এটা ইয়োরোপীয়নদের জন্য।'

আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, 'ইয়োরোপীয়ন তো কেউ নেই, চল, তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।'

এক তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, 'বাঙলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরিজী শব্দের প্রাগ্দেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবী ইংরিজী হয়।' অর্থাৎ পয়লা সিলেব্‌লে অ্যাকসেণ্ট দেওয়া খারাপ রান্নায় লঙ্কা ঠেসে দেওয়ার মত—সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাঙলায় এরি নাম গাঁক গাঁক করে ইংরিজী বলা। ফিরিঙ্গী তালতলার নেটিব, কাজেই আমার ইংরিজী শুনে ভারি খুশী হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল। কুলিকে ধমক দেবার ভার ওরি কাঁধে ছেড়ে দিলুম। ওদের বাপখুড়ো মাসীপিসী রেলে কাজ করে—কুলি শায়েস্তায় ওরা ওয়াকিফহাল।

কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ক্রমেই চুবসে আসছিল। এতদিন পাসপোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলুম, অন্য কিছু ভাববার ফুরসৎ পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয় হল সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনোচিত—মনে হল, আমি একা।

ফিরিঙ্গীটি লোক ভাল। আমাকে গুম হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, 'এত মনমরা হলে কেন? গোয়িঙ ফার?'

দেখলুম বিলিতি কায়দা জানে। 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ'? বলল না। আমি যেটুকু বিলিতি ভদ্রস্থতা শিখেছি তার চোদ্দ আনা এক পাদরী সায়েবের কাছ থেকে। সায়েব বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, 'গোয়িঙ ফার?' বললে বাধে না, কারণ উত্তর দেবার ইচ্ছা না থাকলে 'ইয়েস' 'নো' যা খুশী বলতে পার—দুটোর যে কোনো একটাতেই উত্তর দেওয়া হয়ে যায়, আর ইচ্ছে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ' যেন ইলিসিয়াম রো'র প্রশ্ন—ফাঁকি দেবার জো নেই। তাই তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যায়।

তা সে যাই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারি আরম্ভ হল। তাতে লাভও হল। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে প্রকাণ্ড এক চুবড়ি খুলে বলল, তার 'ফিয়াঁসে' নাকি উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরী করে সঙ্গে দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরাদস্তুর পলটন পোষা যায়। আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে আমিও কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে নিতান্ত নেটিব বস্তু, হয়ত বড্ড বেশী ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর স্থির হল সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে ব্রাদারলি ডিভিশন করে আ লা কার্ত ভোজন, যার যা খুশী খাবে।

সায়েব যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল আমার চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জমে যেতে লাগল। সেই শিককাবাব, সেই ঢাকাই পরোটা, মুরগী-মুসল্লম, আলু-গোস্ত। আমিও তাই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে। এবার সায়েবের চক্ষুস্থির হওয়ার পালা। ফিরিস্তি মিলিয়ে একই মাল বেরতে লাগল। এমন কি শিককাবাবের জায়গায় শামীকাবাব নয়, আলু-গোস্তের বদলে কপি-গোস্ত পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, 'ব্রাদার, আমার ফিয়াঁসে নেই, এসব জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে কেনা।'

একদম হুবহু একই স্বাদ। সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায়। আমারও আবছা আবছা মনে পড়ল,

যখন সওদা করছিলুম তখন যেন এক গাব্দাগোব্দা ফিরিঙ্গী মেমকে হোটেলে যা পাওয়া যায় তাই কিনতে দেখেছি। ফিরিঙ্গীকে বলতে যাচ্ছিলুম তার ফিয়াঁসের একটা বর্ণনা দিতে কিন্তু থেমে গেলুম। কি আর হবে বেচারীর সন্দেহ বাড়িয়ে—তার উপর দেখি বোতল থেকে কড়া গন্ধের কি একটা ঢকঢক করে মাঝে মাঝে গিলছে। বলা তো যায় না, ফিরিঙ্গীর বাচ্চা—কখন রঙ বদলায়।

রাত ঘনিয়ে এল। খিদে ছিল না বলে পেট ভরে খাইনি, তাই ঘুম পাচ্ছিল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি কাকজ্যোৎস্না। তবুও স্পষ্ট চোখে পড়ে এ বাঙলা দেশ নয়। সুপারি গাছ নেই, আম জামে ঘেরা ঠাসবুনুনির গ্রাম নেই, আছে শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া ঘরবাড়ি এখানে সেখানে। উঁচু পাড়িওয়ালা ইঁদারা থেকে তখনো জল তোলা চলছে—পুকুরের সন্ধান নেই। বাঙলা দেশের সোঁদা সোঁদা গন্ধ অনেকক্ষণ হল বন্ধ—দমকা হাওয়ায় পোড়া ধূলো মাঝে মাঝে চড়াৎ করে যেন থাবড়া মেরে যায়। এই আধা আলো অন্ধকারে যদি এদেশ এত কর্কশ তবে দিনের বেলা এর চেহারা না জানি কি রকম হবে। এই পশ্চিম, এই সুজলা সুফলা ভারতবর্ষ? না, তা তো নয়। বঙ্কিম যখন সপ্তকোটি কণ্ঠের উল্লেখ করেছেন তখন সুজলা-সুফলা শুধু বাঙলা দেশের জন্যই। ত্রিংশ কোটি বলে শুকনো পশ্চিমকে ঠাট্টামস্করা করা কাষ্ঠরসিকতা। হঠাৎ দেখি পাড়ার হরেন ঘোষ দাঁড়িয়ে। এঁ্যা? হাঁ! হরেনই তো! কি করে? মানে? আবার গাইছে 'ত্রিংশ কোটি, ত্রিংশ কোটি, কোটি, কোটি—'

নাঃ, এতো চেকার সায়েব। টিকিট চেক করতে এসেছে। 'কোটি কোটি' নয়, 'টিকিট টিকিট' বলে চেঁচাচ্ছে। থার্ড ক্লাশ—ইয়োরোপীয়ন হলে কি হবে। রাত তেরটার সময় ঘুম ভাঙিয়ে টিকিট চেক না করলে ও যে নিজেই ঘুমিয়ে পড়বে। ধড়মড় করে জেগে দেখি গাড়ির চেহারা বদলে গিয়েছে। 'ইয়োরোপীয়ন

কম্পার্টমেন্ট’ দিশী বেশ ধারণ করেছে—বাক্স তোরঙ্গ প্যাটরা চাঙারি চতুর্দিকে ছড়ানো। ফিরিঙ্গী কখন কোথায় নেবে গিয়েছে টের পাইনি। তার খাবারের চাঙারিটা রেখে গিয়েছে—এক টুকরো চিরকুট লাগানো, তাতে লেখা ‘গুড লাক ফর দি লঙ জার্নি।’

ফিরিঙ্গী হোক, সায়েব হোক, তবু তো কলকাতার লোক—তালতলার লোক। ঐ তালতলাতেই ইরানী হোটেলে কতদিন খেয়েছি, হিন্দু বন্ধুদের মোগলাই খানার কায়দাকানুন শিখিয়েছি, স্কোয়ারের পুকুরপাড়ে বসে সাঁতার কাটা দেখেছি, গোরা সেপাই আর ফিরিঙ্গীতে মেম সায়েব নিয়ে হাতাহাতিতে হাততালি দিয়েছি।

আর বাড়িয়ে বলব না। এই তালতলারই আমার এক দার্শনিক বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে এমেটিন ইনজেকশন নিলে মানুষ নাকি হঠাৎ অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যায়, ইংরিজীতে যাকে বলে ‘মডলিন’—তখন নাকি পাশের বাড়ির বিড়াল মারা গেলে মানুষ বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বিদেশে যাওয়া আর এমেটিন ইনজেকশন নেওয়া প্রায় একই জিনিষ। কিন্তু উপস্থিত সে গবেষণা থাক্—ভবিষ্যতে যে তার বিস্তর যোগাযোগ হবে সে বিষযে কোনো সন্দেহ নেই।

ভোর কোথায় হল মনে নেই। জুন মাসের গরম পশ্চিমে গৌরচন্দ্রিকা করে নামে না। সাতটা বাজতে না বাজতেই চড়চড় করে টেরচা হয়ে গাড়িতে ঢোকে আর বাকি দিনটা কি রকম করে কাটবে তার আভাস তখনই দিয়ে দেয়। শুনেছি পশ্চিমের ওস্তাদরা নাকি বিলম্বিত একতালে বেশীক্ষণ গান গাওয়া পছন্দ করেন না, দ্রুত তেতালেই তাঁদের কালোয়াতি দেখানোর শখ। আরো শুনেছি যে আমাদের দেশের রাগরাগিণী নাকি প্রহর আর ঋতুর বাছবিচার করে গাওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে পশ্চিমের সকাল বেলাকার রোদ্দুর বিলম্বিত আর বাদবাকি দিন দ্রুত।

গাড়ি যেন কালোয়াৎ। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, কোনো গতিকে রোদ্দুরের তবলচীকে হার মানিয়ে যেন কোথাও গিয়ে ঠাণ্ডায় জিরোবে। আর রোদ্দুরও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক ঊর্ধ্বশ্বাসে। সে পাল্লায় প্যাসেঞ্জারদের প্রাণ যায়। ইস্টিশানে ইস্টিশানে সম। কিন্তু গাড়ি থেকেই দেখতে পাই রোদ্দুর প্ল্যাটফর্মের ছাওয়ার বাইরে আড়নয়নে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে—বাঘা তবলচী যে রকম দুই গানের মাঝখানে বাঁয়া-তবলার পিছনে ঘাপটি মেরে চাটিম চাটিম বোল তোলে আর বাঁকা নয়নে ওস্তাদের পানে তাকায়।

কখন খেয়েছি, কখন ঘুমিয়েছি, কোন্ কোন্ ইস্টিশান গেল, কে গেল না তার হিসেব রাখিনি। সে গরমে নেশা ছিল, তা না হলে কবিতা লিখব কেন? বিবেচনা করুন—

দেখিলাম পোড়া মাঠ। যতদূর দিগন্তের পানে
দৃষ্টি যায়— দগ্ধ, ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা। শান্তি নাহি প্রাণে
ধরিত্রীর কোনোখানে। সবিতার ক্রুদ্ধ অগ্নিদৃষ্টি
বর্ষিছে নির্মম বেগে। গুমরি উঠিছে সর্বসৃষ্টি
অরণ্য পর্বত জনপদে। যমুনার শুষ্ক বক্ষ
এ তীর ও তীর ব্যাপী— শুষিয়াছে কোন ক্রূর যক্ষ
তার স্নিগ্ধ মাতৃরস। হাহাকার উঠে সর্বনাশা
চরাচরে। মনে হয় নাই নাই নাই কোনো আশা
এ মরুরে প্রাণ দিতে সুধা-সিক্ত শ্যামলিম ধারে।
বৃত্রের জিঘাংসা আজ পর্জন্যের সর্বশক্তি কাড়ে
বাসব আসবরিক্ত। ধরণীর শুষ্ক স্তনতৃণে
প্রেতযোনি গাভী, বৎস হৃত-আশ ক্লান্ত টেনে টেনে।

কী কবিতা! পশ্চিমের মাঠের চেয়েও নীরস কর্কশ। গুরুদেব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এ-পদ্য ছাপানো হয়নি। গুরুশাপ ব্রহ্মশাপ।

[দেশে বিদেশে]

কাবুলে বাচ্চায়ে সকাও

বেলা তখন চারটে হবে। দোস্ত মুহম্মদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি রাস্তায় তুমুল কাণ্ড। দোকানীরা দুদ্দাড় করে দরজাজানলা বন্ধ করছে, লোকজন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করছে, চতুর্দিকে চিৎকার, 'ও ভাই কোথায় গেলি,' 'ও মামা শিগগির এসো।' লোকজনের ভিড়ের উপর দিয়ে টাঙাওয়ালারা খালি গাড়ি, বোঝাই গাড়ি এমনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চালিয়েছে যে, আমার চোখের সামনে একখানা গাড়ি হুড়মুড়িয়ে কাবুল নদীর বরফের উপর গিয়ে পড়ল, কেউ ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

সব কিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কানে চিৎকার পৌঁছয়, 'বাচ্চায়ে সকাও আসছে, বাচ্চায়ে সকাও এসে পড়ল।' এমন সময় গুড়ুম করে রাইফেলের শব্দ হল। লক্ষ্য করলুম শব্দটা শহরের উত্তর দিক থেকে এল। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য জনতা যেন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল। যাদের হাতে কাঁধে বোঁচকা-বুঁচকি ছিল তারা সেগুলো ফেলে দিয়ে ছুটল, একদল রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে নেমে গেছে, অন্য দল কাবুল নদীতে জমে-যাওয়া জলের উপর ছুটতে গিয়ে বারে বারে পিছলে পড়ছে। রাস্তার পাশে যে অন্ধ ভিখারী বসত সে দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে, ভিড়ের ঠেলায় এদিক ওদিক টাল খাচ্ছে আর দু' হাত শূন্যে তুলে সেখানে যেন পথ খুঁজছে।

আমি কোনো গতিকে রাস্তা থেকে নেমে, নয়ানজুলি পেরিয়ে এক দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। স্থির করলুম, বিদ্রোহ বিপ্লবের সময় পাগলা ঘোড়ার চাট খেয়ে অথবা ভিড়ের চাপে দম বন্ধ হয়ে মরব না; মরতে হয় মরব আমার হিস্যার গুলি খেয়ে।

এক মিনিট যেতে না যেতে আরেক ব্যক্তি এসে জুটলেন।

ইনি ইটালিয়ান 'কলোনেল্লো' অর্থাৎ কর্নেল। বয়স ষাটের কাছাকাছি, লম্বা করোগেটেড দাড়ি।

এই প্রথম লোক পেলুম যাকে ধীরেসুস্থে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়। বললুম, 'আমি তো শুনেছিলুম ডাকাত-সর্দার বাচ্চায়ে সকাও আসবে আমান উল্লার হয়ে শিনওয়ারীদের সঙ্গে লড়বার জন্য। কিন্তু এ কী কাণ্ড?'

কলোনেল্লো বললেন, 'মনে হচ্ছে ভুল খবর। এ তো আসছে শহর দখল করবার জন্য।'

তাই যদি হয় তবে আমান উল্লার সৈন্যেরা এখনো শহরের উত্তরের দিকে যাচ্ছে না কেন, এ রকম অতর্কিতে বাচ্চায়ে সকাও এসে পৌঁছলই বা কি করে, তার দলে কি পরিমাণ লোকজন, শুধু বন্দুক না কামান-টামান তাদের সঙ্গে আছে— এ সব অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর কলোনেল্লো দিতে পারলেন না। মাঝে মাঝে শুধু বলেন, 'কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!'

আমি বললুম, 'সাধারণ কাবুলী যে ভয় পেয়েছে সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ইয়োরোপীয়ানরা এদের সঙ্গে জুটল কেন? এরা যাচ্ছে কোথায়?'

কলোনেল্লো বললেন, 'আপন আপন রাজদূতাবাসে আশ্রয়ের সন্ধানে।'

ততক্ষণে বন্দুকের আওয়াজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে— ভিড়ও দেখলুম ঢেউয়ে ঢেউয়ে যাচ্ছে, একটানা স্রোতের মত নয়। দুই ঢেউয়ের মাঝখানে আমি কলোনেল্লোকে বললুম, 'চলুন বাড়ি যাই।' তিনি বললেন যে, শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি বাড়ি যাবেন না। মিলিটারি খেয়াল, তর্ক করা বৃথা।

বাড়ির দোরের গোড়ায় দেখি আবদুর রহমান। আমাকে দেখে তার দুশ্চিন্তা কেটে গেল। বাড়ি ঢুকতেই সে সদর দরজা বন্ধ করে তার গায়ে এক গাদা ভারী ভারী পাথর চাপাল। বিচক্ষণ লোক,

ইতিমধ্যে দুর্গ রক্ষা করার যে বন্দোবস্তের প্রয়োজন সেটুকু সে করে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বেনওয়া সায়েব কোথায়?' বলল, তিনি মাত্র একটি সুটকেশ নিয়ে টাঙ্গায় করে ফ্রেঞ্চ লিগেশনে চলে গিয়েছেন।

ততক্ষণে বন্দুকের শব্দের সঙ্গে মেশিনগানের একটানা ক্যাট্‌ক্যাট্ যোগ দিয়েছে। আবদুর রহমান চা নিয়ে এসেছিল। কান পেতে শুনে বলল, 'বাদশার সৈন্যেরা গুলি আরম্ভ করেছে। বাচ্চা মেশিনগান পাবে কোথায়?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'বাদশার সৈন্যরা কি এতক্ষণে বাচ্চার মুখোমুখি হল? তবে কি সে বিনা বাধায় কাবুলে পৌঁছল?'

আবদুর রহমান বলল, 'দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেককেই তো জিজ্ঞেস করলুম, কেউ কিছু বলতে পারল না। বোধ হচ্ছে বাচ্চা বিনা বাধায়ই এসেছে। ওর দেশ হল কাবুলের উত্তর দিকে, আমার দেশ পানশির— তারও উত্তরে। ওদিকে কোন বাদশাহী সৈন্যের আনাগোনা হলে আমি দেশের লোকের কাছে থেকে বাজারে খবর পেতুম। বাদশাহী সৈন্যের সবাই তো এখন পুব দিকে শিনওয়ারীদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছে— আলী আহমদ খানের তাঁবেতে।'

গোলাগুলি চলল। সন্ধ্যা হল। আবদুর রহমান আমাকে তাড়াতাড়ি খাইয়েদাইয়ে আগুনের তদারকিতে বসল। তার চোখমুখ থেকে আন্দাজ করলুম, সে কাবুলীদের মত ভয় পায়নি। কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলুম, বাচ্চা যদি জেতে তবে লুটতরাজ নিশ্চয় হবে এবং তাই নিয়ে আমার মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে সে ঈষৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু এ সব ছাপিয়ে উঠছে তার কৌতূহল আর উত্তেজনা— শহরে সার্কাস ঢুকলে ছেলেপিলেদের যে রকম হয়।

কিন্তু এই বাচ্চায়ে সকাওটি কে? আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করতে হল না, সে নিজের থেকেই অনেক কিছু বলল এবং তার

থেকে বুঝলুম যে, আবদুর রহমান বরফের জহুরী, ফ্রস্ট-বাইটের ওঝা, রন্ধনে ভীমসেন, ইন্ধনে নলরাজ, সব কিছুতেই হতে পারেন, কিন্তু বসওয়েল হতে এখনো তার ঢের দেরী। বাচ্চায়ে সকাও সম্বন্ধে সে যা বলল তার উপরে উত্তম রবিন হুড খাড়া করা যায়, কিন্তু সে বস্তু জলজ্যান্ত মানুষের জীবনী বলে চালানো অসম্ভব।

চৌদ্দ আনা বাদ দেওয়ার পরও যেটুকু রইল তার থেকে বাচ্চার জীবনের এইটুকু পরিচয় পাওয়া গেল যে, সে প্রায় শ'তিনেক ডাকাতের সর্দার, বাসস্থান কাবুলের উত্তরদিকে কুহিস্তানে, ধনীকে লুটে গরীবকে পয়সা বিলোয়, আমান উল্লা যখন ইউরোপে ছিলেন তার পরাক্রম তখন এমনি বেড়ে গিয়েছিল যে, কাবুল-কুহিস্তানের পণ্য-বাহিনীর কাছ থেকে সে রীতিমত ট্যাক্স আদায় করত। আমান উল্লা ফিরে এসে কুহিস্তানের হাটে-বাজারে নোটিশ লাগান, "ডাকাত বাচ্চায়ে সকাওয়ের মাথা চাই, পুরস্কার পাঁচ শ' টাকা"; বাচ্চা সেগুলো সরিয়ে পাল্টা নোটিশ লাগায়, "কাফির আমান উল্লার মাথা চাই, পুরস্কার এক হাজার টাকা"।

আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করল, 'কর্নেলের ছেলে আমাকে শুধালো যে আমি যদি আমান উল্লার মুণ্ডুটা কাটি, আর আমার ভাই যদি বাচ্চায়ে সকাওয়ের মুণ্ডুটা কাটে তবে আমরা দু'জনে মিলে কত টাকা পাব।' আমি বললুম, 'দেড় হাজার টাকা।' সে হেসে লুটোপুটি; বলল, 'এক পয়সাও নাকি পাব না। বুঝিয়ে বলুন তো, হুজুর, কেন পাব না?'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'কেউ জ্যান্ত নেই বলে তোমাদের টাকাটা মারা যাবে বটে, কিন্তু কর্নেলের ছেলেকে বলো যে তখন আফগানিস্থানের তখ্‌ৎ তোমাদের পরিবারে যাবে।'

আরো শুনলুম, বাচ্চায়ে সকাও নাকি দিন দশেক আগে হঠাৎ জবলুস্‌-সিরাজের সহকারী বড় কর্তার কাছে উপস্থিত হয়ে কোরান ছুঁয়ে কসম খেয়েছিল যে, সে আমান উল্লার হয়ে শিনওয়ারীদের

সঙ্গে লড়বে এবং সেই কসমের জোরে শ'খানেক রাইফেল তাঁর কাছ থেকে বাগিয়ে নিয়ে ফের উধাও হয়ে গিয়েছিল।

তবে কি সেই বন্দুকগুলো নিয়েই বাচ্চার দল আমান উল্লাকে আক্রমণ করেছে? আশ্চর্য হবার কি আছে? আমান উল্লা যখন উপজাতিদের কাছ থেকে তোলা ট্যাক্সের পয়সায় ফৌজ পুষে তাদের কাবুতে রাখেন তখন বাচ্চাই বা আমান উল্লার কাছ থেকে বন্দুক বাগিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবে না কেন?

রাত তখন বারোটা। আবদুর রহমান বলল, 'আজ আমি আপনার বসবার ঘরে শোব।'

আমি বললুম, 'তুমি তো ঠাণ্ডা ঘর না হলে ঘুমোতে পারো না। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাকে এত দুর্ভাবনা করতে হবে না।'

আবদুর রহমান বলল, 'কিন্তু আমি অন্য ঘরে শুলে আমার বিপদ-আপদের খবর আপনি পাবেন কি করে? আমার জান বাবা আপনার হাতে সঁপে দিয়ে যাননি?'

কথাটা সত্যি। আবদুর রহমান আমার চাকরীতে ঢুকেছে খবর পেয়ে তার বুড়া বাপ গাঁ থেকে এসে আমাকে তার জানের মালিক, স্বভাবচরিত্রের তদারকদার এবং চটে গেলে খুন করবার হক দিয়ে গিয়েছিল। আমি বুড়াকে খুশী করবার জন্য 'সিংহ ও মুষিকের' গল্প বলেছিলুম।

কিন্তু আবদুর রহমানের ফন্দিটা দেখে অবাক হলুম। সাক্ষাৎ নিউটন। এদিকে বাক্সে দুটো ফুটো করে দুটো বেরালের জন্য, অন্য দিকে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বও আবিষ্কার করতে পারে— একদিকে কর্নেলের ছেলের ধাঁধায় বোকা বনে যায়, অন্য দিকে তর্কে বাঙালীকেও কাবু করে আনে।

আবদুর রহমান শুয়ে শুয়ে 'কতলে-আম্' অর্থাৎ পাইকারী খুন-খারাবি লুটতরাজের যে বর্ণনা দিল তার থেকে বুঝলুম বাচ্চায়ে সকাও যদি শহর দখল করতে পারে তবে তার কোনোটাই বাদ

যাবে না। চেঙ্গিস, নাদির রাজা-বাদশা হয়ে যখন এ সব করতে পেরেছেন তখন বাচ্চা ডাকাত হয়ে এ সব করবে না সে আশা দিদিমার রূপকথাতেও করা যায় না।

ইরান আফগানিস্থান চীন প্রভৃতি সভ্য দেশে সাজা দেওয়ার নানারকম বিদগ্ধ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া, কোমর অবধি মাটিতে পুঁতে চতুর্দিক থেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে মারা, পেট কেটে চোখের সামনে নাড়িভুঁড়ি বের করে মারা, জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া তুলে মারা ইত্যাদি বহুতর কায়দায় অনেক চাক্ষুষ বর্ণনা আমি শুনেছি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে লম্বা পেরেক দিয়ে দু'কান দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া। আবদুর রহমানের কাছ থেকে শোনা, সে অবস্থায়ও নাকি মানুষের ঘুম পায় আর মাথা বার বার ঝুলে পড়ে। তার তুলনায় রাইফেল-মেশিন গানের শব্দ, আর চেঙ্গিস নাদিরের কাহিনীস্মরণ ধূলি পরিমাণ। কাজেই সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়াটা বীর অথবা কাপুরুষ কোনো কিছুরই লক্ষণ নয়।

সকালবেলা দেউড়ি খুলে দেখি শহরে মেলার ভিড়। কাবুল শহরের আশেপাশের গাঁ থেকে নানা রকম লোক এসে জড়ো হয়েছে, সুযোগসুবিধে পেলে লুটে যোগ দেবে বলে। অনেকের কাঁধেই বন্দুক, শীতের ভারী ভারী জামার ভিতর যে ছোরা পিস্তলও আছে সেটাও অনায়াসে বোঝা গেল। আবদুর রহমানের বাধা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটার তদারকতদন্ত করবার জন্য।

আর্ক কাবুল শহরের ভিতরকার বড় দুর্গ— হুমায়ুনের জন্ম এই আর্কের ভিতরেই হয়েছিল। আর্ক থেকে বড় রাস্তা বেরিয়ে এসে কাবুল নদীর পারে ঠেকেছে তাকেই কাবুলের চৌরঙ্গী বলা যেতে পারে। সেখানে দেখি একটা বড় রকমের ভিড় জমেছে। কাছে গিয়ে বুঝলুম কোনো এক বড় রাজকর্মচারী— অফিসারও হতে

পারেন— কাবুল শহরের লোকজনকে বাচ্চার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সলা-মন্ত্রণা দিচ্ছেন।

"ওজার্ম সিতোআইয়াঁ"— "ধরো হাতিয়ার, ফ্রান্সের লোক, বাঁধো দল, বাঁধো দল" ধরনের ওজস্বিনী ফরাসিনী বক্তৃতা নয়— ভদ্রলোকের মুখ শুকনো, ফ্যাকাসে ঠোঁট কাঁপছে আর বিড় বিড় করে যা বলছেন দশ হাত দূর থেকে তা শোনা যাচ্ছে না।

টিমের কাপ্তান যে রকম প্র্যাক্‌টিসের পূর্বে আঁটা আঁটা হকিস্টিক বিলোয় তেমনি গাদা গাদা দামী দামী ঝকঝকে রাইফেল বিলোনো হচ্ছে। বলা নেই কওয়া নেই, যার যা ইচ্ছে এক একখানা রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। শুধু লক্ষ্য করলুম উত্তর দিকে কেউই গেল না— অথচ লড়াই হচ্ছে সেই দিকেই।

রাইফেল বিলোনো শেষ হতেই ভদ্রলোক তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন। বিপজ্জনক অবশ্য কর্তব্য কর্ম অর্ধসমাধান করে মানুষ যে রকম তড়িঘড়ি অকুস্থান থেকে সরে পড়ে। তখন চোখে পড়ল তার পরনে পাজামা-কুর্তা-জুব্বা-পাগড়ি— দেরেশি নয়। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখি কারো পরনেই দেরেশি নয়, আর সকলের মাথায়ই পাগড়ি। আমার পরনে সুট, মাথায় হ্যাট— অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

এমন সময় দেখি ভিড় ঠেলে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছেন মীর আসলম। কোনো কথা না কয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চললেন— আমার কোনো প্রশ্নের উত্তরে মুখ না খুলে, কোনো কথায় কান না দিয়ে। বাড়ি পৌঁছতেই আমাদের দুজনকে দেখে আবদুর রহমান কি একটা বলে তিন লম্ফে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোল।

মীর আসলম আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন। এ কি তামাশা দেখার সময়, না ইয়ার্কি করে ঘুরে বেড়াবার মোকা। তাও আবার দেরেশি পরে।

আমি শুধু বললুম, 'কি করে জানব বলুন যে, দেরেশি পরার আইন মকুব হয়ে গিয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'মকুব বাতিলের প্রশ্ন এখন কে শুধায় বাপু! যে কোনো মুহূর্তে বাচ্চায়ে সকাও শহরে ঢুকতে পারে। কাবুলীরা তাই দেরেশি ফেলে ফের 'মুসলমান' হয়েছে। দেখলে না ইস্তেক সর্দার— খান জোব্বা পরে রাইফেল বিলোলেন?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি কথা, রাজপরিবার পর্যন্ত ভয় পেয়ে দেরেশি ছেড়েছেন?'

মীর আসলম বললেন, 'উপায় কি বলো? বাদশাহী ফৌজ থেকে সৈন্যেরা সব পালিয়েছে। এখন আমান উল্লার একমাত্র ভরসা যদি কাবুল শহরের লোক রাইফেল বন্দুক নিয়ে বাচ্চাকে ঠেকাতে পারে। তাদের খুশী. করার জন্য দেরেশি বর্জন করা হয়েছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন রাজধানীর সৈন্যেরা কখনো বিদ্রোহ করে না।'

'বিদ্রোহ তারা করেনি। তারা সব পালিয়েছে। যাদের বাড়ি বহু দূরে, বরফ ভেঙে এখন যে সব জায়গায় পৌঁছনো যায় না, তারা এখনো শহরে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। যারা নিতান্ত গা-ঢাকাও দিতে পারেনি, তারাই লড়তে গেছে, অন্ততঃ আমান উল্লার বিশ্বাস তাই। আসলে তারা দেহ্-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে বসে চন্দ্রসূর্য তাগ করে গুলি ছুঁড়ছে। বাচ্চাকে এখনো ঠেকিয়ে রেখেছে আমান উল্লার দেহরক্ষী খাস সৈন্যদল।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'কিন্তু মৌলানার বাসা তো দেহ্-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে। চলুন, তাঁর খবর নিয়ে আসি।'

মীর আসলম বললেন, 'শান্ত হও। আমি সকালে সে দিকেই গিয়েছিলুম, কিন্তু মৌলানার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি। সেখানে লড়াই হচ্ছে। আমি মোল্লা মানুষ— কাবুল শহর

আমাকে চেনে। আমি যখন সেখানে পৌঁছতে পারিনি, তুমি যাবে কি করে?'

এ সংবাদ শুনে আমার মন থেকে অন্য সব প্রশ্ন মুছে গেল। চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কিছু করবার উপায় আছে কি না। মীর আসলম আমাকে বাড়ি থেকে বেরতে পই পই করে বারণ করে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে আবদুর রহমান একখানা নূতন রাইফেল নিয়ে উপস্থিত। চোখে মুখে খুশী উপচে পড়ছে। বলল, 'হুজুর, চট করে একখানা কাগজে লিখে দিন আপনার রাইফেল নেই। আমি আরেকটা নিয়ে আসি।' আমি তখন মৌলানার কথা ভাবছি— আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আবদুর রহমান চলে গেল।

লুটপাট আরম্ভ হয়নি সত্য, কিন্তু হতে কতক্ষণ? সকাল বেলা যখন বেরিয়েছিলুম তখন কোথাও কোনো পুলিস দেখতে পাইনি। রাজার দেহরক্ষীরা পর্যন্ত বাচ্চাকে ঠেকাতে গিয়েছে, এখন শহর রক্ষা করবে কে? আর এ-পরিস্থিতি আফগান ইতিহাসে কিছু অভিনব বস্তু নয়। বাবুর বাদশাহ তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন, কাবুল শহরে কোনো প্রকার অশান্তির উদ্ভব হলেই আশপাশের চোর-ডাকাত শহরের আনাচেকানাচে শিকারের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করত। মীর আসলম আবার আরেকটা সুখবর দিলেন যে, বাবুরের আমলে কাবুল আজকের চেয়ে অনেক বেশী সভ্য ছিল। অসম্ভব নয়, কারণ বাবুর লিখেছেন অশান্তির পূর্বাভাস দেখতে পেলেই তিনি রাস্তায় রাস্তায় সেপাই মোতায়েন করতেন; আমান উল্লা যে পারেননি সে তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

অবশ্য একটা সান্ত্বনার কথা হচ্ছে এই যে, কাবুলের বসত বাড়ি লুট করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক বাড়ি দুর্গের মত করে বানানো— চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, সেও আবার খানিকটা উঠে ভিতরের দিকে বেঁকে গিয়েছে— তাতে সুবিধে এই যে, মই লাগিয়ে

ভিতরে লাফিয়ে পড়ার উপায় নেই। দেয়ালের গায়ে আবার এক সারি ছেঁদা; বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে সে ছেঁদা দিয়ে রাইফেল গলিয়ে নির্বিঘ্নে বাইরে গুলি চালানো যায়। বাড়িতে ঢোকার জন্য মাত্র একখানা বড় দরজা— সে দরজা আবার শক্ত ঝুনো কাঠে তৈরী, তার গায়ে আবার ফালি ফালি লোহার পাত পেরেক দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

মোক্ষম বন্দোবস্ত। দুখানা রাইফেল দিয়ে পঞ্চাশজন ডাকাতকে অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা যায়। কারণ যারা রাস্তা থেকে হামলা করবে তাদের কোনো আচ্ছাদনআবরণ নেই যার তলা থেকে রাইফেলের গুলি বাঁচিয়ে দেয়াল ভাঙবার বা দরজা পোড়াবার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ডিসেম্বরের শীতে সমস্ত রাত ছাদের উপর টহল দিয়ে নজর রাখবে কে? বড় পরিবার হলে কথা নেই; পালা দিয়ে পাহারা দেওয়া যায়, কিন্তু এ স্থলে সেই প্রাচীন সমস্যা 'কাকা আর আমি একা, চোর আর লাঠি দু'জন।' বরঞ্চ তার চেয়েও খারাপ। চোর না হয়ে এরা হবে ডাকাত, হাতে লাঠি নয় বন্দুক —আর সংখ্যায় এদের নারায়ণী সেনা হতেও আপত্তি নেই।

এ অবস্থায় মৌলানা আর তাঁর তরুণী ভার্যাকে ডেকে আনি কোন বুদ্ধিতে? কিন্তু ওদিকে তাঁরা হয়তো রয়েছেন 'আণ্ডার দি ফায়ার' দুই ফৌজের মাঝখানে। স্থির করলুম, বেশী ভেবে কোনো লাভ নেই। মৌলানার পাড়ায় ঢুকবার সুযোগ পেলেই তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলে নির্বাচনের ভারটা তাঁরই হাতে ছেড়ে দেব।

আবদুর রহমান খবর দিল, বাচ্চার ডাকুরা অ্যারোড্রোম দখল ক'রে ফেলেছে বলে আমান উল্লার হাওয়াই জাহাজ উঠতে পারছে না।

আমি শুধালুম, 'কিন্তু আমান উল্লা বিদেশ থেকে যে সব ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ি এনেছিলেন সে সব কি হল?'

নিরুত্তর।

'কাবুল বাসিন্দাদের যে রাইফেল দেওয়া হল তারা লড়তে যায় নি?'

আবছুর রহমান যা বললো তার হুবহু তর্জমা বাঙলা প্রবাদে আছে। শুধু এ স্থলে উলুখড়ের ছুখানা পা আছে বলে ছ' রাজার মাঝখানে সে যেতে রাজী হচ্ছে না। আমি বললুম, 'তাজ্জবের কথা বলছ আবছুর রহমান, বাচ্চায়ে সকাও ডাকাত, সে আবার রাজা হল কি করে?' আবছুর রহমান যা বললো তার অর্থ, বাচ্চা শুক্রবার দিন মোল্লাদের হাত থেকে তাজ পেয়েছে, খুতবায় (আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে) তার নাম বাদশা হিসেবে পড়া হয়েছে, আমান উল্লা কাফির সে ফতোয়া প্রচারিত হয়েছে ও বাচ্চায়ে সকাও বাদশাহ হবীব উল্লা খান নাম ধারণ করে কাবুল শহর থেকে 'কাফির' আমান উল্লাকে বিতাড়িত করবার জন্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন।

অদৃষ্টের পরিহাস! আমান উল্লার পিতার নাম হবীব উল্লা। আততায়ীর হস্তে নিহত হবীব উল্লার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা কি স্বীয় নামেই প্রতিহিংসার রক্ত অনুসন্ধান করছে!

সন্ধ্যার দিকে আবছুর রহমান তার শেষ বুলেটিন দিয়ে গেল; আমান উল্লার হাওয়াই জাহাজ কোনো গতিকে উঠতে পারায় বোমা ফেলেছে। বাচ্চার দল পালিয়ে গিয়ে মাইলখানেক দূরে থানা গেড়েছে।

[দেশে বিদেশে]

শপথ করিনু রাত্রে পাপপথে আর যেন নাহি ধায়,
প্রভাতে দ্বারেতে দেখি শপথঘ্ন মধুঋতু কি করি উপায়!

হাফিজ

কাইরোয় প্রবেশ

মরুভূমির উপর চন্দ্রালোক। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সে দৃশ্য বাঙলাদেশের সবুজ শ্যামলিমার মাঝখানে দেখা যায় না। তবে যদি কখনো পদ্মার বিরাট বালুচড়ায় পূর্ণিমা-রাতে বেড়াতে যাও—রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন এবং 'নিশীথে' গল্প তারি পটভূমিতে লেখা—তাহলে তার খানিকটে আস্বাদ পাবে।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ভূতুড়ে বলে মনে হয়। চোখ চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে, অথচ হঠাৎ যেন ঝাপসা আবছায়া পর্দায় ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়। মনে হয়, যেন দেখতে পাচ্ছি, তবু ঠিক ঠিক দেখতে পারছি নে, চিনতে পারছি, তবু ঠিক ঠিক চিনতে পারছি নে। চতুর্দিকে ফটফটে জ্যোৎস্নার আলো যেন উপচে পড়ে; মনে হয় এ-আলোতে অক্লেশে খবরের কাগজ পড়া যায়, অথচ এ-আলোতে লাল কালোর তফাত যেন ঘুচতে চায় না। মেঘলা দিনে এর চেয়ে অনেক ক্ষীণালোকে রঙের পার্থক্য অনেক বেশি ধরা পড়ে।

তাই,

> মনে হল পাখি, মনে হল মেঘ, মনে হল কিশলয়
> ভালো করে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয়।
> দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল
> অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল?

মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ মোটরের দু-মাথা উঁচুতে ফুটে ওঠে, জ্বল-জ্বল দুটি ছোট সবুজ আলো; ওগুলো কি? ভূতের চোখ নাকি? শুনেছি ভূতের চোখই সবুজ রঙের হয়। নাঃ! কাছে আসতে দেখি উটের ক্যারাভান—এদেশের ভাষাতে যাকে বলে 'কাফেলা' (কবি নজরুল ইসলাম এ শব্দটি বাঙলায় ব্যবহার করেছেন)। উটের চোখের উপর মোটরের হেডলাইট পড়াতে চোখ দুটো সবুজ হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। দেশে গোরু

বলদের চোখে আলো পড়ে ঠিক এই রকমই হয়, কিন্তু বলদের চোখ যে লেভেলে দেখি উটের চোখ তার অনেক উপরে দেখতে পেলুম বলে এতখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

আর কেনই পাব না বল? জনমানবহীন মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলেছি, রাত্রিবেলা—আবার বলছি, রাত্রিবেলা। মরুভূমি সম্বন্ধে কত গল্প, কত সত্য, কত মিথ্যে পড়েছি ছেলেবেলায়। তৃষ্ণায় সেখানে বেদুইন মারা যায়, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বেদুইন তার পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর উটের গলা কাটে, সেখান থেকে উটের জমানো জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য, তৃষ্ণায় মতিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সে হঠাৎ কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে সূর্যের দিকে জিভ দেখিয়ে দেখিয়ে নাচে আর শুষ্ককণ্ঠে বীভৎস গলায় গান জুড়ে,

তুই আমার কি করতে পারিস তুই ক্যা রে?
তুই—(অশ্লীলবাক্য)—তুই ক্যা রে?

এবং এর চেয়েও বদ্‌খদ্‌ বেতালা 'পদ্য'।

যদি মোটর ভেঙে যায়? যদি কাল সন্ধ্যে অবধি এ রাস্তা দিয়ে আর কোনো মোটর না আসে? স্পষ্ট দেখতে পেলুম এ গাড়ি রওনা হওয়ার পূর্বে পাঁচশ গ্যালন জল সঙ্গে তুলে নেয় নি; তখন কি হবে উপায়?

কিন্তু করুণাময়কে অসীম ধন্যবাদ, পল-পার্সি দেখলুম অন্য ধরনের ছেলে। তারা সেই জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির কটকটহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিন্‌হ ধাবহি (তুলসীদাস তাঁর রামায়ণে বানরদের কলরোলের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'ট'-এর অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন) শব্দ ছাপিয়ে বিকটতর কটকট করছে। তাদের কী আনন্দ!

পল: 'সব-কিছু ভালো করে দেখে নে; মাকে যাবতীয় জিনিস যেন গুছিয়ে লিখতে পারি।'

পার্সি: 'তোর জীবনে এই তুই প্রথম একটা খাঁটি কথা কইলি। কোনো জিনিস যেন বাদ না পড়ে। ওঃ, মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। জাহাজে চড়ার সময় কি কল্পনা করতে পেরেছিলুম, জাহাজে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোকটে মরুভূমির ভিতর দিয়ে চড়ে যাব?'

পল: 'ঠিক বলেছিস্। আর মা-বাবা কী রকম আশ্চর্য হবেন, ভাব দিকিনি! কিন্তু, ভাই, ওনারা যদি তখন ধমক দেন, জাহাজ ছেড়ে তোমরা এ রকম বাউণ্ডুলিপনা করতে গিয়েছিলে কেন? তখন?'

পার্সি বললে: 'ঐ তো তোর দোষ! সমস্তক্ষণ ভয়ে মরিস। তখন কি আর একটা সদুত্তর খুঁজে পাব না? ঐ স্যর রয়েছেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না। উনি কি বলেন।'

আমি বললুম: 'দোষ দেবেন, তো তখন দেবেন। এখন সে আলোচনা করতে গিয়ে দেখবার জিনিস অবহেলা করবে না কি? বিশেষত, যদি আমাদের অভিযান অন্যায় কর্মই হয়ে থাকে, সেটাকে যখন রদ করার শক্তি আমাদের হাতে নেই।'

পার্সি বললে: 'আর ফিরে গিয়েই বা কি লাভ? আমাদের জাহাজ তো অনেকক্ষণ হল ছেড়ে দিয়েছে।'

চালাক ছেলে সবদিকে খেয়াল রাখে।

মরুভূমিতে দিনের বেলা যে-রকম প্রচণ্ড গরম, রাত্রেও ঠিক তেমনি বিকট শীত। বৈজ্ঞানিকেরা তার একটা অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দেন বটে, কিন্তু ধোপে সেটা কতখানি টেকে আমি যাচাই না করে বলতে পারব না। উপস্থিত শুধু এইটুকু বলতে পারি, জাহাজে দিনের পর দিন রাতের পর রাত দুঃসহ গরমে হাড়মাস যেন আচার হয়ে গিয়েছিল; ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ পেয়ে সর্বাঙ্গ যেন জলে. ভেজা জুঁই ফুলের মতো ফুলে উঠল।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একাধিকবার হয়েছে।

পেশোয়ার, জলালাবাদের ১২০।১২২ ডিগ্রী সওয়ার পর আমি খাক্-ই-জব্বারের ৬০ ডিগ্রীতে পেঁৗছতে কি আরাম অনুভব করেছিলুম সে বর্ণনা অন্যত্র করেছি। কোথায়? উঁহু, সেটি হচ্ছে না। বললেই বলবে, আমি সুযোগ পেয়ে আমার অন্য বইয়ের বিজ্ঞাপন এখানে নিখর্চায় চালিয়ে দিচ্ছি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই। যখন মোটরে হঠাৎ একটুখানি জোর ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল তখন দেখি চোখের সামনে সারি সারি আলো। কাইরো পেঁৗছে গিয়েছি। গাড়ির আর সবাই তখনো ঘুমুচ্ছে। আমার সন্দেহ হল ড্রাইভারও বোধ করি ঘুমুচ্ছে। গাড়ি আপন মনে বাড়ির দিকে চলেছে; সোয়ার ঘুমিয়ে পড়লেও ঘোড়া যে রকম আপন বাড়ি খুঁজে নেয়।

পার্সিকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে বললুম: 'তবে না, বৎস, বলেছিলে, মরুভূমির সব টুকিটাকি পর্যন্ত মনের নোট বুকে টুকে নেবে?' যেন আমি নিজে কতই-না জেগে ছিলুম।

পার্সিও তালেবর ছেলে। তক্ষুণি দিলে পলের কানে ধরে একখানা আড়াই-গজী টান। আমি পার্সিকে যা বলেছিলুম সে পলকে তাই শুনিয়ে দিলে। পল বেচারী আর কি করে? সে আস্তে আস্তে মাদমোয়াজেল শেনিয়েকে জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'কাইরো পেঁৗছে গিয়েছি।'

বাঙাল দেশে কথায় কয়—পশ্চিম বাঙলায় বলে কি না জানিনে—'সায়েব বিবিকে মারলেন চড়, বিবি বাঁদীকে দিলেন ঠ্যাঙা, বাঁদী বেরালকে মারলে লাথি, বেরাল খামচে দিলে নুনের ছালাটাকে।'

সংসারে এই রীতি।

এখানে অবশ্য প্রবাদ টায়টায় মিলল না। তাই পল অতি সবিনয়ে মেমসাহেবকে জাগিয়ে দিলে।

মাদমোয়াজেল হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে পাউডার বের করে নাকে

ঘষতে ঘষতে ফরাসীতে শুধালেন,—আমার বিশ্বাস ফরাসিনীরা ঘুমন্ত অবস্থায়ও ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে পারেন এবং লাগান—'আমরা কোথায় পৌঁছলুম, মসিয়ো ?'

'ল্য ক্যার।'

পল বেশ খানিকটে ফরাসী জানত। আমাকে শুধালে : "ল্য ক্যার' অর্থ হল 'দি কাইরো'। 'ল্য'টা আবার পুংলিঙ্গ। একটা শহরের আবার পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ কি করে হয় ?'

আমি বললুম : 'অত বিদ্যে আমার নেই, বাপু। তবে এইটুকু জানি এ-বাবদে ফারসীই একমাত্র আসামী নয়। আমরা ব্রহ্মপুত্রকে বলি নদ, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ এবং গঙ্গাকে বলি নদী, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ। কেন বলি জানি নে।'

পার্সি বললে : 'আমরা ইংরেজরাই বা জাহাজকে 'শী' অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ দিয়েছি কেন ?'

আমি বললুম : 'উপস্থিত এ আলোচনা অক্‌স্‌ফোর্ডের জন্য মুলতুবি রেখে দাও—সেখানেই তো পড়তে যাচ্ছ—এবং নিশির কাইরোর সৌন্দর্যটি উপভোগ করে নাও।'

সত্যি, এরকম সৌন্দর্য সচরাচর চোখে পড়ে না। আমরা যখন চন্দননগর থেকে কলকাতা পৌঁছই তখন মাঝখানে ঘন বসতি আর বিস্তর জোরালো বাতি থাকে বলে কলকাতার রোশনাই ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারি নে। এখানে মরুভূমি পেরিয়ে হঠাৎ শহর বলে একসঙ্গে সব কটা আলো চোখে পড়ে এক অদ্ভুত মরীচিকার সৃষ্টি করে।

ছ-তলা বাড়ির উপরে—অবশ্য বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না—দেখি, লাল আলোতে জ্বালানো শেলাইয়ের কলের ছুঁচ ঘন ঘন উঠছে নামছে, আর সবুজ আলোর চাকা ঘুরেই যাচ্ছে ঘুরেই যাচ্ছে। নিচে এক বিলিতি কোম্পানীর নাম। আমার মনে হল, হায়। কলটার নাম যদি 'উষা' হত। সেদিন আসবে যেদিন ভারতীয়—যাকগে।

আরো কত রকমের প্রজ্বলিত বিজ্ঞাপন। এ বিষয়ে কলকাতা কাইরোর বহু পিছনে।

করে করে শহরতলীতে ঢুকলুম। কলকাতার শহরতলী রাত এগারোটায় অঘোরে ঘুমোয়। কাইরোর সব চোখ খোলা—অর্থাৎ খোলা জানালা দিয়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে। আর রাস্তার কথা বাদ দাও। এই শহরতলীতেই কত না রেস্তোরাঁ, কত না 'কাফে' খোলা; খদ্দেরে খদ্দেরে গিসগিস করছে। (আমাদের যে রকম চায়ের দোকান, মিশরীদের তেমনি 'কাফে' অর্থাৎ কফির দোকান। আমি প্রায়ই ভাবি কফির দোকান যদি 'কাফে' হতে পারে তবে চায়ের দোকান 'চাফে' হয় না কেন? 'চলো, ভাই, চাফেতে যাই' বলতে কি দোষ?)

আবার বলছি রাত তখন এগারোটা। আমি বিস্তর বড় বড় শহর দেখেছি, কাইরোর মতো নিশাচর শহর কোথাও চোখে পড়ে নি।

কাইরোর রান্নার খুশবাইয়ে রাস্তা ম-ম করছে। মাঝে মাঝে নাকে এসে এমন ধাক্কা লাগায় যে মনে হয় নেমে পড়ে এখানেই চাট্টি খেয়ে যাই। অবশ্য রেস্তোরাঁগুলো আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানেরই মতো নোংরা। তাতে কি যায় আসে? কে যেন বলেছে, 'নোংরা রেস্তোরাঁতেই রান্না হয় ভালো; কালো গাই কি সাদা দুধ দেয় না?'

আমার খেতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ঐসব সায়েব মেমরা যখন রয়েছেন। তাঁরা 'মঁ দিয়ো', 'হ্যার গট্' কি যে বলবেন তার তো ঠিকঠিকানা নেই।

আচম্বিতে দু-খানা গাড়িই দাঁড়াল। বসে বসে সবাই অসাড় হয়ে গিয়েছি। সব্বাই নেমে পড়লুম। সকলেরই মনে এক কামনা। আড়ামোড়া দিয়ে নি, পা দুটো চালিয়ে নি, হাত দুখানা ঘুরিয়ে নি।

এমন সময় আবুল আস্‌ফিয়া আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে,

মাথা পিছনের দিকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে, হাত দুখানা সামনের দিকে সম্প্রসারিত করে, পোলিটিশিয়ানদের কায়দায় শ্রদ্ধানন্দ-পার্কী লেকচার ঝাড়তে আরম্ভ করলেন, কিন্তু ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে,—

'মেদাম, মেদ্‌মোয়াজেল, এ মেসিয়ো—

(ভদ্রমহিলাগণ, ভদ্রকুমারীগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণ)

'আমরা সকলেই এক্ষণে তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধাতুর। নগরী প্রবেশ করতঃ আমরা প্রথমেই উত্তম কিংবা মধ্যম শ্রেণীর ভোজনালয়ে আহারাদি সমাপন করব। কিন্তু প্রশ্ন, সেখানে খেতে দেবে কি? জাহাজে যা দেয় তা-ই। সেই বিস্বাদ সুপ, বিস্বাদতর স্ট্যু, তদিতর পুডিং। অর্থাৎ সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কিংবা অ্যাংলো ইজিপ্‌শিয়ন—যাই বলুন—রসকষহীন খানা।

'পক্ষান্তরে, এই শহরতলীতে যদি আমরা কিঞ্চিৎ আদিম এবং অকৃত্রিম মিশরীয় খাদ্য, মিশরীয় পদ্ধতিতে সুপক্ক খাদ্য, ভোজন করি তবে কি এক নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে না?'

আমরা কিছু বলার পূর্বেই তিনি হাত দুখানা গুটিয়ে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ডানদিকটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন: 'অতি অবশ্য, রেস্তোরাঁগুলো নোংরা। চেয়ার-টেবিল সাফ-সুৎরো নয়, কিন্তু মেদাম, মেদ্‌মোয়াজেল, মেসিয়ো, আমরা তো আর টেবিল-চেয়ার খেতে যাচ্ছি নে। আমরা খেতে যাচ্ছি খানা। জাহাজের রান্না যখন আমাদের খুন করতে পারেনি, তখন এ রান্নাই বা করবে কি করে? আপনারাই বলুন!'

কেউ কিছু বলবার পূর্বেই পার্সি চেঁচিয়ে উঠল: 'অফ্‌কোস্‌, অফ্‌কোস্‌—আলবৎ, আলবৎ, আমরা নিশ্চয়ই যাব। আমরা যখন মিশরীয় হাওয়াতেই শ্বাস নিচ্ছি, মিশরীয় জলই খাব, তখন মিশরীয় খাদ্য খাব না কেন?'

মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বললেন: 'যাঁরা খেতে চান না, তাঁরা খাবেন না। আমি যাচ্ছি।'

আর আমি বুঝলুম, ফরাসীদেশটা কতখানি স্বাধীনতার দেশ। স্বাধীনতা ফরাসীদের হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায়।

শেনিয়ে ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ডেলিকেট প্রাণী। জাহাজের রান্না তাঁর পছন্দসই ছিল না বলে তিনি টোস্ট, দুধ, ডিম, মটর, কফি, আলুসেদ্ধ খেয়ে প্রাণ ধারণ করতেন। তিনি যখন রাজী তখন—?

আমার মনে হয়, আমরা যে তখন সবাই নিকটতম রেস্তোরাঁয় হুড়মুড় করে ঢুকলুম তার একমাত্র কারণ এই নয় যে, মাদমোয়াজেল ঢুকতে প্রস্তুত; আমার মনে হয়, আর সবাইও তখন মিশরী খানার এক্সপেরিমেণ্ট করবার জন্য তৈরী। এবং সর্বোত্তম কারণ সবাই তখন ক্ষুধায় কাতর। কোথায় কোন্ খানদানী রেস্তোরাঁয় কখন পৌঁছব তার কি ঠিকঠিকানা? এবং হয়তো ততক্ষণে সব মাল কাবার। খেতে হবে মাখন-রুটি, দিতে হবে মুর্গী-মটনের দর। তার চেয়ে ভরভর খুশবাইয়ের খাবারই প্রশস্ততর। হাতের কাছে যা পাচ্ছি তাই ভালো, সেই নিয়ে খুশি।

রবি ঠাকুর বলেছেন,

কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন
দূরের দুরাশাতে?

ইরানী কবি ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

Oh, take the Cash, and let the Credit go,
Nor heed the rumble of a distant Drum!

কান্তি ঘোষ তার বাঙলা অনুবাদ করেছেন,

নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক,
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক!

*   *   *   *

রেস্তোরাঁগুলো ছুটে এসে আমাদের আদর-কদর করে অভ্যর্থনা (ইসতিক্‌বাল) জানালে। তার 'বয়-রা' বত্রিশখানা দাঁতের মুলো দেখিয়ে আকর্ণ হাসলে। তড়িঘড়ি তিনখানা ছোট ছোট টেবিল

একজোড় করে, চেয়ার সাজিয়ে আমাদের বসবার ব্যবস্থা করা হল, রান্নাঘর থেকে স্বয়ং বাবুর্চী ছুটে এসে তোয়ালে কাঁধে বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানালে। বসতে গিয়ে দেখি, শ্যামবাজারের সেই লোহার চেয়ার। শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বসতে গেলে ছ্যাঁকা দেয়।

আমি তখন আমার অভিজ্ঞতা গিলছি। অর্থাৎ দেখছি, বয়গুলোর কী সুন্দর দাঁত! এরকম দুধের মতো সুন্দর দাঁত হয় কি করে? সে-দাঁতের সামনে এরকম রক্তকরবীর মতো রাঙা ঠোঁট এরা পেল কোথা থেকে? এবং ঠোঁটের সীমান্ত থেকেই সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে কী অদ্ভুত এক নবীন রঙ! এ রঙ আমার দেশের সবুজ শ্যামল নয়, এ যেন কি এক ব্রোঞ্জ রঙ! কী মসৃণ, কী সুন্দর!

কিন্তু সর্বাধিক মনোরম বাবুর্চীর ভুঁড়িটা। ওঃ! কী বিশাল, কী বিপুল, কী জাঁদরেল!

তার থেকেই অনুমান করলুম আমরা ভালো রেস্তোরাঁতেই ঢুকেছি।

ইতিমধ্যে আবুল আস্‌ফিয়া এবং মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বাবুর্চীকে নিয়ে খুদ রান্নাঘরে চলে গিয়েছেন, আহারাদির বাছাই-তদারক করতে এবং গোটাচারেক ছোকরা এসে আমাদের চতুর্দিক ঘিরে চেঁচাচ্ছে, 'বুৎ বালিশ, বুৎ বালিশ!'

সে আবার কী যন্ত্রণা?!?!

বুঝতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না; কারণ এদের সকলের হাতে কাঠের বাক্স আর গোটা দুই করে বুরুশ। ততক্ষণে আবার মনে মনে ধনিতত্ত্ব আলোচনা করে করে বুঝে নিয়েছি, আরবীতে 'ট' নেই বলে 'বুট' হয়ে গিয়েছে 'বুৎ' এবং 'প' নেই বলে 'পলিশ' হয়ে গিছে 'বালিশ'—একুনে দাঁড়াল 'বুৎ বালিশ'। তাই আরবরা পণ্ডিত জওয়াহরলালের নাম উচ্চারণ করে 'বান্দিৎ জওয়াহরলাল'!

ভাগ্যিস আরবী ভাষায় 'ট' নেই। থাকলে নিরীহ 'পণ্ডিত' আরবিস্থানের 'ব্যাণ্ডিট' হয়ে যেতেন! আদন অঞ্চলের আরবীতে আবার 'গ' নেই; তাই তারা 'গান্ধী'র নাম উচ্চারণ করে 'জান্দী'। অবশ্য সেটা কিছু মন্দ নয়,—সত্যের জন্য 'জান দি' বলেই তো তিনি প্রাণ দান করে দেহত্যাগ করলেন।

বাঙালী তেড়ি কাটতে ব্যস্ত, ইংরেজ সমস্তক্ষণ টাইটা ঠিক গলার মাঝখানে আছে কি না তার তদারকিতে ব্যস্ত, শিখেরা পাগড়ি বাঁধতে ঘণ্টাখানেক সময় নেয়, কাবুলীরা হামেহাল জুতোতে পেরেক ঠোকাতে ব্যতিব্যস্ত, আর কাইরোবাসীরা দেখলুম, 'বুৎ বালিশের' নেশাতে মশগুল। তা না হলে রাত দুপুরে গণ্ডায় গণ্ডায় বুৎ-বালিশওয়ালারা কাফে রেস্তোরাঁয় ধন্না দিতে যাবে কেন?

তবে হ্যাঁ, পালিশ করতে জানে বটে! স্পিরিট দিয়ে পুরনো রঙ ছাড়ালে, সাবানজল দিয়ে অন্য সব ময়লা সাফ করলে, ক্রীম লাগালে, পালিশ ছোঁয়ালে, প্রথম হালকা ক্যাম্বিস, পরে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে জুতোর জৌলুস বাড়ালে। তখন জুতোর যা অবস্থা! তাতে তখন আয়নার মতো মুখ দেখা যায়। বুরুশের ব্যবহার তো প্রায় করলেই না—চামড়া নাকি তাতে জখম হয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য বোধ হল, সেই ঝাঁ চকচকে জুতোজোড়াকে সর্বশেষে কাপড় দিয়ে ঘষে অল্প—অতি অল্প—ম্যাটমেটে করে দিল কেন? এতখানি মেহন্নত করে চাকচিক্য জাগানোর পর সেটাকে ম্যাটমেটে করে দেবার কি অর্থ?

একটা গল্প মনে পড়ল:

এক সাহেব পেসট্রিওলাকে অর্ডার দিলেন একটা জন্মদিনের কেক বানাবার জন্যে। কেকের উপরে যেন সোনালী নীলে তাঁর নামের আদ্য অক্ষর পি. বি. ডাবলইউ লেখা থাকে। ডেলিভারি নেবার সময় দোকানদারকে বললেন, 'হুঁ, কেকটি দেখাচ্ছে উত্তম,

কিন্তু হরফগুলো বানানো হয়েছে সোজা অক্ষরে। আমি চাই ট্যারচা ধরনে, ফ্লরাল ডিজাইনে।'

দোকানী খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়। বললে, 'এক্ষুনি করে দিচ্ছি। জন্মদিনের ব্যাপার—চাট্টিখানি কথা নয়।'

প্রচুর পরিশ্রম করে সে কেকের উপরটা চেঁচে নিলে। তারপর প্রচুরতম গলদঘর্ম হয়ে তার উপর হরফগুলো বাঁকা ধরনে আঁকলে, আরো মেলা ফুল ঝালর চতুর্দিকে সাজালে।

সায়েব বললেন, 'শাবাশ, উত্তম হয়েছে।'

দোকানী খুশি হয়ে শুধালে, 'প্যাক করে আপনাকে দেব, না, কোনো বিশেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে?'

সায়েব হেসে বললেন, 'কোনোটাই না। আমি ওটা নিজেই খাবো।'

বলেই ছুরি দিয়ে চাক্‌লা চাক্‌লা করে গব-গব করে আস্ত কেকটা গিললেন।

দোকানী তো থ। তাহলে অত-শত করার কি ছিল প্রয়োজন?

বুং বালিশের বেলাও তাই।

বুং বালিশওলাকে শুধালুম, পালিশ কমিয়ে দেওয়ার কারণটা কি?

একটুখানি হকচকিয়ে সামলে নিয়ে বললে, 'গাঁইয়ারাই শুধু অত্যধিক চাকচিক্য পছন্দ করে। শহরের ভদ্রলোক সব জিনিসেরই মেকদার মেনে চলেন।'

অ—অ—অ!

তখন মনে পড়ল, অবন ঠাকুরও বলেছেন, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা আগের দিনে সোনার গয়না পরে পালকিতে বেরুবার সময় তার উপর মলমলের পট্টি বেঁধে নিতেন। বড্ড বেশী চাকচিক্য নাকি গ্রাম্যজনসুলভ বর্বরতা!

[জলে ডাঙায়]

হাইকিং

আমি নিজে কখনো খানদানী বাউণ্ডুলে বলে বাড়ি থেকে বেরোইনি, তবে হেঁটে, সাইক্লে, আঁধা-বোটে— অর্থাৎ কোনো প্রকারের রাহা খরচা না করে হাইকিং করেছি বিস্তর।

আমি তখন রাইন নদীর পারে বন্ শহরে বাস করি। রাইনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার জন্য পৃথিবীর লোক সেখানে প্লেজার স্টীমারে করে উজান-ভাটা করে। আমিও একবার করার পর আমার মনে বাসনা জাগলো ওই অঞ্চলেই হাইক্ করে রাইন তো দেখব, দেখবই সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকার গিরি-পর্বত, উপত্যকার ক্ষেত খামার, গ্রামাঞ্চলের বাড়ি ঘরদোর, নিরিবিলি গ্রাম্যজীবন সব-কিছুই দেখে নেব। আর যদি রাইন অঞ্চল ভালো না লাগে তবে চলে যাব যেদিক খুশি।

আমার ল্যাণ্ডলেডিই আমাকে রাস্তা-দুরুস্ত করে দিলে। মাথায় প্রকাণ্ড ঘেরের ছাতা-হ্যাট। পশমের পুরু শার্টের উপর চামড়ার কোট। চামড়ার শার্ট। সাইক্লমোজা। ভারী বুটজুতো।

শব্দার্থে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা একটি হেভারস্যাক। তার ভিতরে রান্নার সরঞ্জাম, অর্থাৎ অতি, অতি হাল্কা এবং পাতলা কিন্তু বেশ শক্ত এলুমুনিয়ামের সসপেন জাতীয় বস্তু, প্লেট, চামচে— ছুরি-কাঁটা নিইনি— স্পিরিট স্টোভ, কয়েক গোলা চর্বি, কিঞ্চিৎ মাখন, নুন-লঙ্কা আর একটি রবারের বালিশ— ফুঁ দিয়ে ফোলানো যায়।

আর বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে পড়ছে না। এসবে আমার খর্চা হয়েছিল অতি সামান্যই, কারণ বাড়ির একাধিক লোক এসব বস্তু একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। এস্তেক কোট পাতলুনে একাধিক চামড়ার তালি! ল্যাণ্ডলেডি বুঝিয়ে বললে, উকীলের গাউনের মত এসব বস্তু যত পুরনো হয় ততই সে খানদানী ট্র্যাম্প!

পকেটে হাইনের 'বুখ ড্যার লীডার'—কবিতার বই। কবি

হাইনে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় এ বইয়ের কবিতাগুলো লিখেছিলেন। এতে রাইন নদী বারবার আত্মপ্রকাশ করেছেন।

রবির অতি ভোরে গির্জার প্রথম ম্যাসে হাজিরা দিয়ে রাস্তায় নামলুম।

একটা কোঁৎকা ছাড়া হাইকিঙে বেরোতে নেই। অবশ্য সর্বক্ষণ সদর রাস্তার উপর দিয়ে চললে তার বড় প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সদর রাস্তার দু পাশে আলুক্ষেত আপেল বাগান থাকে না, লোকজন যারা থাকে তারাও ট্র্যাম্প ভিখিরি পছন্দ করে না। পিঠের ব্যাগটা খালি হয়ে গেলে সেটা বিন্-খর্চায় ভরে নিতে হলে অজ পাড়াগাঁই প্রশস্ততম।

কিন্তু যত প্রচণ্ড শিক্ষিত দেশই হোক না কেন পাড়াগাঁয়ে দু' একটা বদ-মেজাজী কুকুর থাকবেই। এবং তারা পয়লা নম্বরের স্নব্। ছিমছাম ফিটফাট সুট পরে গটগট করে চলে যান— কিচ্ছুটি বলবে না। কিন্তু আপনি বেরিয়েছেন হাইকিঙে— যতই ফিটফাট হয়ে বাড়ি থেকে বেরোন না কেন, লজঝড় কাক-বক-তাড়ানোর স্কেয়ার-ক্রো বনে যেতে আপনার দু'দিনও লাগবে না। দু' দিন কেন, গাছতলায় একরাত কাটানোর পর সকালবেলা সুটমুটের যা চেহারা হয় তার মিল অনেকটা ভ্যাগাবণ্ড চার্লিরই মত, এবং ঐ স্নব কুকুরগুলো তখন ভাবে, আপনাকে ভগবান নির্মাণ করেছেন নিছক তাদের ডিনার-লাঞ্চের মাংস জোগাবার জন্য— সিঙ্গিকে যেমন হরিণ দিয়েছেন, বাঘকে যে রকম শুয়ার দিয়েছেন। পেছন থেকে হঠাৎ কামড় মেরে আপনার পায়ের ডিম কি করে সরানো যায় সেই তাদের একমাত্র উচ্চাভিলাষ। ওটাতে আপনারও যে কোনো প্রকারের প্রয়োজন থাকতে পারে সে বিষয়ে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমার ল্যাণ্ডলেডি হাতে লাঠি তুলে দিতে দিতে বললে, 'এক

জর্মন গিয়েছে ঘোর শীতকালে স্পেনে। স্পেনের গ্রামাঞ্চল যে বিশ্ব-সারমেয়ের ইউনাইটেড নেশন সেটা ভদ্রলোক জানতেন না। তারই গণ্ডা তিনেক তাঁকে দিয়েছে হুড়ো। ভদ্রলোক আর কিছু না পেয়ে রাস্তা থেকে পাথর কুড়োতে গিয়ে দেখেন সেগুলো জমিতে জোর সেঁটে রয়েছে— আসল হয়েছে কি শীতে জল জমে বরফের ভিতর সেগুলো মোক্ষম আটকে গেছে। ভদ্রলোক খাঁটি গ্লোবট্রটারের মত আত্মচিন্তা করলেন, অদ্ভুত দেশ! কুকুরগুলোকে এরা রাস্তায় ছেড়ে দেয়, আর পাথরগুলোকে চেন্ দিয়ে বেঁধে রাখে।'

ল্যাণ্ডলেডিকে বলতে হল না—আমি বিলক্ষণ জানতুম, তদুপরি আমার শ্যামমনোহর বর্ণটি অষ্টাবক্র স্কন্ধ-কটি— ভদ্রাভদ্র যে কোনো সারমেয়-সন্তানই এই ভিনদেশী চীজটিকে তাড়া লাগানো একাধারে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন এবং আনন্দ বর্ধন রূপে ধরে নেবে— লক্ষ্য করেননি চীনেম্যান আমাদের গাঁয়ে ঢুকলে কি হয়।

কোঁৎকাটা ঠুকতে ঠুকতে শহর ছেড়ে মেঠো পথে নামলুম।

খৃষ্টান দেশে রববারে ক্ষেতখামারের কাজও ক্ষান্ত থাকে। পথের দু ধারের ফসলক্ষেতে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। রাস্তায়ও মাত্র দু একটি লোকের সঙ্গে অনেকক্ষণ চলার পর দেখা হয়। তারাও গ্রামের লোক বলে হ্যাট তুলে গুটেনটাখ্ বা গুটেন মর্গেন (শুভদিন বা শুভদিবস) বলে আমাকে অভিবাদন জানায়। বিহার মধ্যপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলেও ঠিক এই রকম অপরিচিত জনকেও 'রাম রাম' বলে অভিবাদন করার পদ্ধতি আছে। কাবুলে তারও বাড়া। একবার আমি শহরের বাইরের উপত্যকায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। রাস্তা প্রায় জনমানবহীন। বিরাট শিলওয়ার এবং বিরাটতর পাগড়ী পরা মাত্র একটি কাবুলী ধীরে মন্থরে চলেছে— গ্রামের লোক শহুরেদের তুলনায় হাঁটে অতি মন্থরগমনে এবং তারও চেয়ে মন্দ গতিতে চলে যারা একদম পাহাড়ের উপর থাকে। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাকে ধরে ফেললুম। ঘাড় ফিরিয়ে

অলস কৌতূহলে আমার দিকে তাকিয়ে, 'ভালো তো? কুশল তো?' শুধিয়েই আমার দিকে এক গুচ্ছ স্যালাড পাতা এগিয়ে দিলে। এস্থলে এটিকেট কি বলে জানিনে— আমি একটি পাতা তুলে নিলুম। তখন এগিয়ে দিলে বাঁ হাতের পাতার ঠোঙাটি। সেটাতে দেখি হলদে-লালচে রঙের ঘন কি একটা পদার্থ। আমি বোকার মত তাকিয়ে আছি দেখে সে নিজে একখানা স্যালাড পাতা নিয়ে ঐ তরল পদার্থে গুত্তা মেরে মুখে পুরে চিবোতে লাগল। আমিও করলুম। দেখি, জিনিসটা মধু এবং অত্যুত্তম মধু। ওই প্রথম শিখলুম, কাবুলীরা তেল-নুন-সিরকা দিয়ে স্যালাড পাতা খায় না, খায় মধু দিয়ে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়, মোদ্দা কথা দেহাতী কাবুলী যদি কিছু খেতেখেতে রাস্তা দিয়ে চলে তবে পরিচিত অপরিচিত সবাইকে তার হিস্যা এগিয়ে দেবেই দেবে। এবং স্ট্রিক্টলি ব্রাদারলি ডিভিজন— অর্থাৎ আমার একখানা পাতা চিবনো শেষ হতে না হতেই আরেকখানা পাতা এবং 'মধুভাণ্ড' এগিয়ে দেয়। পরে গ্রামে ঢোকা মাত্রই সে আমাকে এক চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে যায় এবং দাম দেবার জন্য বিস্তর ধস্তাধস্তি করে। কিন্তু থাক সে কথা— এটা আসে 'কাবুলে ভবঘুরেমি' অনুচ্ছেদে।

এস্থলে স্থির করলুম, অপরিচিতকেও নমস্কার জানানো যখন এ-দেশে রেওয়াজ তবে এবার থেকে আমিই করবো।

আধঘণ্টাটাক পরে দেখি এগিয়ে আসছে একজন। বয়সে আমার চেয়ে বড়ও বটে। ও মোকা পাবার পূর্বেই আমি বেশ চেঁচিয়ে বললুম 'গ্রূস্ গট্!'

এস্থলে নব জর্মন শিক্ষার্থীদের বলে রাখি, জর্মনভাষী জর্মন এবং সুইস সচরাচর 'গুটেন টাখ গুড্ ডে, শুভদিবস' ইত্যাদি বলে থাকে, কারণ এরা বড্ড সেকুলারাইজড (ধর্মনিরপেক্ষ) হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে অস্ট্রিয়াবাসী জর্মনভাষীগণের অনেকেই এখনও 'গ্রূসগট্'

—'ভগবানের আশীর্বাদ' বলে থাকে। এদেশের মুসলমানরা আল্লাকে স্মরণ করেই 'সালাম' বলেন, হিন্দুরা 'রাম রাম' এবং বিদায় নেবার বেলা গুজরাতে 'জয় জয়! জয় শিব, জয় শঙ্কর।'

স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটা 'গ্রূসগটে'র জন্য আদপেই তৈরী ছিল না। 'গুটেনটাখ, গুটেনটাখ' বলে শেষটায় বার কয়েক 'গ্রূসগট্' বলে সামনে দাঁড়াল। শুধালে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

ইংলণ্ডে গ্রামাঞ্চলের এটিকেট জানিনে। সেখানেও বোধহয় শহুরেদের কড়াকড়ি নেই।

বললুম, বিশেষ কোথাও যাচ্ছিনে। ওই সামনের গ্রামটায় দুপুরবেলা একটু জিরোবো। রাতটা কাটাবো, তারপরের কোনো একটা গ্রামে, কিংবা গাছতলায়।

বললে, 'আমি যাচ্ছি শহরে।' তারপর বললে, 'চলো না, ওই গাছতলায় একটু জিরোনো যাক।' আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।' ভবঘুরেমির ওই একটা ডাঙর সুবিধে। না হয় কেটেই গেল ওই গাছতলাটায় ঘণ্টা কয়েক—যদিও ওটা তেঁতুলগাছ নয় এবং ন'জন সুজন তো এখনো দেখতে পাচ্ছিনে।

চতুর্দিক নির্জন নিস্তব্ধ। ইয়োরোপেও মধ্যদিন আসন্ন হলে পাখী গান বন্ধ করে। শুধু দূর অতি দূর থেকে গির্জায় ঘণ্টা অনেকক্ষণ ধরে বেজে যাচ্ছে। রবির দুপুরের ওই শেষ আরতি—হাই ম্যাস তাই অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টা বেজেই চলেছে। ওরই ভেসে আসা শব্দের সঙ্গে আমার মনও ভেসে চলেছে দূর দূরান্তরে—ওই বহুদূরে যেখানে দেখা যাচ্ছে ভিনাস পাহাড়ের চূড়োর উপর গাছের ডগাগুলো।

বললে, 'আসলে পাইপটা অনেকক্ষণ টানিনি; তাই এই জিরোনো।' তারপর, 'শুধালে তোমার দেশ কোথায়?' আমি বললুম, 'আমি ইণ্ডার (ভারতীয়)।' এমনি চমক খেল যে তার হ্যাটটা তিন ইঞ্চি কাৎ হয়ে গেল। তোৎলালে 'ইণ্ডিয়ানার'।

'ইণ্ডার' অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান', আর 'ইণ্ডিয়ানার' অর্থ 'রেড ইণ্ডিয়ান'। দেহাতীদের কথা বাদ দিন, শহরে অর্ধশিক্ষিতেরাও এ দুটোতে আকছারই ঘুলিয়ে ফেলে। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি কোন্ দেশের লোক। শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পেরেছিল কি না জানিনে তবে তার বিস্ময় যে চরমে পৌঁছেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর বার বার শুধু মাথা নাড়ে আর বলে, 'বিপদে ফেললে, বড় বিপদে ফেললে।'

আমি শুধালুম, 'কিসের বিপদ?'

'কত ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে কত দেশ-দেশান্তরে যাচ্ছে—আমার তাতে কি। কিন্তু তুমি অত দূর দেশের লোক, আমার গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছ, আমার সঙ্গে আলাপ হল আর তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে পারলুম না—এতে দুঃখ হয় না আমার?

তারপর মরিয়া হয়ে বললে, 'আসলে কি জানো, আমার স্ত্রী একটি জাঁতিকল। দুনিয়ার লোকের হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়াই ওঁর স্বভাব। না হলে তোমাকে বলতুম, আমার বাড়িতে বিকেল অবধি জিরিয়ে নিতে—আমিও ফিরে আসতুম।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'কত লোক ইয়ার-দোস্তকে দাওয়াৎ করে খাওয়ায়, গাল-গল্প করে, আমার কপালে সেটি নেই।'

আমি তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, তার সহৃদয়তাই আমাকে যথেষ্ট মুগ্ধ করেছে, যদি সম্ভব হয় তবে ফেরার মুখে তার খবর নেব।

পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'কিছু মনে করো না, কিন্তু ভবঘুরেদের কি আর কথা রাখবার উপায় আছে? আমার নামটা কিন্তু মনে রেখো—টেরমের।'

আমি বললুম, 'সে কি! আমি তো ফের বন্ শহরে ফিরে যাবো। এই নাও আমার ঠিকানা। সেখানে আমার খবর নিয়ো। দুজনাতে ফূর্তি করা যাবে।'

হয়ে উঠলো। বললে, 'বড্ডই জরুরী কাজ ভাই। উকিল বসে আছে, এই রববারেও, আমার জন্যে। টাকাটা না দিলে সোমবার দিন কিস্তি খেলাপ হবে।'

আমি বললুম, 'ভগবান তোমার সঙ্গে থাকুন।' বললে, 'যতদিন না আবার দেখা হয়।'

দশ পা এগিয়েছি কি না, এমন সময় শুনি পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলছে, 'ঐ সামনের মোড় নিতেই দেখতে পাবে ডানদিকে একপাল ভেড়া চরছে। ওখানে কিন্তু দাঁড়িয়ো না। ভেড়াগুলোকে সামলায় এক দজ্জাল আলসেশিয়ান কুকুর। ওর মনে যদি সন্দেহ হয়, তোমার কোনো কুমৎলব আছে তবে বড় বিপদ হবে।'

কথাটা আমার জানা ছিল, কিন্তু স্মরণ ছিল না। বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

* * *

মোড় নিতেই দেখি, বাঁ দিকের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে নাসপাতি ভর্তি ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে রাজ-আল ধরে আসছে একটি বয়স্ক লোক। সর্বপ্রথমই চোখে পড়ল, তার ডান হাতখানা কনুই অবধি নেই। হাতের আস্তিন ভাঁজ করে ঘাড়ের সঙ্গে পিন করা। বড় রাস্তায় সে উঠলো ঠিক আমি যেখানে পৌঁচেছি সেখানেই। আমি প্রথমটায় 'গ্রুস্‌গট' বলে তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই গাড়িটায় এক হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলুম। এ অভিবাদনে লোকটি প্রথম চাষার মত মোটেই হকচকালো না, এবং প্রত্যুত্তরে 'গ্রুস্‌গট' না বলে আর পাঁচজনেরই মত 'গুটেন টাখ'—'সুদিবস' জানালে। তারপর বললে, 'ও গাড়ি আমি একাই ঠেলতে পারি। নাসপাতিগুলোর প্রতি তোমার যদি লোভ হয়ে থাকে তবে অত হ্যাঙ্গামা পোহাতে হবে না—যত ইচ্ছে তুলে নাও।' আমি এই অন্যায় অপবাদে চটিনি—পেলুম গভীর লজ্জা। কী যে বলবো ঠিক করার পূর্বেই সে বললে, 'হাত না দিলেও দিতুম।'

আমি তখন মোকা পেয়ে বললুম, 'নাসপাতি খেতে আমি ভালোবাসি নিশ্চয়ই, এবং তোমারগুলো যে অসাধারণ সরেস সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠেলা দেবার সময় আমার মনে কোনো মতলব ছিল না, এবং তুমিও যে স্বচ্ছন্দে ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তার উঁচুতে গাড়িটাকে ঠেলে তুললে সেও আমি লক্ষ্য করেছি। আমি হাত দিয়েছিলুম এমনি। পাশাপাশি যাচ্ছি, কথা বলতে বলতে যাবো, তখন দুজনাই যে একই কাজ করতে করতে যাবো সেই তো স্বাভাবিক—এতে সাহায্য লোভ কোনো কিছুরই কথা ওঠে না।'

চাষা হেসে বললে, 'তোমার রসবোধ নেই। আর তুমি জানো না, এবারে নাসপাতি এত অজস্র একই সঙ্গে পেকেছে যে এখন বাজারে এর দর অতি অল্পই। এই সামনের গ্রামগুলোর ভিতর দিয়ে যখন যাবে তখন দেখতে পাবে গাছতলায় নাসপাতি পড়ে আছে—কুড়িয়ে নিয়ে যাবার লোক নেই। যত ইচ্ছে খাও কেউ কিছু বলবে না।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশেও এই রেওয়াজ।' কোথায়, কোন দেশ, ইণ্ডিয়ান আর রেড-ইণ্ডিয়ানে পুনরায় সেই গুবলেট তারপর আশ-কথা পাশ-কথা সেরে সর্বশেষে নিজেই বললে, তার হাতখানা গেছে গত যুদ্ধে। হেসে বললে, 'লোকে বলে, তারা করুণার পাত্র হতে চায় না; আমার কিন্তু তাতে কোনো আপত্তি নেই। হাত গিয়ে কত সুবিধে হয়েছে বলবো। গেরস্থালীর কোনো কিছু করতে গেলে বউ বেটি হা হা করে ঠেকায়, যদিও আমি এক হাত দিয়েই দুনিয়ার চোদ্দ আনা কাজ করতে পারি। চাষ-বাস, ফলের ব্যবসা, বাড়ি মেরামতী সবই তো করে যাচ্ছি —যদিও মেয়ে-জামাই ঠ্যাকাবার চেষ্টা করেছিল এবং শেষটায় করতে দিলে, হয়তো এই ভেবে যে কিছু না করতে পেলে আমি হন্যে হয়ে যাব।'

আমি বললুম, 'তোমরা তো খ্রীস্টান; তোমাদের না রববারে কাজ করা মানা।'

লোকটা উত্তর না দিয়ে হকচকিয়ে শুধলে, 'তুমি খ্রীস্টান নও?'

—'না।'

'তবে কি?'

'হীদেন।'

আমি জানতুম, পৃথিবীর খ্রীস্টানদের নিরানুব্বই নয়া পয়সা বিশ্বাস করে, অখ্রীস্টান মাত্রই হীদেন। তা সে মুসলমান হোক, হিন্দু হোক আর বণ্টুই হোক। নিতান্ত ইহুদীদের বেলা হয়তো কিঞ্চিৎ ব্যত্যয়, অবশ্য সেটা পুষিয়ে নেয় তাদের বেধড়ক ঠেঙিয়ে। তাই ইচ্ছে করেই বললুম, হীদেন।

লোকটা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে বললে, 'আমি গত যুদ্ধে ঈশ্বরকে হারিয়েছি। তবে কি আমিও হীদেন? নিজের মনে যেন নিজেকেই শুধলে।'

আমি বললুম, 'আমি তো পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি।'

এবারে সে স্তম্ভিত। এবং শব্দার্থে। কারণ গাড়ি ঠেলা বন্ধ করে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে। শেষটায় বললে, 'এটা কিন্তু আমাকে সোজা করে নিতে হবে। আমাদের পাদ্রী তো বলে, তোমরা নাকি গাছ, জল এই সব পূজো করো, পাথরের সামনে মানুষ বলি দাও।'

আমি বললুম, 'কোনো কোনো হীদেন দেয়, আমরা দিই নে। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে ভক্তি দিলেই যথেষ্ট।'

বোকার মত তাকিয়ে বললে, 'তবে তো তুমি খ্রীস্টান। আমাকে সব-কিছু বুঝিয়ে বলো।'

আমি বললুম, 'থাক। ফেরার সময় দেখা হলে হবে।'

তাড়াতাড়ি বললে, 'সরি, সরি। তুমি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে

পড়েছ। ঐ তো সামনে গ্রাম। আমার বাড়িতে একটু জিরিয়ে যাবে?'

আমি টেরমেরের স্মরণে শুধালুম, 'তোমার বউ বুঝি টেরেমেরের বউয়ের মত খাণ্ডার নয়?'

সে তো অবাক। শুধালে, 'ওকে তুমি চিনলে কি করে?'

আমি সব-কিছু খুলে বললুম। ভারী ফূর্তি অনুভব করে বললে, 'টেরমের একটু দিল-দরিয়া গোছ লোক আর তার বউ একটু হিসেবী—এই যা। আর এ-সব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করলেই চিন্তা বাড়ে। যুদ্ধের সময়, আমার এক জর্মনের সঙ্গে আলাপ হয়—সে বুলগেরিয়াতে বিয়ে করে বসবাস করছিল। তিন বছর সুখে কাটাবার পর একদিন তার স্ত্রীর এক বান্ধবী তাকে নির্জনে পেয়ে শুধলে, "তুমি তোমার বউকে ভালোবাসো না কেন—অমন লক্ষ্মী মেয়ে।" সে তো অবাক। শুধলে, "কে বললে? কি করে জানলে?" বান্ধবী বললে, "তোমার বউই বলেছে, তুমি তাকে তিন বছরের ভিতর একদিনও ঠ্যাঙাওনি!" শোনো কথা!'

আমি অবাক হয়ে শুধলুম, 'আমি তো বুঝতে পারছিনে।'

সে বললে, 'আমিও বুঝতে পারিনি, প্রথমটায় ঐ জর্মন স্বামীও বুঝতে পারেনি, পরে জানা গেল, মেয়েটা বলতে চায়, এই তিন বছর নিশ্চয়ই সে কোনো না কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে দু'একটি হাসিঠাট্টা করেছে, স্বামী দেখেছে, কিন্তু পরে ঠ্যাঙায়নি। তার অর্থ স্বামী তাকে কোনো মূল্যই দেয় না। সে যদি কাল কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়, তবে স্বামী কোনো শোক করবে না, নিশ্চিন্ত মনে আরেকটা নয়া শাদী করবে। ভালবাসলে ওকে হারাবার ভয়ে নিশ্চয়ই ওকে ঠেঙিয়ে সোজা রাখতো।'

আমি বললুম, 'এ তো বড় অদ্ভুত যুক্তি!'

'আমিও তাই বলি। কিন্তু ঐ করে বুলগেরিয়া চলছে। আর এদেশে বউকে কড়া কথা বলেছে কি সে চললো ডিভোর্সের

। তাই তো তোমায় বললুম, ওসব নিয়ে বড্ড বেশী ভাবতে নেই। লড়াইয়ে বহু দেশের জাত-বেজাতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। অনেক দেখেছি। অনেক শিখেছি।'

আমার মনে পড়ল ওরই দেশবাসী রেমার্কের 'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ' বইখানার কথা। সেখানে তো সব কটা সেপাই বাড়ি ফিরছিল—অর্থাৎ যে কটা আদপেই ফিরেছিল—সর্বসত্তা তিক্ততায় নিমজ্জিত করে। আদর্শবাদ গেছে, ন্যায়-অন্যায়-বোধ গেছে; যেটুকু আছে সে শুধু যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অহরহ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে তাদের জন্য। দেশের জন্য আত্মদান, জাতির উন্নতির জন্য সর্বস্ব-ত্যাগ, ফ্রান্সকে পরাজিত করার জন্য জীবনদান—এ সব বললে মারমুখো হয়ে বেআইনী পিস্তল নিয়ে তাড়া লাগায়।

নাসপাতিওলাকে শুধোতে সে বললে সে বইটই পড়ে না। খবরের কাগজ পড়ে বাজারদর জানবার জন্য, আর নিতান্তই যদি কোনো রগরগে খুন কিংবা কেলেঙ্কারী কেচ্ছার বয়ান থাকে। তবে হ্যাঁ, ওর মনে পড়ছে ফিল্মটা নাকি জর্মনীতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল—ওর মেয়ের মুখে শোনা। আমি শুধালুম, 'ছবিটা দেখে ছেলেছোকরাদের লড়াইয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা হবে বলে?'

বললে, 'না, ওতে নাকি জর্মনদের বড় বর্বররূপে দেখানো হয়েছে বলে।'

তখন আমার মনে পড়ল, ফ্রান্সেও দেখাবার সময় যে অংশ ফরাসী নারীরা ক্ষুধার তাড়ায় জর্মন সেপাইদের কাছে রুটির জন্য দেহ বিক্রয় করার ইঙ্গিত আছে সেটা কেটে দেওয়া হয়।

অনেকক্ষণ দুজনাই চুপচাপ। নাসপাতিওলা ভাবছে। হঠাৎ বললে, 'পিছন পানে তাকিয়ে আর লাভ কি? যারা মরেছে তারা গেছে। যারা পাগল হয়ে গিয়েছে, যাদের মুখ এমনই বিকৃত হয়েছে যে দেখলে মানুষ ভয় পায়, যাদের হাত পা গিয়ে অচল হয়ে আছে নিছক মাংসপিণ্ডবৎ তাদের বড় বড় হাসপাতালে লুকিয়ে

রাখা হয়েছে আর আত্মীয়স্বজনদের বলা হয়েছে তারা মারা গিয়েছে—এরাও নাকি ফিরে যেতে চায় না। আর আমার হাল তো দেখছই।'

আমাদের গ্রামের সব কিছু থিতিয়ে যাওয়ার পর একটা ট্র্যাজেডির দিকে সকলেরই নজর গেল। একটা ছেলে গ্রামে ফিরে এসে শোনে, তার অবর্তমানে তার বাগদত্তা মেয়েটি পরপুরুষের সঙ্গে প্রণয় করেছিল। এতে আর নূতন কি? লড়াইয়ের সময় সব দেশেই হয়েছে এবং হবে। মেয়েটা তবু পদে আছে—জারজ সন্তান জন্মায়নি। আর সেই দু'দিনের প্রেমিক কবে কোথায় চলে গেছে কে জানে।

এ অবস্থায় আর পাঁচটা ছেলে অন্য মেয়ে নেয়, কিংবা ক্ষেমাঘেন্না করে আগেরটাকেই বিয়ে করে। এ হয়ে গেল মনমরা। সমস্ত দিন ছন্নের মত ঘুরে বেড়ায়, কারো সঙ্গে কথাবার্তা কয় না, আমাদের পীড়াপীড়িতেও বিয়ার খেতে আসে না। মেয়েটা নাকি একাধিকবার তার পায়ে ধরে কেঁদেছে। সে কিচ্ছু বলে না।

ছোট্ট গাঁ, বোঝো অবস্থাটা। গির্জেয়, রাস্তায়, মুদির দোকানে প্রতিদিন আমাদের একে অন্যের সঙ্গে যে কতবার দেখা হয় ঠিক-ঠিকানা নেই। মেয়েটা করুণ নয়নে তাকায়, ছেলেটা ঘাড় ফিরিয়ে নেয়। আমরা যারা তখন সামনে পড়ি, বোঝো আমাদের অবস্থাটা! ছেলেটা সামনে পড়লে আমাদের মুখ গম্ভীর, মেয়েটা সামনে পড়লে অন্যদিকে তাকাই, আর দুজনা সামনে পড়লে তো চরম। ছেলেটা যখন মুরুব্বী, পুরনো দিনের ইয়ার-বক্সী ইস্তেক পাদ্রী সায়েব কারো কথায় কান দিলে না তখন মেয়েটাকে বলা হল সে যেন অন্য একটা বেছে নেয়। যদিও বরের অভাব তবু সুন্দর এবং পয়সাওয়ালার মেয়ে বলে পেয়েও যেতে পারে। দেখা গেল, সেও নারাজ।'

নাসপাতিওলা রাস্তায় থেমে বলল, 'এই যে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি। চলো ভেতরে।'

আমি বললুম, 'না ভাই, মাফ করো' 'তবে ফেরার সময় খবর নিয়ো। বাড়ি চেনা রইল।' আমি বললুম, 'নিশ্চয়। কিন্তু ওদের কি হল?'

'কাদের? হ্যাঁ, ঐ দুটোর। একদিন ঐ হোথাকার (আঙুল তুলে দেখালে) ডোবায় পাওয়া গেল লাশ।'

আমি শুধালুম, 'ছেলেটার?'

'না, মেয়েটার।'

'আর ছেলেটা?'

'এখনো ছন্নের মত ঘুরে বেড়ায়। এক্ষুনি আসবে। থাকো না—আলাপ করিয়ে দেব।'

আমি পা চালিয়ে মনে মনে বললুম, এ গ্রাম বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

সিনেমার কল্যাণে আজকাল বহু নৈসর্গিক দৃশ্য, শহর-বাড়ি, পশুপক্ষী বিনা মেহন্নতে দেখা যায়। এমন কি বাস্তবের চেয়েও অনেক সময় সিনেমা ভালো। বাস্তবে বেলকনি থেকে রানীকে আর কতখানি দেখতে পেলুম?—সিনেমায় তাঁর আংটি, জুতোর বকলস, হ্যাটের সিল্কটি পর্যন্ত বাদ গেল না। আলীপুরে গিয়ে বাঘ-সিঙি না দেখে সিনেমাতে দেখাই ভালো—ক্যামেরামেন যতখানি প্রাণ হাতে করে ক্লোজ-আপ নেয় অতখানি ঝুঁকি নিতে আপনি আমি নারাজ।

বিলিতি ছবির মারফত তাই ওদের শহর, বার্, রেস্টুরেন্ট, নাচ, রাস্তা-বাড়ি, দালান-কোঠা, আমাদের বিস্তর দেখা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গ্রামের ছবি এরা দেখায় অল্পই। গ্রামের বৈচিত্র্যই বা কি, সেখানে রোমান্সই বা কোথায়? অন্তত সিনেমাওলাদের চোখে সেটা ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে এখনো আর্টিস্টদের কাছে। ইয়োরোপীয় গ্রাম্যজীবনের ছবি এখনো তাঁরা এঁকে যাচ্ছেন আর পুরনো দিনের মিইয়ে, ভান গখের তো কথাই নেই।

আমাদের গ্রামে সাধারণত সদর রাস্তা থাকে না। প্রত্যেক

চাষা আপন খড়ের ঘরের চতুর্দিকে বাড়ি ঘিরে রেখেছে আম-কাঁঠাল সুপুরি-জামের গাছ দিয়ে—কিছুটা অবশ্য ঝড় থেকে কুঁড়েগুলোকে বাঁচাবার জন্য। এখানে সে ভাবনা নেই বলে গ্রামে সদর রাস্তা থাকে, তার দু'দিকে চাষাভূষো, মুদী, দর্জি, কসাই, জুতোওলা সবাই বাড়ি বেঁধেছে। আর আছে ইস্কুল, গির্জে আর পাব্—জর্মনে লোকাল (অর্থাৎ 'স্থানীয়' মিলনভূমি)। এইটেকেই গ্রামের কেন্দ্র বললে ভুল বলা হয় না।

রাস্তাটা যে খুব বাহারে তা বলা যায় না। শীতকালে অনেক সময় এত বরফ জমে ওঠে যে চলাফেরাও কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে—আমাদের দেশে বর্ষাকালে যে রকম হয়। শুধু বাচ্চাদেরই দেখতে পাওয়া যায় তারই উপর লাফালাফি করছে, পেঁজা বরফের গুঁড়ো দিয়ে বল বানিয়ে একে অন্যকে ছুঁড়ে মারছে।

শুনেছি কট্টর প্রোটেস্টাণ্ট দেশে—স্কটল্যাণ্ড না কোথাও যেন—রববার দিন কাচ্চাবাচ্চাদেরও খেলতে দেওয়া হয় না! এখানে দেখি, ছেলে এবং মেয়েরাও রাস্তার উপর একটা নিম্-চুবসে-যাওয়া ফুটবলে ধপাধপ কিক্ লাগাচ্ছে। এদের একটা মস্ত সুবিধে যে জাতিভেদ এদের মধ্যে নেই। দর্জীর ছেলে মুচির মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে শুঁড়ির ছেলেকেও পারে। পাদ্রির ছেলেকেও পারতো—কিন্তু কাথলিক পাদ্রির বিয়ে বারণ। আফগানিস্থানে যে রকম মেয়েদের মোল্লা হওয়া বারণ—দাড়ি নেই বলে।

একে ট্র্যাম্প তায় বিদেশী, খেলা বন্ধ করে আমার দিকে যে প্যাট প্যাট করে তাকাবে তাতে আর আশ্চর্য কি। এমন কি ওদের মা বাপরাও। ওদের অনেকেই রবির সকালটা কাটায় জানলার উপর কুশন্ রেখে তাতে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। প্রথম প্রথম আমার অস্বস্তি বোধ হত, শেষটায় অভ্যাস হয়ে গেল। সেটা অবশ্য পরের কথা।

ছবিতে দেখেছিলুম ছোঁড়াদের একজন চার্লির পিছন থেকে এসে একটানে তার ছেঁড়া শার্ট ফর ফর করে একদম হুটুকরো করে দিলে—সেটা অবশ্য শহরে। এবং আমার শার্টটা শক্ত চামড়ার তৈরী, ওটা ছেঁড়া ছোঁড়াদের কর্ম নয়। কিন্তু তবু দেখি গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর ফন্দি-ফিকির আঁটছে। একটি দশ বারো বছরের মেয়েই দেখলুম ওদের হন্টর-ওয়ালী, ফিয়ারলেস নাদিয়া, মিস্ ফ্রন্টিয়ার মেল, ডাকুকী দিল্‌রুবা, জম্বুকী বেটী যা খুশী বলতে পারেন। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই সে দল ছেড়ে গটগট করে এসে প্রায় আমার রাস্তা বন্ধ করে মধুর হাসি হেসে বললে, 'সুপ্রভাত'। সঙ্গে সঙ্গে একটি মোলায়েম কার্টসিও করলে—অর্থাৎ বাঁ পাটি সোজা সটান পেছিয়ে দিয়ে, ডান হাঁটু ইঞ্চি তিনেক নিচু করে, ছহাতে ছপাশের স্কার্ট আলতো ভাবে একটু উপরের দিকে তুলে নিয়ে বাও করলে। এই কার্টসি করাটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শহরে লোপ পেয়েছে, গ্রামাঞ্চলে তখনো ছিল, এখনো বোধ করি আছে।

এরা 'গ্রুসগট্' হয়তো জীবনে কখনো শোনেইনি। এদের জন্ম প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর। তাই 'গুটেন মর্গেন' বলার পূর্বে প্রথম ছাড়লুম একখানা মৃদু হাস্য—একান ওকান ছোঁয়া। আমার মুখখানাও বোম্বাই সাইজের। কলাটা আড়াআড়ি খেতে পারি। স্যাণ্ডউইচ খাবার সময় রুটির মাখম আকছারই দু'কানের ডগায় লেগে যায়।

ইতিমধ্যে মেয়েটি অতিশয় বিশুদ্ধ ব্যাকরণে আমাকে যা শুধালো তার যদি শব্দে শব্দে অনুবাদ করা হয় তবে সেটা বাইবেলের ভাষার মতই শোনাবে। 'আপনি ইচ্ছে করলে বললে হয়তো বলতেও পারেন এখন কটা বেজেছে।' পশ্চিম ইয়োরোপীয় ভাষাগুলোকে সব্‌জন্‌ক্টিভ মুড তথা কণ্ডিশনাল প্রচুরতম মেকদারে

লাগালে প্রভূততম ভদ্রতা দেখানো হয়। বাঙলায় আমরা অতীতকাল লাগিয়ে ভদ্রতা দেখাই। শ্বশুরমশাই যখন শুধোন, 'বাবাজী তাহলে আবার কবে আসছ?' আমরা বলি, 'আজ্ঞে, আমি তো ভেবেছিলুম—'অর্থাৎ আমি যা ভেবেছিলুম কথাটা আপনার সম্মতি পাবে না বলে প্রায় নাকচ করে বসে আছি। তবু আপনি নিতান্ত জিজ্ঞেস করলেন বলে বললুম।

তা সে যাক্‌গে। মেয়েটি তো দুনিয়ার কুল্লে সব্‌জন্‌ক্টিভ একেবারে কপিবুক স্টাইলে, ক্লাস-টীচারকে খুশী করার মত ডবল হেল্‌পিং দিয়ে প্রশ্নটি শুধোলে। আমিও কটা সবজঙ্কটিভ লাগাব মনে মনে যখন চিন্তা করছি এমন সময় গির্জার ঘড়িতে ঢং করে বাজল একটা। আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলল। কোনো কথা না বলে ডান হাত কানের পেছনে রেখে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেই দিকে কান পাতলুম।

ইতিমধ্যে দু চারটে ছোঁড়া রাস্তা ক্রস্ করে মেয়েটার চতুর্দিকে দাঁড়িয়েছে। সে আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে ওদের বললে, 'বোধহয় জর্মন বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না।'

আমি বললুম, 'বোধহয় তুমি জর্মন বলতে পারো, কিন্তু শুনতে পাও না।'

অবাক হয়ে শুধোলে, 'কি রকম?'

আমি বললুম, 'গির্জার ঘড়িতে ঢং করে বাজলো একটা—বদ্ধ কালাও শুনতে পায়। আর তুমি আমায় শুধোলে কটা বেজেছে। গির্জার ঘণ্টা যে শুনতে পায় না, সে আমার গলা শুনতে পাবে কি করে? তাইতো উত্তর দিইনি।' তারপর ছোঁড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কি বলো, ভাইরা সব। ও নিশ্চয়ই লড়াইয়ে গিয়েছিল। সেখানে শেল্‌শকে কালা হয়ে গিয়েছে—আহা বেচারী!'

সবাই তো হেসে লুটোপুটি। ইস্তেক মেয়েটি নিজে।

[ভবঘুরে]

উপন্যাস ও ছোটগল্প

অবিশ্বাস্য

শব্‌নম্‌

'ভেন্দেত্তা'

কর্নেল

নবাব-জাদী

স্নব

অবিশ্বাস্য

বরঞ্চ ইংরেজ সকাল বেলার বেকন আণ্ডা বর্জন করে দেবে, বরঞ্চ ইংরেজ বড়দিনে গির্জে কট করতে পারে, এমন কি, শাশুড়ীর জন্মদিনও ইংরেজের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ক্লাব-গমন বন্ধ করা ইংরেজের পক্ষে হৌস-অব-কমনস্ পুড়িয়ে দেবার শামিল —মুসলমানের কলমা ভুলে যাওয়া, হিন্দুর গো-মাংস ভক্ষণের তুলনায় চুলে চিমটি কাটার মত।

ডেভিড, মেবল্ তিন মাস ধরে ক্লাবে যায় নি!

যে মীরপুরের ছোট মেম ডুমুরের ফুল, সাপের ঠ্যাঙ দেখেছেন বলে ক্লাবে দাবি করে থাকেন, তাঁকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হল, মধুগঞ্জের তাবৎ খানসামা-বাটলার, মেথর-ঝাড়ুদারকে ফালতো চা বখশিশ দিয়েও তিনি কারণটা বের করতে পারেননি।

এসব বাবদে সোজাসুজি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ইংরেজের সর্বশাস্ত্রে বারণ। একমাত্র পাদ্রীদের কিছু হক আছে। বুড়ো পাদ্রী সন্তর্পণে প্রশ্ন শুধিয়ে নিরাশ হলেন। বুড়ী মেম একবার ডেভিডের মফস্বলবাসের সময় মেব্লের সঙ্গে তেরাত্তির কাটান। চতুর্দিকে কড়া নজর ফেলে, এমন কি শেষটায় জিজ্ঞেসবাদ করেও কোনো খবর যোগাড় করতে পারলেন না।

বুড়ী বেদনা পেয়েছিলেন। তৃতীয় রাত্রিতে ছিল পূর্ণিমা। জানলা দিয়ে চোখে চাঁদের আলো পড়তে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখেন মেবল্ নেই। পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে দেখেন মেবল্ ডেকচেয়ারে সামনের দিকে ঝুঁকে দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে—তার দীর্ঘ বাদামী চুল হাত মুখ ছাপিয়ে ফেলেছে। বুড়ী মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, চুলে আঙুল চালাতে চালাতে হঠাৎ চুলের ডগাগুলো ভেজা ঠেকল।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি পাদ্রী টিলার বহু তরুণী, বিস্তর যুবতীর অনেক বুকফাটা কান্না দেখেছেন, কোনো কোনো স্থলে সলা-পরামর্শ দিয়ে নানা দিকে নানা রকম কলকাঠি চালিয়ে এদের মুখে হাসি ফোটাতেও সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু এ নারীর বেদনা কী হতে পারে, সে সমস্যার সন্ধানে কোন দিকে হাতড়াতে হবে তার সামান্যতম অনুমানও তিনি করতে পারলেন না।

বুড়ো পাদ্রী সব শুনে বললেন, 'এসো, দুজনাতে মিলে প্রার্থনা করি।'

সোম একদিন ও-রেলিকে প্রশ্ন শুধাল মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে, 'এনি ট্রাবল ?'

উত্তরের জন্য মাত্র এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে সোম গুড বাই বলে বারান্দা থেকে নেমে, লিচুতলা দিয়ে, গেট খুলে বড় রাস্তায় নেমে গেল।

ও-রেলি ভাবলে মাত্র দুটি কথা, 'এনি ট্রাবল !'

স্মরণই করতে পারল না, তার জীবনে কখনো কোনো শক্ত ট্রাবল এসেছিল কি না যেটাকে সে কাত করতে পারেনি। সে তাগড়া জোয়ান, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট না হলেও ভালো, গায়ের জোরে কমতি নেই, আর পাঁচটা ইংরেজের মত তিনটে কথা বলতে গেলে সাতবার হোঁচট খায় না—তার আবার ট্রাবল। হাঁ, একটা সামান্য ট্রাবলের কথা মনে পড়ছে বটে। এমনিতে তার মুখে শুধু খই ফোটে না, টোস্ট পর্যন্ত সেঁকা যায়, তবে প্রেমের ব্যাপারে একটু মুখচোরা বলে মেবল্‌কে বিয়ের প্রস্তাব পাড়তে তার তিনটে রবির সন্ধ্যা লেগেছিল বটে কিন্তু তারপরের অবস্থা দেখে সে থ— মেবল্ বাহান্ন রববারের আগের থেকেই নাকি তাকে বিয়ে করবে বলে মনস্থির করে ট্রসোর ডিজাইন বানাতে লেগে গিয়েছিল।

ইস্কুলের ব্লু, চাকরির জন্য পরীক্ষা, রাগবিতে একখানা পাঁজর গুঁড়িয়ে যাওয়া এসব ও-রেলির কাছে কখনো ট্রাবল বলে মনে

হয়নি। তার একমাত্র ভয় ছিল মেবল্ যদি তাকে গ্রহণ না করে। সেই মেবল্‌কে পেতে তার তিনটে রববার—অর্থাৎ একুশ দিনের দিবারাত্র দুশ্চিন্তা—লেগেছিল বটে, কিন্তু আজকের তুলনায় সে কত সহজ। সেদিন পথহারা ও-রেলির সামনে থেকে হঠাৎ যেন কুয়াশা কেটে যায়, আর সমুখে দেখে বসন্তের মধুরৌদ্রে, নীল আকাশের পটে আঁকা মেবল্। 'উতলা পবন বেগে মেঘে মেঘে' যেন তার খোলা চুল উড়ে উড়ে চলেছে।. হাতে তার একটি ছোট ফুল। তারই এক-একটা পাপড়ি ছিঁড়ছে আর বলছে 'হি লাভস্ মী', পরেরটায় বলছে 'হি লাভস্ মী নট্' এই করে করে ভাগ্য-গণনা করছে। সর্বশেষের পাপড়িতে 'হি লাভস্ মী' না 'হি লাভস্ মী নট'-এ এই জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান মিলবে।

ও-রেলির মনে পড়ল, মেবল্ সেদিন তার কানের ডগায় চুমো খেয়ে বলেছিল, 'আমি সব সময়ই জানতুম, শেষ পাপড়ি 'হি লাভস্ মী-তেই শেষ হবে। একদিন যখন হল না তখন রীতিমত হকচকিয়ে গেলুম। পরে দেখি একটা পাপড়ি আগের থেকেই ছিঁড়ে গিয়েছিল—টুকরোখানা তখনো বোঁটায় লেগে আছে।'

সেসব দিন চলে যাওয়ার পর আজ সোম জিজ্ঞেস করলে, এনি ট্রাবল!

তারপর আরো তিন মাস কেটে গিয়েছে। এ তিন মাসের ভিতর আরো পরিবর্তন ঘটেছে। ও-রেলিরা ক্লাব দূরে থাক কারো বাড়িতে পর্যন্ত যায়নি। তার থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল তারাও চায় না কেউ তাদের বাড়িতে আসুক। শেষ পর্যন্ত এক পাদ্রী মেম ছাড়া আর কেউ ও-রেলি টিলায় আসত না এবং তিনিও আসতেন যেন অতিশয় দায়ে পড়ে, অন্ধভাবে অন্ধকারে কোন এক ভবিষ্য অমঙ্গল আবছা-আবছা বুঝতে পেরে মানুষ যে-রকম আত্মজনের কাছে এসে দাঁড়ায়।

তারপর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের খরদাহের পর নামল বর্ষা। কলকাতার

বদখদ দালান-কোঠার উপর বর্ষা যখন নামে তখন বড়বাজারের বেরসিক মারোয়াড়ী পর্যন্ত আকাশের দিকে দু-একবার না তাকিয়ে থাকতে পারে না, আর কলেজের মেয়েরা নাকি ছাদের উপর বৃষ্টির জলে ভেজবার অছিলা করে মেঘের জলের সঙ্গে চোখের জল মেলায়। আর তাতে আশ্চর্য হবারই বা কী আছে! ছেলেরা তো কলেজ পাশের পর অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রেম, বিয়ে-শাদি মন থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে খেদিয়ে দেয়; মেয়েরাই শুধু অজানা ভবিষ্যৎকে অতখানি ডরায় না বলে বে-এক্তেয়ার প্রেমে পড়ে আর তারই প্রকাশ খুঁজতে গিয়ে রবিঠাকুরের গান আর কবিতা বাঁচিয়ে রাখে। তবে কি রবিঠাকুর এ তত্ত্বটা জানতেন, তাই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের গান শিখিয়েছেন অনেক বেশী সযত্নে?

মধুগঞ্জে এসব বালাই নেই—মারোয়াড়ী নেই বললেও চলে, কলেজ নেই তাই কলেজের মেয়েও নেই। মধুগঞ্জী বালিকাদের বিয়ে হয়ে যায় চোদ্দ পেরতে না পেরতেই। এ বিষয়ে ওয়েলশ পাদ্রী সাহেবও নেটিভ বনে গিয়েছেন, রুথ্-মেরীদের ষোলো পেরতে না পেরতেই বরের সন্ধানে লেগে যান। তাঁর যুক্তি—প্রাচ্যে মেয়েরা বিবাহযোগ্যা হয়ে যায় অল্প বয়সেই, এদেশে বিলিতি কায়দা মেনে নিলে শুধু অনর্থেরই সৃষ্টি হয়।

বিবাহ মাত্রই প্রেমের গোরস্তান কিন্তু শান্তির আস্তানা।

তাই এখানে কোনো তরুণী অকারণ বেদনায় কাতর হয়ে রবিঠাকুরের কবিতা-গান নিয়ে নাড়াচাড়া করে না। রবিঠাকুর তাই সে যুগে মধুগঞ্জে অচল।

ঠিক সেই কারণেই প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধ মধুগঞ্জে মদনভস্মের মত শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এখানকার লোক নববরষণে ময়ূরের মত পেখম তুলে নাচে না, আবার উত্তরের পাহাড় পেরিয়ে দলে দলে নবীন মেঘ এসে যখন শহরের বনের উপর

আছাড় খেয়ে পড়ে তখনও মানুষ সেখানে বর্ষার মধুর দিকটা সম্বন্ধে অচেতন হতে পারে না। আর হবেই বা কী করে? প্রথম যেদিন মধুগঞ্জে কদম ফুল ফোটে সেদিন তার গন্ধে সমস্ত শহর ম-ম করতে থাকে। সে গন্ধে নেশা আছে—রায়বাহাদুর চক্রবর্তীর মত রস-কষহীন মানুষকেও দেখা যায় বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় এক ডাল কদম হাতে নিয়ে ফিরছেন।

কিন্তু পুব বাঙলা আসামের সায়েবরা বর্ষাকালে প্রায় পাগল হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা বাগানের ছোট ছোট টিলাতে নির্জন বাসে থাকতে বাধ্য হয়। পাঁচ মাইলের ভিতরে একটা ইংরেজ নেই যার সঙ্গে ছুটি কথা কইতে পারে, দিনের পর দিন অনবরত বৃষ্টি, রাস্তা-ঘাট জলে-জোয়ারে ভেসে গিয়েছে, ক্লাবে যাবার কথাই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত গ্রামোফোন বাজানো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে বেশীর ভাগ সায়েবরা এই সময় দিশী রমণী গ্রহণ করে। কেউ কেউ ম্যালেরিয়ায় তাদের শুশ্রূষা লাভ করে সেরে ওঠার পর, আর কেউ কেউ একটানা নির্জনবাসের ফলে হন্যে হয়ে গিয়ে।

ও-রেলির মাথার ইস্ক্রুপগুলো জোর টাইট করে বসানো। বর্ষা তাকে কাবু করতে পারে না। তার উপর মেবল্‌ও পাশের চেয়ারে বসে।

তবু বোঝা গেল, এ বর্ষা ও-রেলিকে পর্যন্ত অনেকখানি ঘায়েল করে দিয়েছে। ও-রেলি মুষড়ে পড়েছে।

মাদামপুরের বড় সায়েব বললেন, 'এ কথাটা আমি কী করে বিশ্বাস করি বল তো, পার্সি। মেবল্‌ মিশুকে হোক আর না-ই হোক, ওর মত ডিসেন্ট গার্ল আমি জীবনে অল্পই দেখেছি। কলেজ পর্যন্ত পড়েছে, উত্তম রুচি। সে কী করে অতখানি স্টুপ করবে?

তুমি ছাড়া অন্য কেউ এ কথাটা বললে তার সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়ে যেত।'

বিষ্ণুছড়ার সায়েবের বয়স যদিও কম তবু এ অঞ্চলে তার খ্যাতিপ্রতিপত্তি বিচক্ষণ লোক হিসেবে। আর পরচর্চা, গুজোব রটানো থেকে তিনি থাকেন সব সময়েই দূরে এবং আশ্চর্য, যারা এসব জিনিসে কান দেয় না পাকা খবর তারাই পায় বেশী এবং আর সকলের আগে। বললেন, 'আমার কাছে এখনো সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে তো বললুম, কিছুটা বিশ্বাস না করলে তোমার কাছে আমি কথাটা পাড়তুম না। অবশ্য একথাও আমি বলব, এসব জিনিস আমি শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করারই চেষ্টা করি।'

'তোমার মেম, মীরপুরের মেম, এরা সব জানতে পেরেছে?'

'নিশ্চয়ই এখন পর্যন্ত না। শার্লট জানতে পারলে আমাকে রাত তিনটেয় জাগিয়ে খবরটা দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মীরপুর ছুটত এমিলিকে টেক্কা মারবার জন্য—অ্যাণ্ড ভাইস-ভার্সা। তবে খুব বেশী দিন গোপন থাকবে না। সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক যে-সব মেয়েরা মেব্‌লের রুচিশীল ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেদের ছোট মনে করত তাদের জিভের লকলকানি খুব শিগগিরই আরম্ভ হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যের পর টেনিস লনের এক কোণে বসে দুই সায়েব অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ভাবলেন। মধুগঞ্জ অঞ্চলের ইংরেজ কলোনির আসল সর্দার এঁরাই। বিষয়টি তাঁরা আলোচনা করেছিলেন সেই কর্তব্যবোধ থেকে—এ সম্বন্ধে তাঁরা কিছু করতে পারেন কি না।

শেষটায় মাদামপুর হুঙ্কার দিলেন, 'বয়, দো ব্রা পেগ্‌।'

খবর কিংবা গুজোব যাই হোক, ব্যাপারটা মারাত্মক—গড ড্যাম্ সিরিয়স—মেবল্ নাকি নেটিভ বাটলারটার প্রতি অনুরক্ত।

ঐ মিশকালো, অষ্টপ্রহর মদে-মাতাল-রাঙা-চোখওলা হোঁৎকা লোকটার প্রতি মেবল্ অনুরক্ত, একথা কে বিশ্বাস করবে? একমাত্র 'স্ত্রীচরিত্র দেবতারাও জানে না' তত্ত্ব মানলে সব কিছুই বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু এই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য স্ত্রী-নিন্দার সামনে দাঁড়িয়ে বরঞ্চ জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে যায়, দেবতারা না হয় দেবীদের চরিত্র চিনতে পারেননি, তাই বলে পুরুষকেও তার স্ত্রী-জাত সম্বন্ধে এই অজ্ঞতা মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিয়ে স্ত্রী-জাতকে অপমান এবং নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে লাঞ্ছনা করতে হবে?

কিন্তু এ-সব তো পরের কথা। প্রথমেই যেটা মনে আসে সেইটেই মাদামপুরের বড় সায়েব বিষ্ণুছড়াকে বললেন—'হাতাহাতি হয়ে যেত'। তারপর হুড়হুড় করে মনে আসে একসঙ্গে দশটা প্রতিবাদ; ও-রেলির মত সুপুরুষকে ছেড়ে? এক বৎসর যেতে না যেতে? ও-রেলির এতখানি আদর-যত্ন পেয়েও? ও-রেলি কি তবে জানে না?

ঠাণ্ডা-মাথা মাদামপুর বললেন, 'পার্সি, তবে কি তাই তারা পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে?'

বিষ্ণুছড়া একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু মেলামেশাটা বজায় রাখলেই তো মানুষের সন্দেহ হত কম।'

মাদামপুর দুই ঢোকে ডবল হুইস্কি খতম করে বললেন, 'মাই গড, নেটিভরা জানতে পারলে লজ্জার সীমা থাকবে না। ওঃ!'

'তা ঠিক, তবে কিনা জিনিসটা যখন চা-বাগিচার ভিতরে আগেও হয়েছে তখন—'

মাদামপুর বাধা দিয়ে বললেন, 'সে হয় শহর থেকে দূরে, বনের ভিতর, টিলার উপরে।'

'সে কথা ঠিক, কিন্তু পাদ্রী-টিলার বাচ্চারা কোথা থেকে আসে সে তত্ত্বও তো নেটিভদের অজানা নয়।'

মাদামপুর একটুখানি অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'সে তো সাধারণ-

ভাবে, যে রকম ধরো অনাথাশ্রম হয়। কিন্তু এখানে যে ব্যক্তি-বিশেষ, সমাজ যাকে চেনে। তা আবার এ. এস. পি.র মেম! মাই গড! আমি ভাবতুম, পুরুষরা এসব ঢলাঢলিতে যতখানি নিচু হতে পারে, স্ত্রীলোকেরা ততখানি পারে না।'

দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। দেখা গেল বিষ্ণুছড়া আর মীরপুরের মেম আসছেন। সাপে নেউলে গল্প করতে করতে আসছেন এ জিনিস প্রাণিজগতে কখনোই দেখা যায় না। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন এক লেঙ্গোটার ইয়ার—উহুঁ, এক ফ্রকের সই। অথচ এঁরা আসছেন ইনি ওঁকে ছোবল মারতে মারতে, উনি এঁকে কামড় দিতে দিতে। চোখ লাল না করে, দাঁত না খিঁচিয়ে, ফণা না বাগিয়ে ঝগড়া করতে পারে একমাত্র মানুষই—অবশ্য স্ত্রীলোকেরাই পায় মাইকেল ও-রেলি শীল্ড—পুরুষের কপালে কনসোলেশন প্রাইজ।

গুজোবটা ছড়াতে কত দিন লেগেছিল বলা শক্ত। গুজোবের স্বভাব হচ্ছে যে প্রথম ধাক্কাতেই সে যদি কিছুটা সাহায্য না পায়, তবে কেমন যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়া যদি সেটার টুঁটি চেপে না ধরতেন, তবে কী হত বলা যায় না; এ স্থলে গুজবটাকে ফের চাঙ্গা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বেশ একটুখানি সময় লেগেছিল।

মধুগঞ্জের 'আণ্ডাঘরে' গুজোব-মাত্রেরই জন্মমৃত্যু জরা-যৌবনের বেশ একটা সুনির্দিষ্ট ঠিকুজি আছে। গুজোবের জননী যদি মীরপুরের ছোট মেম হন, তবে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অবশ্য জানা কথা, বিষ্ণুছড়ার বড় মেম তখন আঁতুড়ঘরেই বাচ্চাটাকে নুন খাইয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেন এবং আরো জানা কথা, বেশীর ভাগ স্থলেই বাচ্চা ঘোঁত-ঘোঁত করে নুনটা খেয়ে ফেলে দিব্য ট্যাঁ-ট্যাঁ করে দুধের জন্য আপন ক্ষুধা জানিয়ে দেয়। তার কারণ বিষ্ণুছড়ার বড় মেম পাঁঠা কাটতে চান তার পদ-মর্যাদার ভার দিয়ে—তিনি

বড় মেম, মীরপুর ছোট মেম—আর মীরপুর কাটে ধার দিয়ে। তার উপর ক্লাবে ছোট মেমদের সংখ্যা বেশী, কাজেই তারা সদলবল সায় দেয় মীরপুরের কথায় কথায়—হায়, কার্ল মার্কস্ যদি আণ্ডাঘরে একটা ঢুঁ মেরে যেতেন, তবে তিনি 'পতি বুর্জুয়াজী' আর 'অৎ বুর্জুয়াজী'র আড়াআড়ি সম্বন্ধে কত তত্ত্বকথা না রপ্ত করে যেতে পারতেন!

আবার বিষ্ণুছড়া যদি কোনো গুজোবের 'গড্মাদার' হন তবে সে বেচারীকে ষষ্ঠী-পূজোর দিন পর্যন্ত বাঁচতে হয় না।

মেব্লের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, তার সম্বন্ধে গুজোবটা বিষ্ণুছড়া ক্লাবে বাপ্তিস্ম করেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মীরপুর বললেন, এ গুজোব তাঁর কানে এসেছে বহুদিন হল। তিনি এটা একদম বিশ্বেস করেননি। ও-রেলি বিপ্লবীদের পিছনে লেগেছে বলে নেটিভরা হিংসেয় এইসব আজগুবী যাচ্ছেতাই কেচ্ছা রটাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। সে ময়নাতদন্তে মেব্লের গোপনতম অন্তবস্ত্রের সাইজ, রঙ কিছুই বাদ পড়ল না। সেদিন কিন্তু আরেকটু হলে মীরপুরই লড়াইয়ে হেরে যেতেন, কারণ, দেখা গেল মেব্লের সৌন্দর্যে হিংসুটে খাটাশমুখোগুলো পাইকারি হিসেবে জুটেছে বিষ্ণুছড়ার পিছনে। আরেকটু হলে মীরপুরকে রণে ভঙ্গ দিতে হত, কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার ফিফ্থ কলাম জুটে গেল, বিষ্ণুছড়ার বড় সায়েবের সাহায্যে।

এসব কেলেঙ্কারি-কোঁদল মেমেরা করে সায়েবদের বাদ দিয়ে। আজকের আলোচনা কিন্তু এতই তপ্ত-গরম হয়ে উঠেছিল যে, বিষ্ণুছড়ার বড় সায়েব যে কখন এসে একপাশে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করেনি।

হঠাৎ এক সময় তাঁর স্ত্রীর কথা কেটে দিয়ে বললেন, 'শার্লট, তুমি যে কথা বলছ সেটা কি খুব রুচিসঙ্গত?'

তারপর আর পাঁচজনের দিকে একটুখানি বাও করে, 'আপনারা আমাকে মাপ করবেন,' বলে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেলেন।

সবাই থ। একে অন্যের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। বরঞ্চ যদি বিষ্ণুছড়া তার খাণ্ডার মেমের কথার প্রতিবাদ না করে কোট-পাতলুন ফেলে দিয়ে আণ্ডাখেলার টেবিলের উপর ধেই-ধেই করে নেচে নেচে ধর্মসঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করতেন তবু আণ্ডাঘর এতখানি আশ্চর্য হত না, কারণ এ অঞ্চলে সবাই জানে, বিষ্ণুছড়া তাঁর মেমকে ডরান কুলীদের স্ট্রাইকের চেয়েও বেশী। তাঁর যে এতখানি দুঃসাহস হতে পারে সেকথা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। সবাই থ। না, থ নয়—একেবারে দ, ধ দন্ত্য ন—বর্ণমালার শেষ হরফ পর্যন্ত।

সম্বিতে ফেরার পর মীরপুরের ছোট মেম ফিসফিস করে এস. ডি. ও'র মেমকে বললেন, 'নিশ্চয়ই এক জালা হুইস্কি খেয়েছে, বাঘের চর্বির সঙ্গে কক্‌টেল বানিয়ে।'

এস. ডি. ও'র মেমের সুরসিকারূপে খ্যাতি ছিল। ক্লাব থেকে বেরতে বেরতে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা ছবিতে দেখেছিলুম, হুইস্কির পিপে থেকে ছ্যাঁদা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হুইস্কি চুঁইয়ে বেরচ্ছে। এক ইঁদুরছানা সেইটে চুকচুক করে চুষে হয়ে গিয়েছে বেহেড মাতাল। লাফ দিয়ে পিপের উপর উঠে আস্তিন গুটিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'ঐ ড্যাম্ ক্যাট্টা গেল কোথায়? নিয়ে এসো এইখেনে—আমি ব্যাটার সঙ্গে লড়ব'।'

মীরপুর বললেন, 'ভালো গল্প; টম্‌কে বলতে হবে। আপিসের কাউকে ডিসমিস করতে হলে সে সেই সাত-সকাল ছটার সময় হুইস্কি খেয়ে আপিস যায়।'

এস. ডি. ও-মেম বললেন, 'আজ রাত্রে বেচারী পার্সির ডিনার জুটবে না। ওকে 'পট-লাকে' নেমন্তন্ন করলে হয় না?' হঠাৎ কথা বন্ধ করে বললেন, 'ঐ দেখো, পার্সিকে ফেলে বেটি মোটর

হাঁকিয়ে বাড়ি রওয়ানা হয়েছে। এই বয়সে পার্সি বেচারীর কী করে টাক হল বুঝতে কষ্ট হয় না। তালুতে যে কুল্লে আড়াইখানা চুল আছে সেগুলোও আজ রাত্রে ছেঁড়া যাবে।'

মীরপুর ততক্ষণে আপন ভাবনায় ডুব দিয়েছেন। গুজোবটা তিনি বিশ্বাস করেননি। কিন্তু এই যে বিষ্ণুপুরের বড় সায়েব জিনিসটাকে এত সীরিয়সলি নিলে যে, মেমকে পর্যন্ত ধমকে দিলে—তবে কি?—কে জানে?

'গুড নাইট!'

'গুড নাইট!'

ও-রেলিদের কথা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। ক্লাব যখন নানা গুজোবের তাড়িতে মত্ত তখন ও-রেলিদের বংশধর জন্মের খবর পৌঁছল পানসে শরবতের মতো। কেউ সামান্য চাখলে, অর্থাৎ জিজ্ঞেস করলে, তাই নাকি, কবে হল? কেউ সামান্য ভুরু কোঁচকালে। মুরুব্বীরা বললেন, 'ভালোই হয়েছে, বাচ্চাই অনেক সময় বাপ-মায়ের মাঝে সেতু হয়ে দুজনাকে এক করে দেয়।'

শুধু বিষ্ণুছড়ার মেম বাঁকা হাসি হেসেছিলেন।

'সে হাসির অর্থ, বলা কিছু শক্ত, কারণ এটা ব্যক্ত'—দু জাহাজের মাঝখানে তক্তা পেতে যেমন এ-জাহাজে ও-জাহাজে জোড়া লাগানো যায় ঠিক তেমনি ঐ তক্তা তুলে ধাক্কা মেরে দু নৌকোর মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়েও দেওয়া যায়।

পয়লা বাচ্চার বাপ্তিস্ম করার সময় ক্যাথলিকরা ধুমধড়াক্কা করে বাঙালী ঠাকুরদার পয়লা নাতির অন্নপ্রাশনের চেয়েও বেশি। মেবল্ কিন্তু সব-কিছু সারতে চেয়েছিল সাদামাঠাভাবে। ও-রেলি দেখা গেল ঠাকুরদা-গোত্রের। সে চায়, পালা-পরব করতে। ওদিকে পাদ্রী জোনস্ সায়েব প্রটেস্টানট্—তিনি ক্যাথলিকের বাচ্চাকে বাপ্তিস্ম করবেন কী করে? এ যেন পাঁড় বোষ্টমের

ছেলেকে শাক্ত দিচ্ছে মন্ত্রদীক্ষা—শ্মশানে মড়ার উপর মুখোমুখি বসে মড়ার খুলিতে কারণ-ভর্তি-হাতে। ও-রেলি কিন্তু জোনস্‌কেই অনুরোধ করলে বাপ্তিস্মের তাবৎ ব্যবস্থা করতে।

গড্-ফাদার অর্থাৎ ধর্মপিতার অভাব মধুগঞ্জে হত না। মাদামপুরের বড় সায়েব, ডি. এম., যে-কেউ আনন্দের সঙ্গে রাজী হতেন, 'পুয়োর ডেভিল—বেচারা—একলা-একলি মনমরা হয়ে থাকে, ঐটুকুতে যদি সে খুশী হয় তবে হোয়াই নট্—নিশ্চয়ই—অফ কোর্স—অবশ্যি, অতি অবশ্যি।' কিন্তু ওদিকে দেখা গেল, ও-রেলি পাঁড় ক্যাথলিক। ক্যাথলিক বাচ্চার গড্-ফাদার হবে প্রটেস্‌টানট্! মন্ত্র যে খুশি পড়াক, বাপ্তিস্ম যে খুশি করুক, সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার; কিন্তু ধর্মবাপ তামাম জীবনের। সেখানে প্রটেস্‌টানট্ হলে চলবে কেন? কলমা যে খুশি পড়াক কিন্তু মুরশীদ ধরার সময় দেখে-বেছে নিতে হয়।

ও-রেলি-পরিবার বাদ দিলে মধুগঞ্জে আছে মাত্র একজন ক্যাথলিক—বাটলার জয়সূর্য। ও-রেলিদের মতই একেবারে খাঁটি। ও-রেলি বললে, সেই হবে ধর্মবাপ। শুনে পাদ্রী সায়েব পর্যন্ত অনেক 'যদি' অনেক 'কিন্তু' অনেক 'ইউ নো হোয়াট আই মীন' অনেক 'বাট অফ কোর্স' বলে ইতি-উতি করে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, এমন কি, কলকাতা থেকে তাঁর পরিচিত ভদ্র ক্যাথলিক আনাবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু, ও-রেলি একদম নেই-আঁকড়া,—বলে, ধর্মের চোখে সব ক্যাথলিকই বরাবর—পোপ যা, জয়সূর্যও তা।

ও-রেলির কথার কোনো জমা-খরচ পাওয়া গেল না। বাপ্তিস্মের বেলায় সে দিলদরিয়া—হেরেটিক প্রটেস্‌টানট্ই সই অথচ ধর্মবাপের বেলা সে কট্টর—ক্যাথলিক না হলে জর্ডনের জল অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন 'বিদেশী ঠাকুর ছেড়ে দেশের কুকুর'।

ওদের ভাষায় বলতে হলে 'মাই রিলিজিয়ন রাইট অর রঙ্‌, মাই মাদার—ড্রাঙ্ক অর সোবার।'

হ্যাঁ, 'ড্রাঙ্ক অর সোবার' কথাটা ওঠাতে ভালোই হল। জয়সূর্য পৃথিবীর আর পাঁচ লক্ষ বাটলারের মত অধিকাংশ সময়ই থাকে ড্রাঙ্ক আর সোবারের মাঝখানে। আর মোকা পেলেই গুত্তো খেয়ে ড্রাঙ্কের দিকেই কাত। অবশ্য তাকে গড্-ফাদার হতে হবে শুনে তন্মুহূর্তেই বেচারার নেশা কেটে গিয়েছিল। গবেটের মত বিড়বিড় করে কী একটা বলতে গিয়ে খেল ও-রেলির ধমক আর কড়া তম্বি,—অন্তত পরবের দিনটায় যেন সে সাদা চোখে গির্জায় যায়।

সে এক বিচিত্র বাপ্তিস্ম। মেবল্‌ দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে অল্প অল্প কাঁপছে, ও-রেলি পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে, পাদ্রী সায়েব নার্ভাস, আর জয়সূর্য তার রববারের গির্জের পোশাক পরে বিহ্বলের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সবাই ভাবলে, ব্যাটা আজ টেনে এসেছে।

একমাত্র সোমই ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছুর তদারক করলে। পাদ্রী-টিলার মেয়েদের বেশীর ভাগই জয়সূর্য জাতের—পরবের উৎকট দিকটা শুধু তাদেরই চোখে ধরা পড়ল না।

বাপ্তিস্মের পরই কিন্তু গির্জে থেকে বেরিয়ে জয়সূর্য না-পাত্তা। সন্ধ্যের সময় সোম তাকে খুঁজে বের করল উজান গাঙের ঘাটে বাঁধা এক নৌকোর ভিতর। দু বোতল ধান্যেশ্বরী শেষ করে বুঁদ হয়ে বসে আছে।

সব খবরই আণ্ডাঘরে পৌঁছল।

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, 'ডিসগ্রেসফুল!'

মাদ্রামপুর তাঁর অন্তরঙ্গজনকে বললেন, 'থাক! এবার থেকে ওদের আর একদম ঘেঁটিও না। কাট্‌ দেম একদম ডেড্‌। কী যে হল, কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি নে।'

দিশী কথায় বলে, ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে।

*　　　*　　　*

বাপ্তিস্ম-পরবের পর চার বৎসর কেটে গিয়েছে। এ চার বৎসর মেবল্ ডেভিডের কেটেছে তসবীর দানা কুড়োতে কুড়োতে না তুলো-ধুনো হয়ে হয়ে তার খবর দেবে কে? কাজল-ধারা নদীর মত নিরবধি তাদের জীবনগতি সমুখ পানে ধেয়ে চলেছিল, না সামনের নীলপাথরী পাহাড়ের মত স্থাণু হয়ে পড়েছিল তাই বা বলবে কে? মধুগঞ্জ শুধু দেখল, যে বারান্দায় সায়েব আর মেম বসে থাকত, বাটলার রেকর্ডের পর রেকর্ড বদলে যেত সেখানে একটি চতুর্থ প্রাণী প্রথম দোলনায় শুয়ে তারপর পেরেম্বুলেটারে বসে এবং সর্বশেষে টলমল হয়ে হেঁটে হেঁটে বারান্দাটাকে চঞ্চল করে তুলল। যেখানে আর দুটি প্রাণী—জয়সূর্যকে ধরলে কখনো বা তিনটি—আপন আপন আসনে ধ্যানমগ্ন সেখানে এই নূতন প্রাণীটির আনাগোনার অন্ত নেই। কখনো সে মেব্‌লের কোলে মাথা গুঁজে দুটি খুদে হাত দিয়ে তার উরু জড়িয়ে ধরে, মেবল্ তার কালো চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে দেয়, কখনো বা সে ডেভিডের আস্তিন ধরে টানাটানি আরম্ভ করে, তখন সে তার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আর কখনো বা জয়সূর্যের গলা জড়িয়ে ধরে তার-ই কাছ থেকে শেখা গান ধরত—

'ক্-ক্-ক্-কেটি, হুয়েন দি ম্-ম্-মুন শাইনস্—'

একমাত্র ওরই জীবনে এখনো তসবী, ধুনুরী কেউই আসে-নি। 'সময়' কী বস্তু সে এখনো বোঝেনি—টেকোর ভয় নেই উকুনের।

বাচ্চা প্যাট্রিকের চতুর্থ জন্মদিনে ও-রেলিরা স্থির করলে, মেবল্ বাচ্চাকে নিয়ে বিলেতে চলে যাবে, সেখানে বাসা বেঁধে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে। মধুগঞ্জের ইস্কুল দিশীর কাছে

অক্সফোর্ড-সম হতে পারে, কিন্তু সায়েবের বাচ্চা যদি সেখানে ট্যাঁশ উচ্চারণ শেখে তবেই চিত্তির। বড় হয়ে সে বাপ-মাকে প্রতি সন্ধ্যায় অভিসম্পাত না দিয়ে হুইস্কি-সোডা স্পর্শ করবে না, সে যে ইয়োরেশিয়ান নয়, সেকথা বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হবে, বোঝাবার মোকা না পেলে সেই ঘর্মে ডুবে মরতে হবে।

বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় জিনিসপত্র সব ফিটফাট ছিমছাম হল। পরদিন ভোর ছ-টায় ও-রেলি মোটর হাঁকিয়ে সবাইকে কুড়ি মাইল দূরে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দেবে। চাকর-বাকরদের বললে তারা যেন বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, কারণ পরদিন ভোরবেলা এসে মালপত্র ওঠাতে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। কম্পাউণ্ডে রইল শুধু বাটলার—অন্য চাকর-বাকরদের সেখানে রাত্রিবাসের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

পরদিন ভোরের দিকে বৃষ্টি হল। চাকর-বাকররা কোনো-গতিকে ছটায় বাংলো পৌঁছে দেখে সবাই চলে গিয়েছে—গারাজ খালি, বাড়ি তালাবন্ধ। ও-রেলি সায়েবের সব-কুছ তড়িঘড়ি, ঝটপট, কাঁটায় কাঁটায়। চাকররা আন্দাজ করলে সামান্য পাঁচ মিনিট দেরিতে আসার জন্য তাদের একটুখানি বকুনি খেতে হবে।

সায়েব ফিরল বেশ বেলা গড়িয়ে যাবার পর। আরদালি আসমৎউল্লা সায়েবের জন্য দুখানা কাটলিস আর অলুসেদ্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু সে কিছু না খেয়ে সোজা দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সব-কিছু শুনে রায়বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তী বললেন, 'আহা, বেচারা, এবারে একদম একা পড়ে গেল।'

তাঁর জুনিয়র তালেবুর রহমান বলেছেন, 'আমি ভাবছি অন্য কথা। বাচ্চাটা বিলেত গেল বাঘ হয়ে ফিরে আসবার জন্য। তখন লাগাবে নেটিভদের উপর জোর ডাণ্ডা। এ-মুল্লুকে থাকলে

তাদের তরে দরদী হয়ে যেত, ছাতির খুন ঠাণ্ডা আর দিলও মোলায়েম মেরে যেত।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'সে কী কথা! ও-রেলির মত ভদ্রলোকের ছেলে কি কখনো বৈরীভাব নিতে পারে? কী বলো সোম?'

সোম বললে, 'আপনার ছেলের বিলেতে যাওয়ার কী হল?'

রায়বাহাদুর বললেন, 'জানেন ব্রাহ্মণী।'

তালেবুর রহমান বললেন, 'সোম ভাবে সে একটা মস্ত ঘড়েল।'

ক্লাবে হল অন্য প্রতিক্রিয়া। প্রায় সবাই বললে, 'গেছে গেছে, আপদ গেছে। কেলেঙ্কারিটা তো চাপা পড়ল। এখন ক্লাবের ছেলে ও-রেলি ক্লাবে ফিরে এলেই হয়।'

কিন্তু আরেকটি বৎসর কেটে গেল। ও-রেলি ক্লাবে এল না।

বাড়ির সামনের জ্যোতিষ্মান এবং অন্ধকারে মানুষের তৃতীয় চক্ষুস্বরূপ ল্যাম্প-পোস্টটা সম্বন্ধেই যখন সে দুদিন বাদেই অচেতন হয়ে যায়, তখন অদৃশ্য ও-রেলিকে ক্লাব যে ভুলে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে! কিন্তু যেদিন খবর এল ও-রেলি মধুগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে গিয়েছে, সেদিন ক্লাব তার সম্বন্ধে আর-এক প্রস্ত আলোচনা করে নিলে।

মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়াই প্রথম খবর পেলেন ডি. এম.-এর কাছ থেকে।

মাদামপুর বললেন, 'ভালোই হল। যাচ্ছে কক্সবাজার না কোথায়, সেখানে কেলেঙ্কারিটা হয়তো পৌঁছয়নি এবং পৌঁছলেও সেটা বাসী হয়ে গিয়েছে। ওখানে গিয়ে হয়তো পুয়োর ডেভিল আবার নর্মাল লাইফে ফিরে আসতে পারবে। আমি সত্যি তাকে বড্ড মিস করতুম।'

বিষ্ণুছড়া চুপ করে রইলেন, ভালো মন্দ কিছু বললেন না।

মাদামপুর শুধালেন, 'কী হে, চুপ করে রইলে যে? হুইস্কি চড়েছে নাকি?'

বিষ্ণুছড়া বললেন, 'সাত্তটা ছোটায়? আই লাইক ছাট—আপনিও যেমন!' তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে খাড়া হয়ে বসে বললেন, 'আমি সে কথা ভাবছি নে। আমার কানে এসে সেদিন পৌঁছল, মেবল্‌রা নাকি আদপেই ইংলণ্ড পৌঁছয়নি।'

মাদামপুর বললেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু তারা পৌঁছল কি না তার খবর দেবে কে? মেবলের সঙ্গে ক্লাবের কারো তো এমন দহরম-মহরম ছিল না যে, বন্দর বন্দর থেকে পিক্‌চার-পোস্ট-কার্ড পাঠাবে আর লণ্ডন পৌঁছে কেবল্। মোকামে পৌঁছে প্রতি মেলে স্কার্ফ, সুয়েটার আর গরম মোজা, প্যোর স্কটিশ উলে তৈরী! হোম মেড!'

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, সায়েবের একটু চড়েছে—বয়স হয়েছে কি না, অল্পেই একটু কেমন যেন হয়ে যান—না হলে স্কার্ফ, সুয়েটারের কথা বলবেন কেন? ও বস্তু মধুগঞ্জে পড়বে কে? সাদা চোখে এ ভুলটা করতেন না, হয়তো বলতেন টিনের বেকন, সার্ডিন। চেপে গিয়ে বললেন, 'কলকাতার ও শী-র সঙ্গে নর্থ ক্লাবে দেখা হয়েছিল, সে বললে, মেবল্ আর তার বাচ্চাকে সে মাস তিনেক আগে দেখেছে মসুরিতে, সঙ্গে ছিল ও-রেলি। তোমার মনে আছে কি না জানি নে, ও-রেলি তখন ছুটি নিয়ে মসুরি গিয়েছিল।

এবারে মাদামপুর হা হা করে হেসে উঠলেন, 'কে বলেছে? ও শী? কটা মেবল্ আর কটা ডেভিড্ দেখেছিল জিজ্ঞেস করোনি? ও তো সকালে খায় কড়া হর্স-নেক, দুপুরে জিন, সন্ধ্যায় রম্ আর রাত্রে হুইস্কি। সন্ধ্যায় দেখে থাকলে নিশ্চয়ই দুটো, আর রাত্রে দেখে থাকলে চারটে ও-রেলি দেখেছে। কটা মসুরি দেখেছে সে-কথা জিজ্ঞেস করেছিলে কি?'

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, এখন আর কথা-কাটাকাটি করে কোনো লাভ নেই। তাই বললেন, 'সোমও বলছিল মেবল্‌রা লণ্ডনে আছে।'

মাদামপুর আশ্চর্য হয়ে শুধালেন, 'সোম বললে? আশ্চর্য! ও তো কখনো কোনো খবর কাউকে দেয় না। মধুগঞ্জের বানান জিজ্ঞেস করলে ভাবখানা করে যেন সরকারী টপ সিক্রেট। আমি তাকে একদিন বলেছিলুম 'ফাইন ওয়েদার, সোম।' মুখখানা করলে যেন আলীপুরের আবহাওয়া দফতর থেকে রিপোর্ট না এলে সে ঐ একস্‌ট্রিমলি কনফিডিয়েনশেল খবর কনফার্ম করতে প্রস্তুত নয়। তাই বলছি সোম যখন বলেছে তখন ওটা বাইবেল-বাক্য।'

কিন্তু বিষ্ণুছড়ারই ভুল। হঠাৎ চেয়ারখানা তার কাছে টেনে এনে মাদামপুর একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় অত্যন্ত সাদা গলায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'কোথায় আছে, কোথায় নেই, ওসব খোঁচাখুঁচি করতে গেলে আবার সেই ধামাচাপা ডার্টি লিনেন বেড়িয়ে পড়বে। তাতে ইয়োরোপীয়ন কমিউনিটির কী লাভ? বরঞ্চ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। নো নিউজই যদি হয়, তবে জান তো প্রবাদ, 'নো নিউজ ইজ গুড নিউজ'।'

বিষ্ণুছড়া অভয় পেয়ে বললেন, 'বিশেষ করে সোমের কথাই পাকি খবর। কিন্তু ও-রেলিকে একটা বিদায়ভোজ দিতে হবে না! ক্লাবে আসুক আর না-ই আসুক, চাঁদা তো ঠিক ঠিক দিয়ে গিয়েছে, এমন কি টেনিসের একস্‌ট্রাও। চ্যারিটি-ফ্যারিটির পয়সায়ও কামাই দেয়নি।'

মাদামপুর বললেন, 'সাউণ্ড করে দেখতে পার। কিন্তু আসবে কি?'

এ সম্বন্ধে মাদামপুর এবং বিষ্ণুছড়ার মনে সন্দেহ জাগা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ও-রেলি আসতে রাজী হল। তবে

ইঙ্গিত করলে যে, ডিনারের বদলে মামুলী টী-পার্টি হলেই ভালো হয়। ক্লাব রাজী হল।

ক্লাবের প্রায় সবাই সেদিন হাজিরা দিলেন। ও-রেলি সঙ্গে নিয়ে এল তার বদলী সমারসেট ডীনকে। চটপটে ছোকরা, সমস্তক্ষণ কথা কয় আর এক সিগরেট থেকে আরেক সিগরেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের খর্চা বাঁচায়। ও-রেলি ডীনকে ক্লাবের সঙ্গে সাড়ম্বর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে, 'ইনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে খাশ তালিম নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছেন, মধুগঞ্জ এঁর সেবায় উপকৃত হবে।'

গুজোব রটাতে ফিসফাস-গুজগাজ করাতে ইংরেজ এবং বাঙালীতে কোনো তফাত নেই, কিন্তু যাকে নিয়ে এসব করা হয়, তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করাটা ইংরেজের অভ্যাস নয় এবং এটিকেটের খেলাফ। তাই মেবল্ সম্বন্ধে ও-রেলিকে মুখের উপর কেউ কোনো প্রশ্ন শুধালে না। একেবারে কোনপ্রকারের অনুসন্ধান না করাটা আবার মুরুব্বীদের পক্ষে ভালো দেখায় না। তাই বুড়ো মাদামপুর ও ডি. এম. শ্রেণীর দু-একজন ও-রেলির পরিবারের খবর নিলেন কোনপ্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে, অর্থাৎ শুদ্দু আশা প্রকাশ করলেন, মেবল্‌রা বিলেতে ভালো আছে নিশ্চয়ই। ও-রেলি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

পার্টি শেষ হতেই ও-রেলি নিয়ে গেল ডীনকে তার বাংলোয়। ডিনার খেয়ে ও-রেলি তার ডেরা তুলে মোটরে যাবে স্টেশন, আর ডীন খাটাবে তার বাংলোতে আপন ডেরা। চাকরি-জগতে সরকারী বাসা সম্বন্ধে এ-ই হচ্ছে এদেশে আইন—অবশ্য সাদা কালিতে লেখা।

'খ্রীস্টালয় থেকে সদ্যাগত'—'ফ্রেশ ফ্রম ক্রিস্টিয়ান হোম'-ওলাদের এদেশে এসে বয়নাক্কার অন্ত থাকে না। এটা নেই, ওটা চাই,

সেটা কোথায়—সুবো-শাম লেগেই আছে। তবু যত বড় উন্নাসিকই হোক না কেন, পুলিস সায়েবের বাংলোটি কিছুমাত্র ফেলনা নয়।

ডিনার খেয়ে দুজনাই এসে বসেছিল চওড়া বারান্দায়। বস্তুত ঐ বারান্দাটাই বাড়ির সবচেয়ে আরামের জায়গা। ও-রেলি চলে যাওয়ার পর ডীন বেয়ারাকে দিয়ে সিগরেটের তাজা টিন খুলে আরাম করে গা এলিয়ে বসল। লণ্ডন ছেড়েছে অবধি জাহাজে ট্রেনে সর্বত্র হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে তার সময় কেটেছে, দু-দণ্ড নিজের মনে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার জমা-খরচ মিলিয়ে নিতে পারে-নি—অথচ গুণীরাই জানেন যারা কথা কয় বিস্তর তারাই নির্জনতা খোঁজে শান্তজনের চেয়ে বেশি।

পেট্রোমাক্স জ্বলছে। তার আলো বারান্দার বাইরের অন্ধকার কিন্তু ফুটো করতে পারছে না। ওদিকে আবার বর্ষার গুমোট। আকাশ থমথম করছে। গাছগুলো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া পর্যন্ত ডাইনে-বাঁয়ে, উপর-নিচে কোনো দিকে যেতে চায় না। এ অবস্থায় মুখের ধোঁয়া দিয়ে খাশা রিং বানানো যায়। মুখ থেকে বেরিয়েই রিংগুলো একটার পিছনে আরেকটা সারি বেঁধে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন সিগরেটখেকোরা আর সিগরেটের নেশা করে না—রিঙের নেশায় পিলপিল করে চক্করের পর চক্কর বের করতে থাকে।

ব্যাচেলাররা দেরিতে শুতে যায়, এ-কথা সবাই জানে, আর তামাকখোররা যায় আরো দেরিতে। 'আরেকটা খেয়েই উঠছি', 'আরেকটা খেয়েই উঠব' করে করে ঘুমে আর সিগারেটে যখন লড়াই বেশ জমে ওঠে তখন অনেক সময় রেফরি লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিয়ে ঘুমের শরণ নেয়, সিগারেটও চটে গিয়ে কার্পেট মশারি পোড়ায়।

ডীনের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, ডান হাত চেয়ারের হাত

থেকে খসে ঝুলে পড়ছে, ঢিলে আঙুল থেকে সিগারেটটা খসি-খসি করছে, এমন সময়—

এমন সময় ডীন দেখে তিনটি প্রাণী—মূর্তি—কী বলি?—বেড-রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় নেমে গেল। সে বসে ছিল বারান্দার এক প্রান্তে, বেড-রুম অন্য প্রান্তে—সিঁড়ি তার-ই গা ঘেঁষে।

ডীনের চোখে কাঁচা ঘুমের ছানি। তার ভিতর দিয়ে সবকিছু যেন আবছা-আবছা, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা দিল, কিংবা যেন সিনেমার পর্দাতে ঢিলে ফোকাসের ছবি।

তিনটি মূর্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার পূর্বেই তারা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়েছে। ডীন শুধু দেখলে প্রথমটি দৈর্ঘ্যে মাঝারি, দ্বিতীয়টি ছোট এবং তৃতীয়টি বেশ লম্বা—ব্যস আর কিছু না।

সম্বিতে ফিরে ডীন ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামল। চতুর্দিকে ঘোরঘুট্টি অন্ধকার, নিচের তলার ছাতা-ল্যাম্প বেয়ারা অনেকক্ষণ হল নিবিয়ে দিয়েছে, উপরের তলায় আলো সেখানে পৌঁছয় না। ডীন সদ্য বিলেত থেকে এসেছে—মফস্বলে টর্চের কী প্রয়োজন এখনো জানতে পারেনি। তার টর্চ নেই। ছুটে গেল গেটের কাছে; সেখানে রাস্তার ক্ষীণ আলোতে দেখলে, চতুর্দিক জনমানবশূন্য।

সাপ, চোর, শেয়াল দেখলে আমরা চিৎকার করে চাকর-বাকরদের ডাকি, কারণ আপন দেহ রক্ষার জন্য এদের উপর আমরা নির্ভর করেছি যুগ-যুগ ধরে। বিলেতের লোক কাজকর্ম চালাচ্ছে বিন্ চাকরে বহুকাল ধরে। তাই সম্বিতে ফিরেও ডীন চেঁচামেচি আরম্ভ করলে না। ধীরে ধীরে বারান্দায় ফিরে আবার চেয়ারে বসল।

আকাশ-কুসুম কেউ কখনো দেখেনি—সে শুদ্ধ কল্পনামাত্র; স্বপ্ন আমরা দেখি, কিন্তু তার পিছনে কোনো বাস্তবতা নেই; রজ্জু

দেখে যখন সর্প ভ্রম হয় তখন সে সর্প বাস্তব নয় বটে, কিন্তু ভ্রম কেটে যাবার পরও রজ্জুটিকে ধরতে-ছুঁতে পাই। ডীন যা দেখল সেটা এর কোনো পর্যায়েই পড়ে না। তাহলে কি সে বাস্তব জিনিস প্রত্যক্ষ করল? তাই বা কী করে হয়? বেড-রুমে তো কারো থাকার কথা নয়—ডিনার শেষ হওয়ার পর চাকররা চলে গিয়েছিল, ও-রেলি যাওয়ার পর উপরের তলায় তো সে একেবারে একা বসে ছিল। তবে কি ওরা মেথরের দরজা দিয়ে বাথ-রুম বেড-রুম হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল? ডীন চেক্‌-আপ করে দেখলে মেথরের দরজা ডবল বল্টে বন্ধ।

তবে কি মদ্যপান? অসম্ভব। খেয়েছে মাত্র ছোট্ট দু পেগ—তাও ডিনারের আগে। দু পেগে বঙ্গ-সন্তানেরই চিত্ত-চাঞ্চল্য হয় না—ও দিয়ে তো ইংরেজ কপালে তিলক কাটে।

ছুটোছুটি আর উত্তেজনায় ডীনের ঘুম ততক্ষণে ক্ষীণ নয়—লীন হয়ে গিয়েছে। বিছানায় ছটফট না করার চেয়ে বরঞ্চ চেয়ারে বসে প্রতীক্ষা করাই ভালো, যারা গেছে তারা ফিরে আসে কি না। পুলিসের লোক—প্রথম সম্বিতে ফেরা মাত্রই সে ঘড়ি দেখে নিয়েছিল এরা বেরিয়েছিল ১২টা ৩০ এবং ৩৫-এর মাঝামাঝি। যদি তারা নিতান্তই ফেরে তবে তো ফিরবে ভোরের আলো ফোটবার আগেই। ডীন পিস্তলটা স্যুটকেশ থেকে বের করে পেগ-টেবিলের উপর রেখে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘণ্টা চারেক সিগারেট পোড়ানোর পর লুপ্ত ঘুম ফিরে এল কিন্তু যাদের জন্য এত অপেক্ষা তারা আর এল না।

সকালবেলা বেয়ারা বেড-টী এনে দেখে সায়েব চেয়ারের উপরে বেঘোর ঘুমে কাতর। শেষ সিগারেট হাত থেকে পড়ে গিয়ে পেগ-টেবিলের বার্নিশ পুড়িয়ে দিয়েছে।

আরো একটু ক্ষতি হল ডীনের। সেদিনই আণ্ডাঘরের বেয়ারা-মহলে রটে গেল, নূতন সায়েব বোতল-বাসী-পিয়াসী কেউ প্রশ্ন

পর্যন্ত করল না, যে-বেয়ারা চা এনেছিল সে বোতল খালি পেয়েছিল না ভর্তি।

সকাল হতে না হতেই ভিজিটারদের ঠ্যালা। তাদের সঙ্গে লৌকিকতা করতে করতে ডীন ভাবছে আগের রাত্রের কথা। দিনের আলো প্রখর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডীনের কাছে রাত্রের প্রহেলিকা হাসির বিষয় হয়ে দাঁড়াল। স্বপ্নের ঘোরে কিংবা ঘুমের জড়তায় কী দেখতে কী দেখেছে তাই নিয়ে সে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করলে—ইস্তেক পিস্তল বের করলে। কী আশ্চর্য! এদেশে একটানা বিশ বছর কাটানোর পর অসহ্য গরম আর সুদীর্ঘ বর্ষার ঠ্যালায় ইংরেজের মাথায় ছিট জন্মায়—দেশে ফিরে গিয়ে তার ধকল কাটায় পুডিং দিয়ে খানা আরম্ভ করে আর সূপ দিয়ে শেষ করে। তাদেরই একজন, ডীনের এক মামাকে নিয়ে সে কতই না ঠাট্টা-মশকরা করেছে, আর বেচারী মামা কিছু না বলতে পেরে শুধু হুম-হুম করেছে। আর তার নিজের সেই অবস্থা এই প্রথম রাত্রেই। পিস্তল ওঁচায় স্বপ্নের পেট ফুটো করতে? তার হল কী?

এমন সময় সোম এসে খবর দিলে, কাল রাত্রে তের-সতীতে জলে ডাকাতির খবর এসেছে। বোধ হয় গোটা তিনেক খুনও হয়েছে। সে অকুস্থানে যাচ্ছে।

ইংরেজের বাচ্চা, নিজেকে এতক্ষণ সংযত করতে শিখেছে। কোনো চাঞ্চল্য না দেখিয়ে শুধালে রাত কটায় কাণ্ডটা ঘটেছে?

কী জানি, ঠিক বলা যাচ্ছে না, দুপুর কিংবা শেষ রাতে।

সোম চলে গেল।

'টু হেল'—অর্থাৎ চুলোয় যাকগে বলে ডীন মধুগঞ্জের ম্যাপ মেলে গেজেটিয়র খুলে পড়তে বসল।

কিন্তু চুলোয় যাকগে বললেই যদি সব আপদ চুলোয় যেত

তাহলে গোটা পৃথিবীটাকেই হামেহাল নরককুণ্ডের মতো জ্বালিয়ে রাখতে হত। সন্ধ্যে হতে না হতেই দিনের বেলার হেসে-উড়িয়ে-দেওয়া আপদ ডীনের মনের ভিতর 'কিন্তু কিন্তু' করে ইতি-উতি করতে লাগল। ডিনারে বসে মনে হল কাল রাত্রের ঘটনা স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রমও নয়—ইংরিজিতে ভাবতে গেলে ইলুশন, ডিলুশন, হ্যালুসিনেশন কিছুই নয়। প্রেসটিডিজিশেনও নয় কারণ ঐ রাত সাড়ে চব্বিশটার সময় তাকে ম্যাজিক দেখিয়ে বোকা বানাতে যাবে কোন্ ভাঁড় ?

বাগানের আম-জাম-লিচুর অন্ধকার ক্রমেই যেন বারান্দার দিকে গুড়িগুড়ি এগিয়ে আসছে। প্রতিপদ আকাশের মেঘময় অন্ধকারও নেবে আসছে নিচের দিকে, দুই অন্ধকারের ভিতর কী যেন গোপন যোগ-সাজস রয়েছে। সেই নিরেট জমে-ওঠা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গাছপালার মধ্যে সূক্ষ্ম—অতি-সূক্ষ্ম—ছিদ্র করে কাজলধারার উপর দিয়ে বেয়ে যাওয়া নৌকার ক্ষীণ প্রদীপের আলোক মাঝে মাঝে এসে পৌঁছচ্ছে বাংলোর দিকে। কিন্তু সে আলোক চোখে পড়ে ঐ দিকে অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে। সে আলো তখন যেন চোখকে আরো কানা করে দেয়—চতুর্দিকের অন্ধকার যে কতখানি পুঞ্জীভূত নীরন্ধ্র তখনই ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

অন্ধকারে মানুষ যেমন নিজেকে সাহস দেবার জন্য শিস দেয়, পেট্রোমাক্সটাও ঠিক তেমনি মৃদু একটানা শাঁ—শব্দ করে যাচ্ছে আর ভয়ে মরছে হঠাৎ কখন অজানাতে অন্ধকার তার লম্বা আঙুল দিয়ে বাতির চাবিতে দম দিয়ে তার দম বন্ধ করে দেবে।

ডীন চাকর-বাকরকে বিদেয় দিয়ে পিস্তল কোলে নিয়ে বসেছে সিঁড়ির দিকে মুখ করে। টিপয়ের উপর রিস্টওয়াচ।

রাত ঘনিয়ে এল। আগের রাত্রে ভোরের দিকে চোখের দু পাতা জুড়েছিল মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, দিন কেটেছে

নানা কাজের ঠেলায়, এখন বারে বারে ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু আজ তো সর্বচৈতন্য কোলম্যান মাস্টার্ডের মতো তীক্ষ্ণ সজাগ রাখতে হবে। সে আজ আদৌ মদ খায়নি, জাস্ট টু বি অন ১০০% সেফ সাইড।

ঘড়িতে বারোটা বেজেছে। ডীন ভাবলে, এবারে আরো সজাগ হতে হবে। রুমালটা ভিজিয়ে এনে চোখে বোলাবার জন্য এদিক ওদিক সেটা খুঁজছে এমন সময় হঠাৎ দেখে সেই ত্রিমূর্তি বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ডীন মন স্থির করে রেখেছিল দেখামাত্র পিস্তল হাতে ছুটে গিয়ে ওদের ঠ্যাকাবে কিন্তু কাজের বেলায় এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল—ছুটে গিয়ে যখন নিচের বারান্দায় নামল তখন ত্রিমূর্তি বাগানের বড় জামগাছটার কাছে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঘড়িতে দেখে তখনো বারোটা— অর্থাৎ সকালে দম দেওয়া হয়নি।

এবারে ডীন ছুটোছুটি করলে না। মাই গড বলে চাপরাশীর টুলে বসে পড়ল—ভীষণ বিপাকে না পড়লে ইংরেজ 'মাই গড' বলে না।

অনেকক্ষণ পর সে বেড-রুমে ঢুকল। ক্লান্তিতে নিদ্রা-জাগরণে মেশা আসুপ্তির ভিতর দিয়ে রাত কাটল।

সকাল বেলা সোম এল। তিনটে নয়, দুটো খুন।

সেদিকে খেয়াল না করে ডীন শুধালে, 'সোম, এ বাড়ি ভূতুড়ে?'

সোম বললে, 'জানি নে স্যার।'

'তুমি ভূত মান?'

'নো, স্যর।'

'তাহলে এ বাড়ি কিংবা যে কোনো বাড়ি ভূতুড়ে হয় কী করে?'

'জানি নে স্যর।'

ডীন বলতে যাচ্ছিল, 'তুমি একটা গবেট, আর তোমার প্যারা বস্ একটা আস্ত গাড়ল—না হলে তোমাকে শার্লক হোমসের মতো ঠাওরালে কেন?' ঠিকই তো, বোকাকে বুদ্ধিমান মনে করা, এ যেন গাধা দেখে বলা এটা ঘোড়া। যে এ কথা বলে সে শুধু গাধা চেনে না তা নয়, ঘোড়াও চেনে না।

তারপর ডীন আরো পাকাপাকিভাবে আটঘাট বেঁধে ত্রিমূর্তির জন্য ত্রিরাত্রি অপেক্ষা করল কিন্তু তাকে নিরাশ হতে হল।

সপ্তাহের শেষে আই. জি.-কে রিপোর্ট লেখার সময় ডীন এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে লিখব-কি-লিখব-না করে করে কী করে যে লিখে ফেললে নিজেই বুঝতে পারলে না। ভাবলে ওটা কেটে ফেলি—সে বিলক্ষণ জানত, ইংরেজ এ সব কেচ্ছা নিয়ে নির্মম হাসাহাসি করে—কিন্তু তাহলে আবার নূতন করে রিপোর্ট লিখতে হয়, আর লেখালেখির ব্যাপারেই পুলিস বাবাজীরা হামেশাই একটুখানি কাহিল।

যাকগে বলে শেষটায় পয়লা পাঠই পাঠিয়ে দিলে।

তিন দিন বাদে উত্তর এল। তার শেষ ছত্র, 'ড্রিঙ্ক লেস স্পিরিট।'

ডীন খাপ্পা হয়ে বললে, 'ড্যাম দি স্পিরিট।'

*　　　　*

পুলিসের ক্লাবে আই. জি. এসেছিলেন মধুগঞ্জে টুরে।

রাত্রে আই. জি.র নিমন্ত্রণ ছিল ডীনের বাংলোয়।

সূপ শেষ হতে না হতেই ডি. এম.-এর বাংলো থেকে জরুরী খবর এল 'স্বদেশী'দের আড্ডায় বোমা ফেটে দুজন মারা গিয়েছে—ডীন যেন তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ডীন তাদের অভিসম্পাত দিতে দিতে খানা ছেড়ে উর্দি চড়ালে।

আই. জি. বাঙাল ভাষা বেশ শিখে গিয়েছিলেন। একা একা খানা খাওয়ার একঘেয়েমি কাটাবার জন্য বাটলারের সঙ্গে

গল্প জুড়ে দিলেন। এককালে বড়লোকদের যদি শখ হত ছোট-লোকদের সঙ্গে গল্প করার তবে তাঁরা ডেকে পাঠাতেন চন্দ্রবৈদ্যকে—মুখ-চন্দ্রটিকে বিচক্ষণ বৈদ্যের মতো খাফসুরত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নাপিত হুজুরকে দুনিয়ার নানা খবর নানা গুজব শুনিয়ে ওকিবহাল করে তুলত। বিলেতে এখনো ও কর্মটি করে বাটলার এবং খানদানি সায়েবদের যাঁরাই দেশী ভাষা শিখতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই এ-দেশে সেই রেওয়াজটি চালু রেখেছেন।

সায়েবের মতির গতি ধরতে পেরে খয়রুল্লা আলোচনা আরম্ভ করলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে—সায়েব সায় দিলেন, তারপর ভরসা দিলেন লড়াই শিগগিরই খতম হয়ে যাবে—সায়েব শুধু 'হুঁ' বললেন—খয়রুল্লা কথার মোড় ফিরিয়ে বললে, দিশী লোক বসরা থেকে বেশ দু পয়সা বাড়িতে পাঠাচ্ছে—সায়েব আনন্দ প্রকাশ করলেন।

খানার শেষ পদ ছিল পনিরে রান্না আস্ত আণ্ডা। বহুকাল ধরে বিলেত থেকে পনির আসছে না বলে বড় সায়েব তাই নিয়ে প্রশংসা ও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। খয়রুল্লা দেমাক করে জানালে এ পনির বিলেতি নয়, এ জিনিস তৈরি হয় মৈমনসিংহের অষ্টগ্রামে। বিদেশী পনির যখন এ-দেশে পাওয়া যেত সেই আমলেই ও-রেলি সায়েবের মেম দিশী পনিরের সন্ধান পেয়ে তাই দিয়ে এই নূতন সেভারি আবিষ্কার করেন। খয়রুল্লার মতে তাঁর মতো পাকা রাঁধুনি এদেশে কখনো আসেনি। সে তখন জয়সূর্যের মেট—তার কাছ থেকে সে এ জিনিসটে বানাতে শিখেছে।

বড় সায়েব জানতেন মিসেস ও-রেলি বিলেতে। তবু কথার পিঠে কথা বলার জন্য আপন মনেই যেন শুধালেন, 'তা মেম সায়েব তো এখন বিলেতে?'

খয়রুল্লা একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'বোধ হয় তাই।

তবে সঠিক কেউ বলতে পারে না। মীরপুর বাগিচার বেয়ারা বলছিল তিনি মসুরি না সিমলে কোথায় যেন।'

এবারে সায়েব একটুখানি আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'সে কী হে? এই সামান্য খবরটাও সঠিক জান না?'

খয়রুল্লার দিলে চোট লাগল। পুলিস সায়েবের বেয়ারা হিসেবে জাতভাইদের ভিতর তার খুশ-নাম ছিল যে সে দুনিয়ার সকলের নাড়ীনক্ষত্র জানে, তাকে কিনা সায়েব পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন সে একটা আস্ত উজবুক, দুনিয়ার কোন খবর রাখে না। তার চেয়ে যদি তিনি তাকে খবর দিতেন যে সে এদিকে জানে না, ওদিকে কিন্তু তার বিবি বিধবা হয়ে গিয়েছেন, তা হলেও তার কলিজা এতখানি ঘায়েল হত না। তাই ইজ্জত বাঁচাবার জন্য বললে, 'সঠিক খবর তো দিতে পারেন শুধু ও-রেলি সায়েবই। তা, তিনি তো কারো সঙ্গে কখনো কথা বলেন না, তাঁকে শুধাতে যাবে কে?'

বড় সায়েব খানদানী ঘরের ছেলে। সায়েব-মেমদের নিয়ে চাকর-নফরের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে চান না; আলোচনাটা ওদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে বললেন, 'ঠিক বলেছ।'

খয়রুল্লাও পেটে আক্কেল ধরে। সায়েব যদি বা কথার মোড় ফেরালেন, সে তাঁর সামনে খাড়া করে দিলে একখানা নিরেট পাঁচিল।

বললে, সে বহু মেহন্নত করে ক্লাব থেকে কিঞ্চিৎ উত্তম কফি যোগাড় করে এনেছে, পারকুলেটরে সেটা চড়িয়ে রেখেছে, সায়েব যদি একটু মাজ করেন?

ডিনার শেষ হলে পর খয়রুল্লা বললে, সে সায়েবকে সার্কিট হাউসে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য নিচের তলায় অপেক্ষা করবে। কফি-লিকার-সিগার তিনটিই উত্তম শ্রেণীর ছিল বলে সায়েব

তদ্দণ্ডেই ডেরা ভাঙবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। জানালেন, তিনি একাই সার্কিট হাউসে যেতে পারবেন।

রাত একটার সময় ডীন ফিরে এল। বড়সায়েবকে নিতান্ত একা-একা ডিনার খেতে হল বলে আবার দুঃখ প্রকাশ করলে।

বড় সায়েব সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'মিসেস ও-রেলি এখন কোথায় তুমি জান ?'

ডীন হেসে বললে, 'কেন ? আপনিও কিছু শুনেছেন নাকি ?'

'নাতো। আমি শুনেছি, তিনি বিলেতে না মসুরিতে সে-কথা কেউ জানে না। আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকল।'

ডীন বললে, 'ঠেকারই কথা। কিন্তু এ নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই। এর পিছনে আবার একটুখানি কেলেঙ্কারি কেচ্ছা রয়েছে। মেবল্ এখান থেকে সরে পড়াতে কেচ্ছাটা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে।'

তারপর ডীন ক্লাবে যা-কিছু শুনেছিল সে কথা তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে বললে, 'পাছে আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝতে পেরে এলোপাতাড়ি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তাই মাদামপুরের সায়েব—এ অঞ্চলে তিনিই মুরুব্বী—আমাকে এখানে আসার দিনই সমস্ত কথা খুলে বলে ইঙ্গিত করেন যে, এ ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করে কোনো লাভ নেই, ক্ষতিরই সম্ভাবনা। আমিও তাঁকে বলেছি, ব্রাদার অফিসারের ফ্যামিলি অ্যাফেয়ারে আমি কনসার্নড্ নই।'

বড় সায়েব বললেন, 'ঠিক বলেছ!'

*   *   *   *

রাত প্রায় একটার সময় বড় সায়েব শেষ ক্রেম দ্য মাঁৎ খেয়ে উঠলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ বললেন, 'কই হে, তোমার ত্রিমূর্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না ?'

ডীন যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে বললে, 'আপনি বাগদাদের কাজীর গল্প জানেন ?'

বেমক্কা হঠাৎ কাজীর গল্প কেন উপস্থিত হল তার হদিস না পেয়ে বড় সায়েব বললেন, 'নাতো।'

ডীন বললে, 'মুর্গী খেতে খেতে কাজী বাবুর্চীকে শুধালেন, মুর্গীর আরেকটা ঠ্যাং কোথায়? বাবুর্চী বললে, মুর্গীটার ছিল মাত্র একটা ঠ্যাং। কাজী বললেন, একঠ্যাঙা মুর্গী কেউ কখনো দেখেনি। বাবুর্চী বললে, বিস্তর হয়, সে দেখিয়ে দেবে। তারপর শীতকালে একদিন আঙিনায় একটা মুর্গী এক ঠ্যাং পালকের ভিতর গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল—বাবুর্চী কাজীকে দেখিয়ে দিলে একঠ্যাঙা মুর্গী। কাজী দিলেন জোর হাততালি। মুর্গী দুসরা ঠ্যাং বের করে ছুটে পালাল। কাজী বললেন, ঐ তো দুসরা ঠ্যাং। বাবুর্চী বললে, সেদিন খাওয়ার সময় তিনি হাততালি দিলে দুসরা ঠ্যাংও বেরোত।'

বড় সায়েব বললেন, 'উত্তম গল্প, কিন্তু—'

ডীন বললে, 'এতে আবার কিন্তু কী? আপনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন কম হুইস্কি খেতে—ত্রিমূর্তি হুইস্কির চোখে দেখেছিলুম কি না! আপনি যদি আচ্ছা করে আজ হুইস্কি খেতেন, তবে তার-ই 'হাততালিতে' ত্রিমূর্তি বেরিয়ে আসত।'

অথচ সায়েব খেয়েছিল পাঁচটা 'ব্রা'—বড়া।

মনে মনে ভাবলেন, 'ছোকরা তুখোড়।' বাইরে হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আসছে বারে না হয়, ম্যাকবেথের তিন ডাইনির স্মরণে তিন বোতল খেয়ে ত্রিমূর্তিকে ইনভোক করা যাবে।'

ডীন বললে—'থ্রাইস ওথ—তিন সত্যি।'

* * * *

মাস দুই পর বড় সায়েব ডীনকে চিঠি লিখলেন,

'প্রিয় ডীন,

আমি বড় সমস্যায় পড়ে তোমাকে চিঠি লিখছি।

প্রায় দুমাস হল আমি রাধাপুর মফস্বল যাই। সেখানকার

অবস্থা খুব সন্তোষজনক সে খবর তুমি জান—তার জন্য ও-রেলিকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে হয়, সে কথাও তোমার অজানা নয়। দেশে যে সে শান্তিরক্ষা করতে পেরেছে, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়, আমি মুগ্ধ হয়েছি অন্য কারণে।

ভারতবর্ষে একদিন আমাদের প্রাধান্য আর থাকবে না, এ জিনিসটা আমার কল্পনার বাইরে নয়, কিন্তু আমরা জর্মনির কাছে পরাজিত হব এবং ফলে আমরা জর্মন হুনদের তাঁবেতে আসতে পারি, এ জিনিসটার কল্পনাও আমি করতে পারি নে। এ-লড়াই জেতার জন্য ভারতে শান্তি গৌণ—মুখ্য, ভারতকে এই যুদ্ধে আমাদের হয়ে লড়ানো। ও-রেলি এ-কাজটি তার এলাকায় অবিশ্বাস্যরূপে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে—তার কার্যপন্থা ও সফলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

তাই আমাদের সকলের কর্তব্য তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা।

গতবার যখন তার সঙ্গে দেখা হয়, তখন তার পরিবারের কথা উঠেছিল। আমার প্রশ্নের সামান্যতম উত্তর দিয়ে সে আমার দিকে যেভাবে তাকালে তাতে আমার মনে হল, এই বিষয় নিয়ে তার মনের কোণে এক গভীর বেদনা লুকনো আছে। আমার মনে হল, তার সম্বন্ধে আমরা যে-সব গুজব শুনেছি, সেগুলোর কিছুটা তার কানে পৌঁচেছে এবং গুজবের বিরুদ্ধে লড়াই অসম্ভব জেনে চুপ করে সব অপবাদ সয়ে নিয়েছে।

হয়তো এটা বিচক্ষণের কর্ম। কিন্তু আমার মনে হল, এ বিষয়ে আমাদেরও কর্তব্যবোধ থাকা দরকার। যে মানুষ তার সম্বন্ধে জঘন্য অপবাদ সহ্য করেও আপন দেশের জন্য অম্লানমুখে অবিশ্রাম খেটে যাচ্ছে—এবং খাটছে কাদের জন্য? যারা তার বিরুদ্ধে গুজব রটিয়েছে তাদেরই জন্য—তার মনের জ্বালা লাঘব করার জন্য যদি আমরা আমাদের কড়ে আঙুলটিও না তুলি, তবে আমরা যে নুন খেয়েছি তার উপযুক্ত নই। আর যদি আমাদের প্রফেশনের

কথা তুলি তবে বলব, 'তুমি আমি পুলিস; অসৎকে সাজা দেওয়া যেমন আমাদের কর্তব্য, সজ্জনকে অন্যায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করা আমাদের ততোধিক কর্তব্য,—ভারতীয় পুলিস এ কথা ভুলে গিয়েছে।

আমি তাই স্থির করলুম, ও-রেলিকে না জানিয়ে তার স্ত্রীর অনুসন্ধান করে সত্য খবর মধুগঞ্জের ইয়োরোপীয় সমাজকে গোচর করাব। এবং তারপরও কারো বিষ-জিভ যদি লকলকানি আরম্ভ করে, তবে রাস্কেলটাকে মধুগঞ্জের ক্লাবহাউসের সিঁড়িতে চাবকে দেব।

মেবল্ এবং তার বাচ্চা কোন্ মাসে বিলেত গিয়েছিল সে খবর বের করে আমি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, কলম্বো এমন কি চাটগাঁর বন্দরের সব প্যাসেঞ্জার লিস্ট তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করেও তাদের নাম পেলুম না।

ও-রেলিকে মসুরিতে নাকি মেবল্দের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল—সব কটা ইয়োরোপীয় হোটেলে অনুসন্ধান করেও ওদের নাম পাওয়া গেল না, অথচ ও-রেলির নাম সাভয় হোটেলের রেজিস্ট্রিতে রয়েছে।

ভারতবর্ষের হিল-স্টেশনে কোনো ইয়োরোপীয় রমণীর পক্ষে নাম ভাঁড়িয়ে বেশি দিন কাটানো প্রায় অসম্ভব, ছদ্মনামে ছদ্ম পাসপোর্ট নিয়ে বিলেত যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সব দিক যখন ব্ল্যাঙ্ক বেরল তখন আমি মেবল্দের বাটলারটার অনুসন্ধান করলুম সিংহলে তার গ্রামে। খবর এল সাত বৎসর ধরে সে গ্রামে ফেরেনি।

তাই আমি বড় সমস্যায় পড়েছি।

তুমি কি মধুগঞ্জে অত্যন্ত সাবধানে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কোন্ পথে এগোতে হবে, সে সম্বন্ধে কিছু হদিস দিতে পার?

মনে রেখো, আমি এ যাবৎ সব অনুসন্ধান করেছি অতিশয়

গোপনে, এবং বেশির ভাগ নিজে নিজেই—পাছে ও-রেলি খবর পেয়ে মর্মাহত হয় যে, আমিও মধুগঞ্জের বক্সওয়ালাদের মতো কুচুটে। তুমিও সাবধানে কাজ করবে। আমাদের উদ্দেশ্য ও-রেলিকে মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করা। সে কর্মে সফলতা নাও পেতে পারি, কিন্তু তাকে আরো দুঃখ দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত হবে।

শুভেচ্ছাসহ

ডাড্‌লি।'

ঠিক সাতদিন পর বড় সায়েব ডীনের কাছ থেকে একখানি ছোট্ট চিঠি পেলেন।

'যতদূর সম্ভব শীঘ্র এখানে আসুন; সব আলোচনা মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন।'

বড় সায়েব খবর দিয়ে মধুগঞ্জে পৌঁছলেন। মোটরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কী?' ডীন উত্তর না দিয়ে শুধু ড্রাইভারের দিকে আঙুল দেখালে।

রাত্রে ডিনারের পর চাকরদের বিদায় দিয়ে ডীন বড় সায়েবকে তার স্টোর-রুমের তালা খুলে ভিতরে নিয়ে গেল।

সায়েব দেখলেন, টুকরো টুকরো হাড়ে জোড়া তিনটি কঙ্কাল। একটা বড়, একটা মাঝারি, আরেকটা ছোট্ট শিশুর।

তালা বন্ধ করে দুজনে বারান্দায় ফিরে এলেন। বড় সায়েব একটা নির্জলা বড় হুইস্কি খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'কোথায় পেলে?'

'বাগানে লিচুগাছের তলা খুঁড়ে।'

'কী করে সন্দেহ হল?'

ডীন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আপনার চিঠি থেকে আমি দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে, মেবল্‌দের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমি অবিশ্বাস্য জিনিসে বিশ্বাস করে

আপন অনুসন্ধান আরম্ভ করলুম—বরঞ্চ বলতে পারেন শেষ করলুম।

এ বাংলোয় প্রথম দু রাত্রে আমি যে ত্রিমূর্তি দেখেছিলুম, সেগুলো আমার মন থেকে কখনো মুছে যায়নি। যে গাছতলায় ছায়ামূর্তিগুলো হঠাৎ মিলিয়ে যায়, সে গাছটাকেও আমি স্পষ্ট মনে রেখেছিলুম। আপনার সব তল্লাশীই যখন নিষ্ফল হল, তখন আমি যে কাজ করলুম সেটা শুনলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমার গুরুরা হাসবেন, কিন্তু যে জিনিস আমি স্পষ্ট দেখেছি, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই, সে জিনিস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাছে—আপনার কাছে—যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন, আমার কাছে তা-ই বিশ্বাস্য, সে-ই আমার খেই।

জায়গাটা খোঁড়ার আরেকটা কারণ: যদি কিছু না পাই, তবে আমি সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারব।'

বড় সায়েব দু হাতে মাথা চেপে ধরে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে।

ডীন সায়েবকে আরেকটা পেগ দিলে।

সায়েব শুধালেন, 'তোমার কী মনে হয়?'

ডীন কোনো উত্তর দিলে না, প্রশ্নটা যেন সে শুনতেই পায়নি।

এবারে সায়েব মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এ কাজ যদি ও-রেলির হয়, তবে বলব, যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ না থাকলে তার দ্বারা এটা কখনো সম্ভবপর হত না।'

ডীনও উঠে দাঁড়াল। বললে, 'খোঁড়াখুঁড়ি করার আমার তৃতীয় কারণ সেইখানেই। আপনার শেষ সিদ্ধান্ত যদি ও-রেলির সপক্ষে যায়, তবে এই কঙ্কালগুলো নিয়ে আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করতে পারবেন। এটা তো আপনার কেস।'

শব্‌নম্

আশ্চর্য এ মেয়ে! দেখি, আর বিস্ময় মানি। ভয়ে আতঙ্কে তামাম কাবুল শহরের গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে—এই পাথর-ফাটা শীতে শহরের রাস্তার মুখ পর্যন্ত পরিশুষ্ক হয়ে গিয়েছে, আর এ মেয়ে তারই মাঝখানে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে কলকল খলখল করে হাসছে। প্রেমসাগরের কতখানি অতলে ডুব দিলে উপরের ঝড়ঝঞ্ঝা সম্বন্ধে এ রকম সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন হওয়া যায়?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সব-কিছুর খবর রাখে।

বললে, 'বিদ্রোহীরা বলছে, তোমার বউ সুরাইয়া বিদেশে গিয়ে স্বৈরিণী হয়ে গিয়েছে—দ্বিচারিণী নয়, স্বৈরিণী। একে তুমি তালাক দাও, আমরা বিদ্রোহ বন্ধ করে দেব।

আমানুল্লা নারাজ।'

আমি বললুম, 'তোমাদের কবিই তো বলেছেন,

'কি বলিব, ভাই, মূর্খের কিছু অভাব কি দুনিয়ায়,
পাগড়ী বাঁচাতে হরবকতই মাথাটারে বলি দ্যায়!'

মাথা নেড়ে বললে, 'না। এখানে পাগড়ী অর্থ প্রিয়া, মাথাটা কাবুল শহর।

'আমি বলি, "দিয়ে দে না, বাপু, কাবুল শহর, চলে যা না, বাপু, প্রিয়াকে নিয়ে প্যারিস্—যে প্যারিসের ঢঙে কাবুলের চেহারা বদলাতে গিয়ে আজ তুই এ-বিপদে পড়েছিস। নকল প্যারিস নিয়ে তোর কি হবে, আসল যখন হাতের কাছে। একটা কপিরই যখন দরকার তখন আসলটা নিয়ে কার্বন-কপিটা ফেলে দে না। কাশ্মীরী-শালের উপরের দিকটাই গায়ে জড়িয়ে নে, উল্টো দিকটা দেখিয়ে তোর কি লাভ?" আশ্চর্য! তাঁর এখন ডান হাতে তলোয়ার, বাঁয়া বগলমে প্রিয়া—ডাকু পাকড়াবেন কৈসে?'

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'আমার বয়ে গেছে।

'কাজী নই আমি, মোল্লাও নই, আমার কি দায়, বল।
শীরাজী খাইব, প্রিয়ার চুমিব ওই মুখ ঢলঢল।'

এর প্রথম ছত্র হাফিজের, দ্বিতীয়টি আমার।'

আমি বললুম, 'শাবাশ! লাল শীরাজী খেতে হলে তোমার ওই গোলাপী ঠোঁটেই মানাবে ভালো। আমার কিন্তু দুটো মিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।'

'কি রকম?'

'তুমি পাশ ফিরে শুয়ে মৃদু হাস্য করবে। তখন তোমার গালের টোল হবে গভীরতম—আমি সেটিকে ভর্তি করব শীরাজী দিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে—অতি ধীরে ধীরে সেই শীরাজী চুমোয় চুমোয় তুলে নেব।'

বললে, 'বাপ্‌স্‌! কী লয়ে কল্পনা, লম্বা রসনা, করিছে দৌড়াদৌড়ি। তা কল্পনা কর, কিন্তু ব্যস্ত হয়ো না। খ্রীস্টানদের বঁ দিয়ো—ভগবান—তো এক মুহূর্তেই সৃষ্টি সম্পূর্ণ করে দিতে পারতেন; তবে তিনি ছ'দিন লাগালেন কেন?'

আমি বললুম, 'এবারে তুমি আমার কথার উত্তর দাও।'

সুশীলা বালিকার মতো মাথা নিচু করে বলল, 'বল।'

'আব্বাজান কোথায়?'

'দুর্গে। আমানুল্লাকে মন্ত্রণা দিচ্ছেন। ট্যুব থেকে বেরিয়ে-আসা ফালতো টুথপেস্ট ফের ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন।'

'তোপল্ খান?'

'লড়াইয়ে।'

'তুমি কি করে এলে?'

'রেওয়াজ করে করে। ধোপানীর তাম্বুটা যোগাড় করে প্রথম প্রথম কাছেপিঠে বান্ধবীদের বাড়িতে ওদের তত্ত্ব-তাবাশ করতে গেলুম।'

একটু থেমে বললে, 'আচ্ছা বলতো, তোমাকে ভালোবাসার পর

থেকে আমি ওদের কথা একদম ভুলে গিয়েছি। আমার যে সব সখীদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে তারাও আমাকে স্মরণ করে না। অথচ শুনেছি, পুরুষ-মানুষরা নাকি বিয়ের পর সখাদের অত সহজে ভোলে না? মেয়েরা তা হলে বেইমান নেমকহারাম?'

আমি বললুম, 'গুণীরা বলেন, প্রেম মেয়েদের সর্বস্ব, পুরুষের জীবনের মাত্র একটি অংশ। তাই বোধহয় মেয়েরা ওই রকম করে। কিন্তু আমার মনে হয়, তা নয়। আমি বিদেশী, আমি অসহায়, আমি নিজের থেকে কোন কিছু করতে গেলেই হয়তো তোমাকে বিপদে ফেলা হবে মাত্র, এই ভেবে আমি হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় কিস্মতের কিল খাচ্ছি। তুমি সেটা জান বলে, সর্বক্ষণ তোমার চিন্তা, কি করে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা, আমার বিরহ-বেদনা, তোমাকে কাছে পাওয়ার কামনা আপন কাঁধে নিয়ে আমাকে আর্ত শিশুর মতো আদর করে করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার। তোমার সখীরা, আব্বা, জানেমন্ কেউই তো তোমার উপর কোন-কিছুর জন্য এতটুকু নির্ভর করছেন না। আর আমি করছি সম্পূর্ণ নির্ভর তোমার উপর। তোমার জিম্মাদারী এখন বেড়ে গিয়েছে। জিম্মাদারী-বোধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একাগ্রতা-বোধও বেড়ে যায়।'

বললে, 'সে না হয় তোমার আমার বেলা হল—তুমি বিদেশী বলে।'

'অন্যদের বেলাও তাই। অধিকাংশ দেশেই মেয়ের জন্ম তো পরিবারের আপদ। সেই 'আপদ' যেদিন এমন একটি লোককে পায়, যাকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বাকী জীবন তার উপর নির্ভর করতে হবে, তখন তার অবস্থা তোমারই মতো হয়। কিন্তু আরেকটা কথা। এই একাগ্রতাটা মেয়েদের কিছু একচেটে নয়। লায়লীর জন্য মজনূঁর একাগ্রতাই তো তাকে পাগল বানিয়ে দিলে?'

শুধালে, 'কোন্ মজনূঁ?'

আমি বললুম, 'তার পর তুমি কি করলে বলেছিলে?'

'ওঃ! পাড়ার সখীদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে প্র্যাকটিস করলুম।'

আমি বললুম, 'শ্রীরাধা যে রকম আঙিনায় কলসী কলসী জল ঢেলে সেটাকে পিছল করে তুলে, বর্ষার রাতে পিছল অভিসার যাওয়ার প্র্যাকটিস করে নিতেন?'

ইরান তুরান আরবভূমির তাবৎ প্রেমের কাহিনী শব্‌নমের হৃদয়স্থ। তাই আমি তাকে শোনাতুম হিন্দুস্থানী রমণীর বেদনাবাণী। সে সব কাহিনীর রাজমুকুট সুচির অভাগিনী অভিমানিনী শ্রীরাধার চোখের জলের মুক্তো দিয়ে সাজাতে আমার বড় ভালো লাগে। কিন্তু একাধিকবার লক্ষ্য করেছি শব্‌নম্ যেন শ্রীরাধাকে ঈষৎ ঈর্ষা করে।

বললে, 'হুঁঃ! তোমার শুধু শ্রীরাধা শ্রীরাধা! তা সে যাক্‌গে। তার পর ধোপানীর তাম্বু পরে বেরিয়ে পড়লুম তোমার উদ্দেশ্যে। আমার ভাবনা ছিল শুধু আমার পা দুখানা নিয়ে। ও দুটো বোরকা দিয়ে সব সময় ভালো করে ঢাকা যায় না।'

আমি বললুম, 'রজকিনী চরণ বাঙলা সাহিত্যের বুকের উপর।'

'মানে?'

আমি চোখ বন্ধ করে হিমির পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে মুদ্রিত নয়নে গান ধরলুম,

'শুন রজকিনী রামী
শীতল জানিয়া ও-দুটি চরণ
শরণ লইনু আমি!'

বললে, 'এ সুরটা সত্যি আমার প্রিয়। এর ভিতর কত মধুর আকূতি আর করুণ আত্মনিবেদন আছে।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, 'শীতল চরণ' কেন বললে, বল তো?'

নাক তুলে বললে, 'বাঃ! সে তো সোজা। ধোপানী জলে দাঁড়িয়ে কাপড় আছড়ায় তাই।'

জাহাঁবাজ মেয়ে!

বললে, 'জান বঁধু, আজ ভোর বেলার আজান শুনে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন বুকের ভিতরটা যেন একেবারে ঝাঁঝরা ফাঁকা বলে মনে হল। কিছু নেই, কিছু নেই, যেন কিছু নেই। পেটটাও যেন একেবারে ফাঁপা, যেন দাঁড়াতে পারব না। বুকের ভিতর কি যেন একটা শূন্যতা শুধু ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে। সব যেন নিঙড়ে নিঙড়ে নিচ্ছে। ওঠবার চেষ্টা করলুম, উঠতে পারলুম না। কোমরের সঙ্গে আমার বাকি শরীরের যেন কোন যোগ নেই।'

'মোয়াজ্জিন তখন বলছে, 'অস্-সালাতু খৈরুন্ মিন্ অন্-নওম্—নিদ্রার চেয়ে উপাসনা ভালো।'

'আমি কাতর নিবেদনে আল্লাকে বললুম, হে খুদাতালা, তোমার দুনিয়ায় তো কোনও কিছুরই অভাব নেই। আমাকে একটুখানি শক্তি দাও।'

আমি অনুনয় করে বললুম, 'থাক্ না।'

বললে, 'কাকে তা হলে বলি, বল। জানি, তুমি এ-সব শুনে কষ্ট পাও। কিন্তু তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য তো আমি আমার দুঃখের কথা বলছি নে। আবার না বলেও থাকতে পারছি নে। এ কী দ্বন্দ্ব, বল তো?'

আমি বললুম, 'তুমি বলে যাও। আমার শুনতেও ভালো লাগে যে সর্বক্ষণ আমি তোমার মনের ভিতর আছি। এও তো দ্বন্দ্ব।'

'তবে শোন, আর শুনেই ভুলে যেয়ো। না হলে আমার বিরহে তোমার বেদনার ভার সেই স্মৃতি আরও ভারী করে তুলবে। নিজে কষ্ট তো পাবেই, তার উপর আমার কষ্টের স্মরণে বেদনা পাবে বেশী।

'এই যে ফাঁকা ভাব ভোরবেলাকার, এইটে বওয়াই সবচেয়ে বেশী শক্ত।'

> 'কে বল সহজ, ফাঁকা যাহা তারে, কাঁধেতে বহিতে সওয়া?
> জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায় ততই কঠিন বওয়া।'

'ফাঁকা জিনিস ভারি হয়ে যায়, এর কল্পনা কি আমি কখনও করতে পেরেছি ?

'কোন গতিকে এই দেহটাকে টেনে টেনে বাইরে এনে নমাজ পড়লুম। হায় রে নমাজ। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেওয়াকে যদি নমাজ বলে তবে আমার মতো নমাজ কেউ কখনও পড়েনি।'

আমি অতি কষ্টে চোখের জল থামিয়ে বলেছিলুম 'সেই তো সব-চেয়ে পাক্ নমাজ।'

যেন শুনতে পায়নি। বললে, 'যখন 'ইহ্‌দিনাস্ সীরাতা-ল্ মুস্তকীমে' এলুম—'আমাকে সরল পথে চালাও'—তখন মন সেই সোজা পথ ছেড়ে চলে গেল নূতন অজানা দুর্ভাবনায়। তবে কি আমি ভুল পথে চলেছি বলে তাতে এত কাঁটা, বিভীষিকার বিকৃত ভাল ?'

আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'বল তো গো তুমি, তোমাকে বিয়ে করার আগে যে আমি তোমার গা দুতিনবার ছুঁয়েছি, তোমাকে হৃদয়-বেদনা বলেছি, তোমাকে স্বপ্নে কল্পনায় জড়িয়ে হৃদয়ে টেনে নিয়েছি, সেই কি আমার পাপ ? আমি তো অন্য কোন পাপ করিনি।' এবারে উত্তরের জন্য চুপ করে গেল।

আমি বললুম, 'হিমি—'

'আঃ!' বলে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার কোলে মাথা গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর বা হাঁত দিয়ে তার মাথায় চেয়ে বড় খোঁপাটি আস্তে আস্তে আল্‌গা করে দিল। সমস্ত পিঠ ছেয়ে ফেলে তার চুল লম্বা কুর্তার অঞ্চলপ্রান্ত অবধি পৌঁছল। আমি আঙুল দিয়ে তার গ্রীবা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উপরের দিকে তুলে বিলি দিতে দিতে অলকস্তবক অতৃপ্ত নিঃশ্বাসে শুষে নিয়ে বললুম, 'হিমিকা, আমি তো বেশী ধর্মগ্রন্থ পড়িনি, আমি কি বলব ?'

বললে, 'না গো, না। আমি মোল্লার ফৎওয়া চাইছি নে। তোমার কথা বল।'

'আমিও শুধাই, সবই শাস্ত্র, হৃদয় বলে কিছু নেই?'

স্পষ্ট অনুভব করলুম, তার চোখের জলে আমার কোল ভিজে গেছে।

বললুম, 'কেঁদো না, লক্ষ্মীটি।'

বললে, 'তুমি মেহেরবানী করে আজকের মতো শুধু আমাকে কাঁদতে দাও। আজ আমার শেষ সম্বল উজাড় করে দিয়ে আর কখনো কাঁদবো না।'

উঠে বসল। চোখ তখন ভেজা। শব্‌নমের আঁখিপল্লব বড় বেশী লম্বা। জোড়া লাগার পর উপরের সারি উপরের দিকে আর নিচের সারি নিচের দিকে অনেকখানি চলে গিয়েছে।

'জান তুমি, যখন সব সান্ত্বনার পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন হৃদয় হঠাৎ এক আনন্দলোকের সন্ধান পায়? আছে তোমার অভিজ্ঞতা? আমার আজ ভোরে হল।

'আমি নিজেকে বললুম, আমি যাচ্ছি আমার দয়িতের মিলনে, আমার স্বামীসঙ্গমে। আল্লা আমাকে এ হক্ক দিয়েছেন। আমাদের মাঝখানে কেউ যদি এসে দাঁড়ায় তবে সে শয়তান। আমি তাকে গুলি করে মারবো—পাগলা কুকুরকে মানুষ যে রকম মারে, সাপের ফণা যে রকম রাইডিং বুট দিয়ে থেঁৎলে দেয়।

'এই দেখ।'

পাশের স্তূপীকৃত বোরকার ভিতর থেকে বের করল এক বিরাট রিভলভার। তার হ্যাণ্ড-ব্যাগের সেই ছোট্ট পিস্তলের তুলনায় এটা ভয়াবহ দানব।

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালাম। চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। কাঠের মতো শুকনো প্রত্যেক চোখের প্রত্যেক পল্লব—আলগা আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে।

'প্রত্যেক শয়তানকে মারবো গুলি করে। অগুণতি, বেহিসাব —দরকার হলে। বোরকার ভিতরে রিভলভার উঁচু করে তাগের জন্য তৈরী ছিলুম সমস্ত সময়। কেউ সামনে দাঁড়ালেই গুলি। প্রশ্নটি শুধাবো না। বোরকার ভিতর থেকেই।

'তাদের মরা লাশের উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে আসতুম, তোমার কাছে।

'কী? আমার ছেলে হবে শুধু শান্তির সুখময় নীড়ে? বক্‌রীর কলিজা নিয়ে জন্ম নেবে তারা তা হলে। আমার নাতি কিংবা তার ছেলে হয়তো কোন কলিজা নিয়েই জন্মাবে না। শুধু রক্ত পাম্প করার জন্য এতখানি জায়গা জুড়ে এই বিরাট হৃদয়। আর আজ যদি আমি বিঘ্ন-বিপদ তুচ্ছ করে শয়তানকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তোমার কাছে পৌঁছই তবে আমার ছেলে হবে বাঘের গুর্দা, সীনা, কলিজা নিয়ে।'

আমি শবনম্‌কে কখনো এ রকম উত্তেজিত হতে দেখিনি। কি করে হল? এ তো মাত্র এক মাস। কান্দাহারে এক বছর কাটিয়ে আসার পরও তো এরকমধারা দেখিনি। তবে কি সে কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে বনদেবতার শান্তিকামী অগ্রদূত বিহঙ্গের মতো কলরবস্বরে সবাইকে সাবধান করে দিতে চায়? না, কোনো কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করেছে, এই এক মাস ধরে?

বললুম, 'তোমার রুদ্ররূপকে আমি ভয় করি, শব্‌নম্‌। তুমি তোমার প্রসন্ন কল্যাণ মুখ আমাকে দেখাও।

'আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বজনের শুভ আশীর্বাদ আমাদের মিলনের উপর আছে।'

কবিতা শুনতে পেলে সে ভারী খুশী হয় বলে আমি বললুম,

> 'দাবানল যবে বনস্পতিরে দগ্ধ দাহনে দহে
> শুষ্কপত্র আর্দ্র পত্রে কোন না প্রভেদ সহে।'

শান্ত হয়ে গেল। বললে, 'কিস্মৎ।'

আমি তাকে আরো শান্ত হবার জন্য চুপ করে রইলুম।

বললে, 'তুমি কিছু মনে করো না। ভেবেছিলুম বলব না, কিন্তু আমি পরপর তিনদিন উপোস করে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম, তাই এ উত্তেজনা। উপোসের পরে মনে হল, তুমি যে সেই পাতি-নেবুটি দিয়েছিলে সেইটে যদি তাজা থাকতো তবে শরবৎ বানিয়ে খেতুম।'

আমি বললুম, 'হা অদৃষ্ট। আমার গাল টোল খায় না। তুমি কিসে ঢেলে খাবে? তা তুমি যত খুশি নেবু পাবে, আমাদের বাড়ির গাছে। আমরা যখন একসঙ্গে হিন্দুস্থান যাব—'

দেখি সে তার বড় বড় চোখ আরো বড় করে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, 'কি হল?'

বললে, 'তাজ্জব। তাজ্জব। আমার দিবাস্বপ্নে তো এ-আইটেমটা বিলকুল স্থান পায়নি। দাঁড়াও, আমাকে বলতে দাও। ট্রেনে একটা কুপেতে শুধু তুমি আর আমি। না। তারই বা কি দরকার। তোমাকে তো কখনো ভিড়ের মাঝখানে আমি পাইনি। সে আনন্দ আমি পুরোপুরি রসিয়ে রসিয়ে চাখবো। ভিড়ের ধাক্কায় তুমি ছিটকে পড়েছ এক কোণে, দরজার কাছে, আর আমি আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তোমার পানে পিছন ফিরে। আয়নাতে দেখছি তোমার মুখের কাতর ভাব, আমার জন্য বার্থ পাওনি বলে। একটুখানি ঘাড় ফিরিয়ে তোমাকে হানবো মধুরতম কটাক্ষ—এক গাড়ি লোকের কৌতূহল নয়নে তাকানোকে একদম পরোয়া না করে। আমার তখন কী গর্ব, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার জন্য কত ভাবছ।'

আমি বললুম, 'শোন শবনম্, তোমাকে একটা সত্য কথা আজ বলে রাখি। আমার মতো লক্ষ লক্ষ হিন্দুস্থানী আল্লার দুনিয়ায় রয়েছে। এমন কি এখানে যে কজন হিন্দুস্থানী আছে তার ভিতরও

আমি এ্যাডোনিস্ বা রুডল্‌ফ্ ভালেন্টিনো নই। তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি ওদিকে আমূ দরিয়া, পুবে পেশাওয়ার, পশ্চিমে কান্দাহার, দক্ষিণে দক্ষিণ-পাহাড় ছাড়িয়ে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে গেছে, কেউ জানে না। আমি শুনেছি ভারতীয় শিক্ষকদের কাছে, তাঁরা শুনেছেন তাঁদের স্ত্রীদের কাছ থেকে। তাঁরা বলেন, বাদশা আমানুল্লা নিতান্ত একদারনিষ্ঠ বলে তুমি অবিবাহিতা—একই দেশে তো ছটো রাজা থাকতে পারে না, যদিও একই গাছ-তলায় একশ'টা দরবেশ্ রাত্রি কাটায়। গর্ব যদি কারও হয় তবে সে হবে আমার। তামাম হিন্দুস্থান তোমার দিকে তাকাবে আর ভাববে কোন্ পুণ্যের ফলে আমি তোমাকে পেয়েছি।'

বললে, 'শুনতে কী যে ভাল লাগে, কি বলব তোমায়। আমি জানি, আমার লজ্জা পাওয়া উচিত, মাথা নিচু করা উচিত কিন্তু আমি এমনি বে-আব্রু বেহায়া যে এসব কথা আমার আরো শুনতে ইচ্ছে করছে। যদি কুপে পেয়ে যাই তবে আমি খোলা জানলার উপর মুখ রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকব, আর তুমি পিছনে বসে আমার পিঠের উপর খোলা চুলে মুখ গুঁজে এই সব কথা বলবে।'

তার পর আমার দিকে স্থির কিন্তু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলবে, 'শুনে রাখ, আমি আমার ভালবাসা দিয়ে দেহের সৌন্দর্যকে হার মানাবো। সে হবে পরিপূর্ণ একটি হিমকণিকার মতো—যার প্রেমের ডাকে আকাশের শত লক্ষ তারা হবে প্রতিবিম্বিত, আর দিনের বেলা গভীর নীলাম্বুজের মতো নীলাকাশ—তার অন্তহীন রহস্য নিয়ে।'

তারপর শবনম্ পড়লো তার সফর্-ই-হিন্দুস্তান অর্থাৎ ভারত ভ্রমণ নিয়ে।

হিন্দুস্থানের রেল লাইনের ছপাশে অক্লেশে সে গজালে আঙুর বন, দিল্লীর কাছে এসে ব্লিজার্ডের বরফে ট্রেন আটকা পড়লো ছ'দিন, ডাইনিং কারে অর্ডার দেওয়া মাত্র পেয়ে গেল কচি ছম্বার

শিক্-কাবাব, ট্রেন পুরো পাক্কা একটা দিন ছুটলো ঘন চিনার বনের মাঝখান দিয়ে, আগ্রা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সে কিনলে নরগিস্ ফুল আর হলদে গুল্-ই-দায়ূদী, মোমতাজের গোরে দেবার জন্য। আর সর্বক্ষণ পাশের গাড়িতে বসে আছে তোপল্ খান, উরুর উপর দু'খানি রাইফেল পাতা, পকেটে টোটা ভরা রিভলভার, বেল্টে দমস্কসের তলোয়ার—পাছে তার চার মুহম্মদী শর্তে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলার কেনা টিকিট স্বামীটিকে কেউ কেড়ে নেয়।

আমার তো ভয় হচ্ছিল, আবার বুঝি শব্‌নম্ বোরকার ভিতর থেকেই পিস্তল মারতে আরম্ভ করে—মার্কিন গ্যাংস্টাররা যে রকম পকেটের ভিতর থেকেই তাগ করে দুশমন ঘায়েল করতে পারে।

নানাবিধ মুশকিল যাবতীয় ফাঁড়া-গর্দিশ এবং তার চেয়ে প্রচুরতর আনন্দের ভিতর দিয়ে শব্‌নম্ বীবী তো শেষটায় পৌঁছলেন পূর্ব বাঙলায় তাঁর শ্বশুরের ভিটায়।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'বাঁচালে।'

'দাঁড়াও না, তোমার খালি তাড়া। হাফিজ বাঙলা দেশে না আসতে পেরে বাঙলার রাজদূতকে তার বাদশার জন্য কি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন? সেই যেটা তোমাকে হোটেলের বারান্দায় দিয়েছিলুম।'

আমি বললুম,

'হেরো, হেরো, বিস্ময়!
দেশ কাল হয় লয়!
সবে কাল রাতে জনম লইয়া এই শিশু কবিতাটি
রওয়ানা হইল পাড়ি দেবে বলে এক বছরের ঘাঁটি।'

তুমিও এক মাসের বধূ, এক বছরের পথ পাঁচ দিনে পৌঁছলে।'

'চুপ, চুপ, ওই বৈঠকখানায় মুরুব্বীরা বসে আছেন। ওঁদের গিয়ে প্রথম সালাম করতে হবে, না সোজা অন্দর মহলে যেতে হবে? কী মুশকিল, কিচ্ছু যে জানি নে।'

আমি বললুম, 'এই বারে পথে এস—আমাকে যে কথা কইতে দাও না।'

'তোমার পায়ে পড়ি, বলে দাও না। এই কি দাদ নেবার সময়?'

আমি বললুম, 'প্রথম অন্দরে। মা বরবধূ বরণ করবেন যে।'

'সে আবার কি?'

'মা মোড়ায় বসবে, আমি তাঁর ডান উরুতে বসব, তুমি বাঁ উরুতে বসবে—'

'সর্বনাশ! আমার ওজন তো কম নয়! তোমার কত?'

'একশ দশ পৌণ্ড।'

'কিলোগ্রামে বল।'

'সে হিসেব জানি নে।'

'দাঁড়াও, কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসি।'

ওর আঁক কষার মাঝখানে আমি দরদ ভরা সুরে বললুম, 'হ্যাঁগা, তোমার হিসেবে তো দেখছি তোমার ওজন চারশ পৌণ্ড। আমার চেয়ে চারগুণ ভারি। তা হতেও পারে।'

'ইয়ার্কি ছাড়। ওটা,—ওটা—ওটা হল গিয়ে আউন্স।'

'তা হলে তোমার ওজন আমার চার ভাগের এক ভাগ, হবেও বা।'

'সর্বনাশ! তাও তো হয় না। এখন কি করা যায়?'

আমি বললুম, 'আলতো আলতো বসলেই হবে।'

মা বরণ করলেন। কলাপাতা দিয়ে তেকোণা করে বানানো সমোসার মতো পত্রপুটের ভিতর ধান—তিন কোণ দিয়ে বেরিয়ে আছে দূর্বা। আমাদের মাথার উপর অনেকগুলো রাখলেন। শব্‌নমের ওড়না তার হাঁটু পর্যন্ত নামানো।

আমার দুই ভাইঝি জাহানারা আর রাণী—'কুটিমুটি'—প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়েছে নূতন চাচীর মুখ সকলের পয়লা দেখবে বলে।

শব্‌নম্ স্বপ্ন দেখছে। আমি কথা বলে এক স্বপ্ন উড়িয়ে দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে আরেক স্বপ্নে ঢুকে যায়। কিন্তু সবচেয়ে তার ভাল লাগে মায়ের কোলে ওই বসাটা।

একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার রইল এ-জীবনে একটি মাত্র আশঙ্কা। মা যদি আমাকে ভালো না বাসে।'

আমি ব্যাকুল হয়ে বললুম, 'তুমি ওই ভয়টি করো না শব্‌নম্—প্লীজ—লক্ষ্মীটি। তোমাকে ভালবাসবে মা সবচেয়ে বেশী। তুমি কত দূরদেশ থেকে এসেছ, সব আপন জন ছেড়ে, শুধু আমাকে ভালবাস বলে। একথা মা এক মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারবে না। মাকে যদি কেউ ভালবাসে একতিল, মা তাকে বাসে একতাল। আমাকে যদি কেউ ভালবাসে এক কণা, মা তাকে বাসবে দুই দুনিয়া—ইহলোক, পরলোক।'

'বাঁচালে। তুমি তো জান, আমার মা নেই।'

যাবার সময় শব্‌নম্ বললে, 'বিপদ ঘনিয়ে আসছে। শিগগিরই তার চরমে পেঁছিবে।'

আমি চিন্তিত হয়ে শুধালুম, 'তুমি কিছু জান ?'

বললে, 'না। আমি শুধু আমার হাড়ের ভিতর অনুভব করছি।'

'আবার কবে দেখা হবে ?'

'এরকম থাকলে রোজই আসতে পারব।'

তারপর দুজনাই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম, মুখোমুখি হয়ে। বলার কথার অভাব আমাদের কারোরই হয় না, কিন্তু বিদায়ের সময় যতই ঘনিয়ে আসে ততই আমরা শুধু একে অন্যের দিকে তাকাই আর আপন মনে মনে অজুহাত খুঁজি কি করে বিচ্ছেদমুহূর্ত আরো পিছিয়ে দেওয়া যায়। শব্‌নম্ আমার মনের কথা আমার বেদনাতুর চোখ দেখেই বুঝতে পারে আর নিজের চোখ দুটি নিচের দিকে নামায়। হয়তো তার চোখে জল এসেছে।

কখনো বা জড়িয়ে-যাওয়া গলায় কি একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

এবারে বললে, 'তুমি প্রতিবারে আমাকে দাও আগের বারের চেয়েও বেশী। যত বেদনা নিয়েই বিদায়ের সময়টা আসুক না কেন, পথে যেতে যেতে ভাবি তুমি যে আনন্দ দিয়েছ এর বেশী আর আসছে বার কি দেবে? তবু তুমি দাও, প্রতিবারেই দাও, বেশী করে দাও, উজাড় করে দাও। কি দাও তুমি? আমি অনেক বার ভেবেছি। উত্তর পাইনি। এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, আমার রাজার রাজা, গোলামের গোলাম, এই তো আমার আনন্দের পরিপূর্ণতার চরম সীমা। এর বেশী আমি কীই বা চাইতে পারি, তুমি কীই বা দিতে পার? তবু পাই, প্রতিবারেই অদ্ভুত অনির্বচনীয় রসঘন আনন্দ। আর যখন তুমি আমাকে বল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি' তখন আমার দু'চোখ ফেটে বেরয় অশ্রু। আমার কাণায় কাণায় ভরা হৃদয়পাত্র তখন যেন আর বেদনার কূল না মেনে উপছে পড়তে চায়। বল, তুমি আমায় কক্‌খনও ত্যাগ করবে না?'

আমি থতমত খেয়ে গেলুম। এত কথা বলার পর এই অর্থহীন প্রশ্ন? যেখানে আমরা পৌঁছেছি সেখানে এ-প্রশ্ন যে একেবারে অসম্ভব—পাগলেরও কল্পনার বাইরে।

বললে, 'তুমি আমাকে মার, সাজা দাও, ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দাও, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করো না।'

আমি কিচ্ছু বলিনি। শুধু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।

বললে, 'বড় দুঃখে আজ সকালে একটি কবিতা লিখেছি। নিজে কখনো এ জিনিস লিখিনি বলে প্রথম দু' লাইন এক বিদেশী কবির কাছ থেকে নিয়েছি। কিন্তু আজ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কবিতাটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। তোমার

কলমটা দাও। এটা কিন্তু গদ্যে লিখব। এখন পড়ো না,—আমি চলে যাওয়ার পরে পড়ো।'

দেউড়িতে এসে অবাক হয়ে শুধোলে, 'তুমি আবার চললে কোথায়?'

আমি বললুম, 'তোমাকে পেঁৗছে দিতে।'

দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'অসম্ভব।'

আমি তর্ক করিনি।

ওই একটি দিন, একটি বার, আমি আমার জীবনে তার আদেশ লঙ্ঘন করেছি। তর্ক না করে, আপত্তি না তুলে। শেষটায় সে হার মানল। আমি বেশ কিছুটা পিছনে তার উপর নজর রেখে রেখে চললুম। বাড়ির দেউড়িতে পেঁৗছে একবার ঘুড়ে দাঁড়াল।

সে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি, কিন্তু আমি শুনেছি সে বলেছিল, 'তোমাকে খুদার হাতে সমর্পণ করলুম।'

বাড়ি ফিরে এসে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলুম।

'তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অশ্রুর পারাবার
কেমনে হইব পার?
দুখ-রজনীর প্রেমের প্রদীপ ভাসায়ে দিলেম আমি
দীরঘ নিশাস পালেতে দিলেম জানে অন্তরযামী।
শেষ দীপ-শিখা দিলেম তোমারে মোর কিছু নাহি আর
ত্বরা এসো বঁধু, বেগে এসো প্রভু, নামাও বেদনাভার।'

এর পর গদ্যে লেখা: 'এর আর প্রয়োজন নেই
তুমি যে অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছ—'

বাকিটা শেষ করেনি।

পুরুষমানুষ হয়েও সে রাত্রে আমি কেঁদেছিলুম। 'হে পরমেশ্বর',—চোখের জলে বলেছিলুম, 'হে দয়াময়, আমাকে কেন পুরুষ করে জন্ম দিলে? এই বলহীনা সব বিপদ তুলে নেবে আপন মাথায়,

আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব? আমি কোনদিন তার কোনো কাজে লাগব না?'

পরদিন সকাল বেলাই খবর পেলুম, আমানুল্লার সৈন্যদল রাত্রিবেলা হেরে যাওয়াতে তিনি তাঁর বড় ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে কান্দাহার পালিয়ে গিয়েছেন।

রাস্তার অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর। বোরকা তো অন্তর্ধান করেছেই, তাগড়া জোয়ানরাও একলাএকলি বেরোয় না—এক একটা দলে অন্তত পাঁচ-সাত জন না থাকলে মানুষ নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। বাচ্চার ডাকু সৈন্যদল রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে।

তিন দিন পর আমানুল্লার দাদাও সিংহাসন ত্যাগ করে চলে গেলেন। বাচ্চা সাড়ম্বরে সিংহাসনে বসল।

এসব খবর যে কোনো প্রামাণিক আফগান ইতিহাসে সবিস্তর পাওয়া যায়—একথা পূর্বেই বলেছি। আমি ইতিহাস লিখতে বসিনি; বাচ্চার আপন হাতে জ্বালানো দাবানল শব্‌নম্ ও আমার মত নিরীহ শুষ্ক পত্রের দিকে কি ভাবে এগিয়ে এল সেইটে বোঝাবার জন্য হ্রস্বতম খেইগুলো ধরিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

দু হাতে মাথা চেপে ধরে ভাবছি, কি করি, কি করি? কোন্ দিকে পথ, কোথায় আলো—আর কোন্‌টাই বা আলেয়া?

সুখ চাই নে, আনন্দ চাই নে, এমন কি প্রিয়মিলনও চাই নে—কি করে এই দাবানল থেকে শব্‌নম্‌কে রক্ষা করি?

আমি রক্ষা করবার কে?

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়িতে বুটের ধপাধপ শব্দ করে আব্দুর রহ্‌মান ঘরে ঢুকে প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে, 'সর্দার আওরঙ্গজেব খান এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।' আব্দুর রহ্‌মানের গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

আমি দু'বার শুনেও প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারিনি।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম।

মাথা নিচু করে কিছু না বলে নীরব অভ্যর্থনা জানালুম।

তিনি গম্ভীরে—এবং সেই অর্ধসম্বিতেও আমার মনে হল—প্রসন্ন অভিবাদন জানালেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আপনার পরে'—অর্থাৎ 'আপনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।' তিনি কেন এসেছেন, এই ভাবনার ভিতরও আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, শব্‌নমের গলা মধুর, এঁর গলা গম্ভীর, অথচ দু'গলারই আদল এক, ঝংকার সমধ্বনি। যেন শিশু শব্‌নম্‌ বাপের পাগড়ী জোব্বা গোঁফদাড়ি পরে এসেছে।

আমি আপত্তি না জানিয়ে শুধু 'খানা-ই শুমা অস্ত্‌'—'এটা আপনার বাড়ি' বলে আগে আগে পথ দেখিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ইরাণী কায়দায় একবার 'এটা আপনার বাড়ি' বলার পর অভ্যাগতজন আদেশ করবেন, গৃহস্থ তাঁর কথা-মত চলবে।

আমাকে আসন দেখিয়ে নিজে সোফায় বসলেন।

আমি কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইরান আফগানের মুরুব্বীরা এতে খুশী হয়ে বলেন, 'বাচ্চা খিজালৎ মী কশদ্‌—ছেলেটার আব্রু-শরম-বোধ আছে।'

শুধালেন, 'আপনি আমার পরিচয় জানেন?'

আমি মৃদু কণ্ঠে বললুম, 'কিছু কিছু জানি।'

বললেন, 'তাই যথেষ্ট। আমিও আপনাকে কিছু কিছু চিনি। এদেশে এখন অল্প-বিস্তর বিদেশী আসতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু আমি সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার সুযোগ এখনো পাই-নি। তবে গেল বছর আপনাদের কলেজের বাৎসরিক পরবে আপনি এদেশে শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেইটে শোনবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আপনি বড় একাগ্র মনে

অত্যন্ত দরদ দিয়ে আপনার বক্তব্য পেশ করেছিলেন সেটা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। আমার মনে হয়েছিল, আপনি এই পরদেশকে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছেন। নয় কি?'

আমি মাথা নিচু রেখেই বললুম, 'এদেশ আমাকে অবহেলা করেনি। এদেশে আমি আশাতীত ভালবাসা পেয়েছি। প্রতিদানের চেয়েও বেশি দেবার চেষ্টা করেছি।'

'এই তো ভদ্রজনের আচরণ।'

আমি তখন শুধু ভাবছি, তাঁর এখানে আসার রহস্য কি? তবে কি শব্‌নম্‌ তাঁকে কিছু বলেছে। তাই বা কি করে হয়?

নিজের থেকেই তিনি কাবুলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় আমাকে বোঝালেন। তাঁর যুক্তিধারা থেকে পদে পদে প্রমাণ হল তিনি সাধারণ সৈন্যদেরও কঠিন জিনিস বোঝাতে অভ্যস্ত।

সর্বশেষ বললেন, 'আমি সোজা কথা বলাটাই পছন্দ করি। আমার মনে হচ্ছে, আপনিও সরল লোক। তাই আপনার কাছে অন্য লোক না পাঠিয়ে আমি নিজেই এসেছি। যদিও এ অবস্থায় নিজে আসাটার রেওয়াজ এদেশে নেই।

'আমি আমার নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠিনি। আমি সিপাই। প্রাণের প্রতি যাদের অত্যধিক মায়া তারা ফৌজে বেশী দিন থাকে না—অন্তত শুদ্ধমাত্র দু'পয়সা কামাবার জন্য আমার ফৌজে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না।

'এবারে আপনাকে যা বলছি তা গোপনে।

'আমার একটি কিশোরী কন্যা আছে। লোকে বলে অসাধারণ সুন্দরী। অন্তত তার সে খ্যাতি অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। আমি আজ বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি বাচ্চা-ই-সকাওয়ের দ্বিতীয় সেনপতি—প্রথম সেনাপতির ছোট ভাই—বছর দুই পূর্বে কাঠ বেচতে এসে তাকে কাবুলে দেখতে পেয়েছিল—আমার মেয়ে

সচরাচর পর্দা মানতো না। যে জিনিস তখন তার বদ্ধ উন্মাদাবস্থার ও উৎকট কল্পনার বাইরে ছিল আজ সৈন্যদল প্রয়োগে সেটা অসম্ভব নাও হতে পারে।

'আপনি হিন্দুস্তানী। আপনি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করেন তবে সে হিন্দুস্তানী ন্যাশনালিটি পেয়ে যাবে। আমি আপনাদের রাজদূতাবাসে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ; ভারতীয় এক বড় রাজকর্মচারী বললেন, 'আইনত আমার মেয়ের যে অধিকার জন্মাবে সেটা তিনি রক্ষা করার সর্ব চেষ্টা করবেন।' যদিও প্রয়োজন ছিল না, তবুও কথা উঠেছিল, এখানে শিক্ষিত অবিবাহিত কে কে আছেন। সেই প্রসঙ্গে আপনার নাম যখন উঠল মাত্র তখনই তিনি সন্তর্পণে তাঁর উৎসাহ দেখিয়েছেন।'

এই অভাবনীয় পরিস্থিতির সামনে পড়ে আমি বিস্ময়েই হোক, আনন্দেই হোক, কিছু না বুঝতে পেরেই হোক হয়তো একটা অস্ফুট শব্দ করেছিলুম।

তিনি বললেন, 'আপনি একটু চিন্তা করুন এবং তার পূর্বে বাকি কথা শুনে নিন।

'বাচ্চা-ই-সকাও এখন মোল্লাদের কথামত চলে। অন্তত তারা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়াটাতে সম্মতি দিতে পারবে না।

'ব্রিটিশ এ্যারোপ্লেন ভারতীয় নারীদের আপন দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ভারতীয় কর্মচারী আমাকে সদয় আশ্বাস দিয়েছেন, প্রথম সুযোগেই তিনি আমার মেয়েকে হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দেবেন।

'এদেশে ফরাসী জর্মন বিদেশী প্রায় সবই অবিবাহিত। কিন্তু আমার মেয়ে কিছুতেই ইউরোপীয় বিয়ে করবে না। প্রথমত তারা খ্রীস্টান, দ্বিতীয় তাদের সাম্রাজ্যবাদ প্রবৃত্তি এবং তৃতীয় —বোধহয় এইটেই সর্বপ্রথম বলা উচিত ছিল—তাদের শারীরিক

অশুচিতা সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। যদিও তার তমদ্দুন্-কৃষ্টিজ্ঞের, তার বৈদগ্ধের অর্ধেকেরও বেশী ফরাসী।

'এ কথাটা তুললুম, আপনি হয়তো শুধাবেন, আমার মেয়ের মত আছে কি না। আপনি মত দিলে তাকে আমি জিজ্ঞেস করব, কারণ ধর্মত আইনত সে প্রাপ্ত-বয়স্কা। যদি সে অমত করে, আশা করি আপনার অভিমানে লাগবে না। যে রকম আমি আপনাকে সরল মনে বলছি, আপনি অমত করলে আমি কণামাত্র অপমানিত বোধ করব না।

'কারণ, হয়তো আপনারা আপনাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করেন না; আমরাও আমাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করি নে—যদিও ইসলাম এরকম গোষ্ঠী পাকানো নিন্দার চোখে দেখে। আপনি রাজী না হলে আমি কখনো ভাববো না, আপনি আমার মেয়েকে কিংবা আমি এবং আমার গোষ্ঠীকে খাটো করে দেখলেন।

'আমার মেয়ে সম্বন্ধে বাপ হয়ে আমি কি বলব। আমি প্রশংসা করতে চাই নে। সে আমার একমাত্র মেয়ে, ছেলেও নেই, তার গর্ভধারিণী—'

এই প্রথম তাঁর সরল দৃঢ় কথাতেও যেন একটু অতি ক্ষীণ কাঁপন শুনতে পেলুম।

'—অল্প বয়সে মারা যান। বাপ হয়ে তাই ইংরেজের মতো ম্যাটার অব ফ্যাক্ট্‌ বা সাদামাটা ভাবে বলি, তার চারটে 'বি'-ই আছে। বিউটি, ব্রেন, বার্থ, ব্যাঙ্ক—অবশ্য চতুর্থটা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সর্বশেষে আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই, আপনি রাজী হলে ফলস্বরূপ বাচ্চার সেনাপতির বিরাগভাজন হবেন।'

এতক্ষণ তিনি আমার দিকে ঝুঁকে, ঊরুতে দুই কনুই রেখে,

চিবুক দুই হাতের উপর রেখে কথা বলছিলেন। এবারে শিরদাঁড়া খাড়া করে ফৌজী কায়দায় সোজা হয়ে বসে বললেন, 'এবারে আপনি চিন্তা করে বলুন।'

তিনি যে ভাবে শান্ত হয়ে আসনে বসলেন তার থেকে বোঝা গেল, প্রিয়, অপ্রিয় নানারকম সংবাদ শুনতে তিনি অভ্যস্ত। আমার 'না' তাঁকে বিচলিত করবে না, আমার 'হাঁ' তাঁকে প্রসন্ন করবে।

আমার 'হাঁ,' 'না' ভাববার কি আছে। তবু আমি এতই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম যে প্রথমটায় আমি কিছুই বলতে পারিনি। তারপর মাথা নিচু রেখেই নববরের কণ্ঠে বলেছিলুম, 'আপনার কন্যাকে আমি আল্লাতালার মেহেরবানীর মতো পেতে চাই।'

সরল হৃদয় মনে করে প্রেম লুকায়ে রাখিতে পারে,
কাচের ফানুস মনে মনে ভাবে লুকায়েছে শিখাটারে।

দিল গুমান দারদ কি পুশীদে অস্ত্ রাই-ই ইশ্ক্রা
শময়া ফানুস পন্দারদ্ কি পিনহান্ করদে অস্ত।

শুধাইনু, 'হে নবীনা, ভালোবাস মোরে কিনা?'
রাঙা হ'ল তার মুখখানি;
প্রেম ছিল হৃদে ঢাকা। তাই যবে হয় আঁকা
আকাশেতে লাল রঙ, জানি—
পাহাড়ের আড়ালেতে সবিতা নিশ্চয় ভাতে
রক্তাকাশ তাই দেয় মানি।

'ভেন্দেত্তা'

এই নামে প্রকাশিত মপাসাঁর একটি ছোটগল্প বহু পাঠকের সুপরিচিত। কর্সিকার এক বুড়ীর একমাত্র ছেলেকে খুন করে আততায়ী সার্দিনিয়া পালিয়ে যায়। বুড়ী প্রতিশোধ নেবার জন্যে খড়ের মানুষ তৈরি করে প্রথমটায় তার গলার ভিতর মাংস রেখে কুকুরকে ট্রেন করে, কি করে তার গলা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে হয়, পরে মাংস বাদ দিয়ে। ট্রেনিং শেষ হলে বুড়ী সার্দিনিয়া গিয়ে সেই কুকুরকে দিয়ে পুত্রের আততায়ীকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ায়।

* * * *

এবারের ঘটনাটি অতখানি রগরগে না হলেও বড় বিষাদময়। অকুস্থল ঐ কর্সিকারই কাছে, তবে সমুদ্রের ওপারে উত্তর ইতালির জনপদভূমিতে। কাল: ১৫ই জুলাই, ১৯৪৪। যুদ্ধের শেষের দিক।

মিত্রপক্ষে ও জর্মনিতে তখন ইতালি দেশেও জোর লড়াই চলছে। এবং জর্মনদের পিছনে ইতালীয় গেরিল্লারা (এদের কিছুটা কম্যুনিস্ট, বাকিরা ফাসিস্ট ও নাৎসি-বিরোধী) যেমন জর্মনদের বিরুদ্ধে তীব্র গোপন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তেমনি আপন দেশবাসী ফাসিস্ট এবং জর্মন-মিত্রদের বিরুদ্ধেও। এবং দেশবাসীর বিরুদ্ধে লড়াইটাই হয়ে উঠেছিল তীব্রতর, তিক্ততর। রাজনৈতিক দলাদলির নাম করে সবাই আপন আপন শত্রু নিধনে লেগে গিয়েছে। ইতালি প্রতিশোধের দেশ এমনিতেই—আইন-আদালত থাকাকালীনও, আর এখন তো কথাই নেই।

১৫ জুলাইয়ের সকাল বেলা উত্তর ইতালির ছোট গ্রাম মন্তালবাতে দশ বছরের মেয়ে আল্‌ফা জুবেল্লি বাড়ির সামনের বাগানে সঙ্গিনীদের নিয়ে খেলাধুলো করছিল। এমন সময়

আচমকা বাড়ির গেট খুলে কয়েকজন গেরিল্লা বাগানে ঢুকলো। গুলি করার জন্য তৈরি তাদের কাঁধে ঝুলছে টমিগান। একজন সেই ছোট্ট মেয়েটিকে শুধলে, 'তোর মা কোথায় ?'

ভয়ে আল্‌ফার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ফ্যালফ্যাল চোখে বাড়ির দিকে সে তাকিয়ে রইল স্থাণুবৎ।

কয়েক মিনিট পরে গেরিল্লারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তাদের মাঝখানে আল্‌ফার মা—পরনে তখনো রান্নাবান্না করার সময়কার এপ্রন। এবং আল্‌ফার কাকা—আল্‌ফার বাবাকে ইতিপূর্বে ইতালি সরকার জর্মনদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী জর্মনিতে শ্রমিক হিসেবে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে। চেঁচাতে চেঁচাতে আল্‌ফা মায়ের গা জড়িয়ে ধরতে গেরিল্লারা গুণ্ডার মতো তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। কাঁদতে কাঁদতে সে তাদের পিছনে পিছনে ছুটলো। প্রায় এক'শ গজ দূরে গিয়ে গেরিল্লারা আল্‌ফার মা আর কাকাকে একটা বাড়ির দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করালে। আল্‌ফা দেখল, টমিগানগুলো গর্জন করে উঠলো আর তার মা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

লাশের গায়ে গেরিল্লারা এক টুকরো কাগজ পিন্ করে দিয়ে পাহাড়ে উধাও হয়ে গেল। কাগজে লেখা ছিল, 'নাৎসি গুপ্তচরের এই গতি।' নিচে স্বাক্ষর ছিল 'স্তেল্লো'।

এই নৃশংসতায় ছোট্ট গাঁটি শিউরে উঠলো। আর এই 'স্তেল্লো'টি কে তাকেও সমস্ত গাঁ চেনে। ত্রিশ বছরের কম্যুনিস্ট আউরেলিয়ো বুস্‌সি। গ্রামের লোক আরো জানতো, পাশের ছোট্ট শহরের ঐ বুস্‌সি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার পূর্বে প্রায় এক বছর ধরে—স্বামী যখন বিদেশে—সিন্নোরা জুবেল্লির প্রণয় কামনা করে নিরাশ হয়েছে। এবং সবচেয়ে ভালো করে গ্রামের লোক জানতো, সিন্নোরা জুবেল্লি বা তার দেওর কখনো জর্মনদের গুপ্তচরের কাজ করেনি—এসব অজ পাড়াগাঁয়ে একে অন্যের হাঁড়ির

খবর জানা থাকে। আসলে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যর্থ-প্রেমিক আউরেলিয়ো বুস্‌সির খুনিয়া প্রতিহিংসা।

কিন্তু তখন কোথায় আদালত, কিসের আইন? কে দেবে সাজা? ভ্রাতৃযুদ্ধ, গৃহবিবাদ চলে আপন 'আইনে'।

মায়ের মৃত্যুর পর আল্‌ফার আত্মীয়দের কাছে আল্‌ফা আশ্রয় পেল। মাসের পর মাস বেচারী কথা প্রায় বলেইনি। নির্জনে চোখের জল ফেলে ফেলে তার দিন কাটলো।

যুদ্ধ শেষ হল (১৯৪৫ এপ্রিল)। গেরিল্লারা নিজেদের নিজেরাই দেশের ত্রাণকর্তা বানিয়ে বিজয়োল্লাসে মত্ত হলেন। কে তখন শুধোয় যুদ্ধের সময় কে কোন্ অন্যায় কোন্ ন্যায় করেছে, কি না করেছে? হিটলারের ফেউ মুসোলিনি আর তার রক্ষিতা ক্লারা পেতাচ্চিকে গুলি করে মেরে মিলান শহরে এনে পায়ের গোড়ালিতে দড়ি বেঁধে ল্যাম্প-পাস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তাদের কেটে ফেলে নর্দমায় ফেলা হল। ইতালির লোক মৃতদেহ দুটোকে লাঞ্ছনা অবমাননার একশেষ করলে।

আল্‌ফা বড় হচ্ছে। দেখতে দেখতে সে খাঁটি ইটালিয়ান সুন্দরীর রূপ নিল। কিন্তু তবু সে রইল আগেরই মতো নির্জীব এবং প্রায়ই শোনা যেত রাত্রে ঘুমের ঘোরে বুক-ফাটা কান্নার সঙ্গে মাকে ডাকছে।

মনে হল এ মেয়ে জীবনে কখনো তার মায়ের নৃশংস অপঘাত মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছবি মনের পট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। এবং আরেকটা নাম সে কখনো তার স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না—আউরেলিয়ো বুস্‌সি—তার মাতৃহন্তা। বয়েস তার যতই বাড়তে লাগল, শান্ত বুদ্ধির বিকাশ হতে লাগল, ততই তার হৃদয় এবং মনে গভীর হতে গভীরতর রেখায় জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠতে লাগলো একটিমাত্র শব্দ: প্রতিহিংসা। এবং দিনের পর দিন প্ল্যান কষা—কি করে সে প্রতিহিংসা কার্যে পরিণত করে

মায়ের নির্মম নৃশংস পাপিষ্ঠ হত্যাকারীকে তার দাদ দিতে হয়।

তারপর কয়েক বৎসর গেল এবং মনে হল আল্‌ফা বুঝি ১৫ই জুলাই ১৯৪৪ সালের ঘটনার কথা শেষমেশ ভুলে গিয়েছে। তার সৌন্দর্য আরো বেড়ে গেল। সে তার সখীদের সঙ্গে নাচের মজলিসে যেতে আরম্ভ করলো। সেখানে এক ছোকরা কেরানী রিকো বাসাদন্নার সঙ্গে পরিচয় ও ক্রমে প্রণয় হল। ১৯৫৫ সালের মধু নিদাঘে তাদের বিয়ে হল। মনে হল, এবারে সব-কিছু ভালোর দিকেই যাবে—আর ভাবনার কারণ নেই। সুখী তরুণী সুন্দরী স্বামী-সোহাগিনী, আর্থিক সচ্ছলতা, সব-কিছুই। কিন্তু তার হৃদয়ের ভিতর কি চলছে সেটা কেউ দেখতে পেল না। তার মায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে সে কাউকে একটি মাত্র কথা বলতো না—এমন কি তার স্বামীকেও না। কিন্তু প্রতিহিংসার কঠোর, অলজ্ঘ্য আহ্বান তার হৃদয়ে প্রতিদিন তীব্রতর স্বরে ধ্বনিত হতে লাগল। পরে মনস্তত্ত্ববিদরা রায় দেন, এই আহ্বান আল্‌ফাকে ম্যানিয়াকে (বায়ুগ্রস্ত) পরিণত করে তুলেছিল, এবং এই প্রতিহিংসা-ম্যানিয়া তার স্ত্রীজনসুলভ তাবৎ হৃদয়বৃত্তিকে চাপা দিয়ে ফেলেছিল।

তারপর একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সব কিছু পালটে গেল—চরম ক্ষণ এসে আল্‌ফার জীবনের নূতন অধ্যায় খুলে দিল। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে আল্‌ফার স্বামী উত্তর ইতালীর কারখানা-কেন্দ্র তুরিন শহরের কাছে বদলি হল।

অদ্ভুত যোগাযোগ। একদিন দৈবাৎ আল্‌ফা খবরের কাগজে দেখে তার সেই সুপরিচিত জঘন্য নাম—আউরেলিয়ো বুস্‌সি।

সেই সেদিনকার গেরিল্লা নিকটবর্তী ছোট্ট শহর ক্লেভালকুরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে।

সিন্নোরা আল্‌ফার বয়স তখন একুশ বাইশ।

কেউ জানে না, আল্‌ফা যেদিন প্রথম খবরের কাগজে তার মাতৃহন্তার নাম দেখল তখন তার মনে কি চিন্তা উদয় হয়েছিল। পূর্বেও এ-বিষয় নিয়ে সে কখনো কারো সঙ্গে আলোচনা করেনি। আজও করলো না। বস্তুত ভবিষ্যতে যখন সমস্যা তার কঠিনতম রূপ নিয়ে চরম সময়ে পৌঁছল তখনো সে ঐ নিয়ে কারো সঙ্গে সামান্যতম আলোচনা করেনি।

শুধু তার স্বামী লক্ষ্য করলো, আল্‌ফা আবার গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

আল্‌ফা আবিষ্কার করেছিল তার মাতৃহন্তা আউরেলিয়ো বুস্‌সির নাম জানুয়ারি মাসে (১৯৫৬ খ্রীঃ)। এরপর মার্চ অবধি সে গম্ভীর।

মপাসাঁর নেকলেস গল্পে মাতিল্‌দ্‌ কী কঠোর পরিশ্রম করে হারানো নেকলেসের দাম তুলেছিল তার বর্ণনা আছে মাত্র কয়েকটি ছত্রে—দশ বছরের নিদারুণ খাটুনির নিখুঁত ছবি। মপাসাঁ যদি এই তিন মাসের কাহিনীটি লিখে যেতেন তবেই এর প্রতি সুবিচার হত। এ কাহিনীর রিপোর্টার কার্লরাও উত্তম রিপোর্টার; কিন্তু তিনি তো মপাসাঁ নন।

অবশেষে মার্চ মাসের (১৯৫৬) সন্ধ্যার দিকে নাটকের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হওয়ার লগ্ন এল।

আল্‌ফা তার স্বামীর পিস্তলটি দেরাজ থেকে বের করে ওভার-কোটের পকেটে পুরলো। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। বাস ধরে রওয়ানা দিলে ক্লেভালকুয়োরের দিকে—যেখানে বুস্‌সি মাত্র তিন মাস আগে ম্যুনিসিপাল চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। সামান্য কয়েক মাইলের রাস্তা।

অতি শান্ত, দৃঢ় পদক্ষেপে আল্‌ফা ম্যুনিসিপাল আফিসে গিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে। ঐ তো সে! যাকে সে বারো বছর ধরে খুঁজছে!

আর তার ভাবনা নেই।

আল্‌ফার হাত কাঁপেনি। পিস্তলটি পকেট থেকে বের করে ছটি গুলি চালিয়ে দিলে চেয়ারম্যান সাহেবের বুকের ভিতরে। আউরেলিয়ো বুস্‌সি তার পায়ের কাছে যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লেন।

কয়েক মিনিট পরেই আল্‌ফাকে দেখা গেল পাশের থানায়।

"আমাকে অনুগ্রহ করে গ্রেপ্তার করুন। আমি আউরেলিয়ো বুস্‌সিকে গুলি করে মেরেছি।"

এ ছাড়া পুলিস তার কাছ থেকে একটি বর্ণও বের করতে পারেনি। মাত্র ঐ কটি শব্দ।

উত্তেজনায় তার মুখ পাংশু বটে, কিন্তু চোখে তখনো জল এল না, যখন পুলিস তাকে হাতকড়ি পরিয়ে হাজতে নিয়ে গেল।

কয়েক সপ্তাহ পরেই ভেরচেল্লি শহরে আল্‌ফা জজদের সামনে দাঁড়িয়ে। চৌদ্দদিন ধরে মোকদ্দমা চলেছিল। সমস্ত ইতালী দেশ প্রচণ্ড আবেগ, রাগ দুঃখ বেদনার সঙ্গে এই মোকদ্দমার যেন আপন আপন ভাগ নিলে। সেই পুরনো রাজনৈতিক দলাদলি আবার নূতন করে দেখা দিলে। কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলির চেয়ে বড় হয়ে উঠলো, মানুষ আল্‌ফা জুবেল্লির দশ বছর বয়সের নিদারুণ অভিজ্ঞতা। তখন তার বয়েস দশ। আজ সে প্রতিশোধ নিয়েছে। সে শান্ত,—হাকিমদের দিকে নির্ভয়ে তাকায়।

পাছে না বুস্‌সিপক্ষ আল্‌ফাকে খুন করে, তাই পুলিস বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল।

মোকদ্দমা শেষ হল। 'কেস আল্‌ফা জুবেল্লি।'

কিন্তু এ কেস রাজনৈতিক দলাদলির মোকদ্দমা নয়। তার বহু বহু উর্ধ্বে। শিশু তার মায়ের খুনীর উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। এই সব কথা! এবং এই বহু কথা!

মনস্তত্ত্ববিদরা স্বাক্ষী-হিসেবে বললেন, মায়ের অপঘাত মৃত্যু

দেখে ঐ বয়েসের ছোট্ট মেয়ের মনে যে গভীর দাগ কাটে সেটা মোছবার মতো নয়। তার সমস্ত নার্ভস উল্টেপাল্টে গেছে। এমন কি শরীরের দিক দিয়েও তার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। মাতৃত্বের আনন্দ থেকেও সে বঞ্চিতা হয়ে গিয়েছে।

আদালত ঘরের অসহ্য উত্তেজনা ও প্রতীক্ষার ভিতর হাকিমরা রায় দিলেন—পাঁচ বছরের জেল, এবং তারপর এক বৎসর মনস্তত্ত্ব হাসপাতালে পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা।

সোজা পায়ে কঠিন কদমে আল্‌ফা দুই পুলিসের মাঝে আদালত পরিত্যাগ করলো। দুনিয়ার ভিড়ের উপর দিয়ে সে যেন তাকিয়ে আছে, দূরে, বহু দূরে। তার ছোট্ট গ্রাম সেই মন্তাল্বার দিকে—যেখানে সে দেখেছিল তার মা কি ভাবে টমিগানের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

তারপর পাঁচ বৎসর কাটালো আল্‌ফা উত্তর ইতালির এক জেলে। প্রতি সপ্তাহে—এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর—তার স্বামী তার সঙ্গে দেখা করার জন্য জেলে যেত। তার স্বামী রিকো বাসাদন্না প্রতিবারে এসে বন্ধুবান্ধবদের খবর দিত, আল্‌ফা শান্ত এবং সন্তুষ্ট। ভদ্রলোক অদ্ভুত একদারনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে যা সম্ভব তাই করে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি তুরিন শহরে বদলি হয়ে সেখানে নূতন বাসা বেঁধেছেন; প্রতি সপ্তাহে আল্‌ফাকে এই নূতন নীড়ের খবর দেন। আর কতদিন। আর বেশী দিন নয়। তোমার জন্য সব তৈরী। তুমি বেরিয়ে এলেই হল।

১৯৬১ সালের জুন মাসে আল্‌ফার জেলবাস খতম হল। কিন্তু তারপর তাকে যেতে হল দক্ষিণ ইতালীতে, হাসপাতালে, তুরিন থেকে প্রায় ১৮৮০ কিলোমীটার দূরে। সেখানে তার স্বামী প্রতি সপ্তাহে দেখতে যেতে পারে না। কিন্তু মাসে একবার করে যায়, শুধু তাকে বলবার জন্য যে সে তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে।

৮ই নবেম্বর ১৯৬১, আল্‌ফাকে হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত

ভাবে ডেকে পাঠালেন হাসপাতালের বড় ডাক্তার। অধ্যাপক জুলিয়ো ক্রেদা খবর দিলেন আল্‌ফার আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সাত মাস পূর্বেই সে খালাস। তার জিম্মাদার অধ্যাপক। সে যেন বাড়ি চলে যায়।

হাজার মাইল দূরে তুরিনে আল্‌ফার স্বামী রিকো বাসাদন্না বেতারে শুনলে তার স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত মুক্তি। কিন্তু বেচারী এই হাজার মাইল যায় কি করে। আল্‌ফা তো ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়বে।

হাসপাতাল থেকে সেই সন্ধ্যেয় যখন আল্‌ফা বেরলো তখন খবরের কাগজের রিপোর্টাররা তার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

"আমি আমার নিরপরাধ মায়ের অহেতুক মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তার প্রায়শ্চিত্তও (penanco) করেছি। আমি সন্তুষ্ট এবং মুক্ত। এখন আমি আমার স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। নূতন জীবন আরম্ভ করবো। অতীতের করাল ছায়া আমার মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

আমাকে দয়া করে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না।"

* * * *

বিশ্বাস করবেন না, খবরের রিপোর্টাররা এই গভীর মনোবেদনার বাণী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিল। তারা তাকে একটিমাত্র প্রশ্ন শুধোয়নি।

পরের দিন সকালবেলা ডাক-গাড়িতে করে সে তুরিনে পৌঁছল। প্ল্যাটফর্মে তার স্বামী আর ননদীর সহ্যের সীমা বুঝি পৌঁছে গেছে। স্বামী তাকে আলিঙ্গন করলে। আল্‌ফা যেন সে মুক্তির বন্ধন থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি নিতে চায় না।

* * * *

এরপর সংবাদদাতারাও বলছেন, "এই মুক্ত বাতাসের স্বাধীনতার মানবজীবনের একটি নিদারুণ ট্র্যাজেডি শেষ হল।"

তিনি প্রশ্ন শুধোচ্ছেন, "এইখানেই কি শেষ? পারবে কি আল্‌ফা নূতন করে জীবন পত্তন করতে? মস্তাম্বার করাল ছায়া কি তার স্মৃতিকে বিমূঢ় করবে না? ব্যবস্থা তো তার স্বামী সব তৈরী করে রেখেছে। কিন্তু

এমন কি ইতালীর খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত আল্‌ফা সম্বন্ধে কিছু লেখে না। তাকে চান্স দিতে চায়। যে মেয়ে তখনি শুধু শান্তি পেল যখন সে তার মাতৃহন্তাকে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে দেখলে।"

[কাহিনীটি বেরিয়েছে সুইস কাগজ ভেল্টভখেতে; আমি মোটামুটি অনুবাদ করেছি।]

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব—লাও ঝটপট—রাঙানো গোলাপী রাগে।
হায়রে মূর্খ! সোনা দিয়ে মাজা তোর কি শরীরখানা—?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে।

ওমরখৈয়াম

কর্নেল

যুদ্ধের পূর্বে লণ্ডনে অগুনতি ভারতীয় নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি করত। তাদের জন্য হোটেল, বোর্ডিং হৌস তো ছিলই, ডালরুটি, মাছ-ভাত খাওয়ার জন্য রেস্তোরাঁও ছিল প্রয়োজনের চেয়ে অধিক।

বাদবাকি সমস্ত কন্টিনেণ্টে ছিল মাত্র দুটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। প্যারিসের র‍্যু দ্য সমোরারের 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও বার্লিনের 'হিন্দুস্থান হৌস'।

লণ্ডন ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে উদাসীন কিন্তু বার্লিন ভারতীয়দের খাতির করত। তাই অর্থাভাব সত্ত্বেও 'হিন্দুস্থান হৌস' কায়ক্লেশে যুদ্ধ লাগা পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে 'হিন্দুস্থান হৌস' নাৎসি আন্দোলনের চেয়েও প্রাচীন কারণ ১৯২৯-এ হৌসের যখন পত্তন হয় তখনো হিটলার বার্লিনে কল্কে পাননি।

সেই 'হিন্দুস্থান হৌসে'র এক কোণে বাঙালীদের একটা আড্ডা বসত। সে-আড্ডার ভাষাবিদ সূয্যি রায়, লেডি-কিলার পুলিন সরকার, বেটোফেনজ্ঞ মদনমোহন গোস্বামী বার্লিন সমাজের অশোক-স্তম্ভ কুতুব মিনার হয়ে বিরাজ করতেন। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা। 'হিন্দুস্থান হৌসে'র ভিতরে বাহিরে তার প্রতিপত্তি কতটা তা নিয়ে আমরা কখনো আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করিনি কারণ চাচা ছিলেন বয়সে সকলের চেয়ে বড়, দানে খয়রাতে হাতিম-তাই আর সলা-পরামর্শে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

এঁদের সকলকেই লুফে নেবার জন্য বার্লিনের বিস্তর ড্রইং-রুম খোলা থাকা সত্ত্বেও এঁরা সুবিধে পেলেই 'হিন্দুস্থান হৌসে' এসে আড্ডা জমাতেন। এ-স্বভাবটাকে বাঙালীর দোষ এবং গুণ দুই বলা যেতে পারে।

আড্ডা জমেছে। সূয্যি রায় চুক্‌চুক্‌ করে বিয়ার খাচ্ছেন। লেডি-কিলার পুলিন সরকার চেস্টনাট্‌ ব্রাউন আর ব্রুনেট্‌ চুলের তফাতটা ঠিক কোন্‌ জায়গায় তাই নিয়ে একখানা থিসিস ছাড়ছে, চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চোখ বন্ধ করে আপন ভাবনা ভেবে যাচ্ছেন এমন সময় আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া সদস্য, রায়ের 'প্রতেজে' বা 'দেশের ছেলে', গ্রাম-সম্পর্কে ভাগ্নে গোলাম মৌলা এসে তার মামার পাশে বসল। তার চোখে মুখে অদ্ভুত বিহ্বলতা—লাস্ট ট্রেন মিস্‌ করলে কয়েক মিনিটের তরে মানুষ যে-ভাব নিয়ে বোকার মত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকটা সেই রকম।

রায় শুধালেন, 'কি রে, কি হয়েছে? প্রেমে পড়েছিস?'

গোলাম মৌলা বড্ড লাজুক ছেলে। বয়স সতর হয় কি না হয়, বাপ কট্টর খেলাফতি, ছেলেকে কি দেশে কি বিলেতে ইংরেজের আওতায় আসতে দেবেন না বলে সেই অল্প বয়সেই বার্লিন পাঠিয়েছেন। 'সূয্যিমামা' না থাকলে সে বহুকাল আগেই বার্লিন ছেড়ে পালাত। কথা কয় কম, আর বড়দের ফাইফরমাশ করে দেয় অনুরোধ বা আদেশ করার আগেই।

বললে, 'আমার ল্যাণ্ডলেডি আর তার মেয়েতে কি ঝগড়াটাই না লেগেছে যদি দেখতেন। মা নাচে যাচ্ছে, কিছুতেই মেয়েকে নিয়ে যাবে না। মেয়ে বলছে যাবেই।'

রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মায়ের বয়স কত রে!'

'চল্লিশ হয়নি বোধহয়।'

'মেয়ের?'

'আঠারো হবে।'

রায় বললেন, 'তাই বল্‌। এতে তোর এত বেকুব বনার কি আছে রে? মা মেয়ে যদি একসঙ্গে নাচে যায় তবে মায়ের বয়স ভাঁড়াতে অসুবিধা হবে না?'

মৌলা বললে, 'কি ঘেন্না। মেয়েটাও দেমাক করে বলছিল, সে থাকলে নাকি মায়ের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। আমি ভাবলুম, রাগের মাথায় বলছে, কিন্তু কী ঘেন্না। মায়ে মেয়ে এই নিয়ে লড়াই!' মৌলার বিহ্বলতা কেটে গিয়েছে আর তার জায়গায় দেখা দিয়েছে তেতো তেতো ভাব।

আড্ডা তর্কাতর্কির বিষয় পেয়ে যেন রথের নারকোলের উপর লাফিয়ে পড়ল। একদল বলে, বাচ্চার জন্য মায়ের ভালোবাসা অনুন্নত সমাজেই পাওয়া যায় বেশী, অন্য দল বলে ভারতের একান্ন পরিবার সভ্যতার পরাকাষ্ঠা আর একান্ন পরিবার খাড়া আছে মা-জননীদের দয়ামায়ার উপর। লেডি-কিলার সরকারকে জর্মনরা বলত 'Schuerzenjaeger' অর্থাৎ 'এপ্রন-শিকারী', কাজেই সে যে মা মেয়ে সকলের পক্ষ নিয়ে লড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি, আর গোঁসাই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের মা যশোদার কাছে মা-মেরির মাদন্নারূপ নিতান্ত পানসে।

রায় তর্কে যোগ দেননি। কথা-কাটাকাটি কমলে পরে বললেন, 'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? হবে হবে, কলকাতা বোম্বাই সর্বত্রই আস্তে আস্তে মায়ে মেয়ে রেষারেষি আরম্ভ হবে।'

তখন চাচা চোখ মেললেন। বললেন, 'সে কি হে রায় সাহেব? তুমিও একথা বললে? তার চেয়ে কথাটা পাল্টে দিয়ে বলো না কেন, জর্মনিতেও একদিন আর এ-লড়াই থাকবে না। এখনকার অবস্থা তো আর স্বাভাবিক নয়। বেশীর ভাগ ল্যাণ্ডলেডিই বিধবা, আর যাদের বয়স ষোলর উপরে তারাই বা বর জোটাবে কোথেকে? আরো বহুদিন ধরে চলবে কুরুক্ষেত্রের শত বিধবার রোদন। ১৪—১৮টা কুরুক্ষেত্রের চেয়ে কম কোন্ হিসেবে?'

গোঁসাই বললেন, 'কিন্তু—'

চাচা বললেন, 'তবে শোনো।'

'কর্নেল ডুটেন্‌হফারের বাড়ি ছাড়ার বৎসর খানেক পরে হঠাৎ আমাকে টাকাপয়সা বাবদে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। তখনকার দিনে বার্লিনে পয়সা কামানো আজকের চেয়েও অনেক বেশি শক্ত ছিল। মনে মনে যখন ভাবছি ধন্নাটা কোন্ চাকরী নিয়ে শুরু করব, অর্থাৎ ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুটে অনুবাদকের, খবরের কাগজে কলামনিস্টের, না ইংরিজি ভাষার প্রাইভেট ট্যুটরের এমন সময়ে ফ্রালাইন ক্লারা ফন্ ব্রাখেলের সঙ্গে দেখা। আমি একটা অত্যন্ত নচ্ছার রেস্তোরাঁ থেকে বেরুচ্ছি, তিনি তাঁর মের্ৎসেডেজ্ হাঁকিয়ে যাচ্ছেন। গাড়িতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লাইনার ইডিয়ট, কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছ নাকি, এরকম প্রলেতারিয়া রেস্তোরাঁয় লবাব-পুত্তুর কি ভেবে?'

তোমরা জানো, আমাকে 'ক্লাইনার ইডিয়ট' অর্থাৎ 'হাবাগঙ্গা-রাম' বলার অধিকার ক্লারার আছে।'

আড্ডা ঘাড় নাড়িয়ে যা জানাতে চাইল তার অনুবাদ এককথায়, —'বিলক্ষণ।'

চাচা বললেন, 'ততদিনে আমার জর্মন শেখা হয়ে গিয়েছে। উত্তর দিলুম ডাকসাঁইটে কবিতায়,

> 'কাইনেন্ ট্রোপ্‌ফ্‌ষেন্ ইন্ বেষার্ মের্,
> উন্‌ট্ ডাস্ বয়টেল্ শ্লাপ্ উন্‌ট্ লের্॥
>
> গেলাসেতে নেই এক ফোঁটা মাল আর।
> ট্যাঁক ফাঁকা মাঠ, বেবাক পরিষ্কার।'

ক্লারা বললেন, 'পয়সা যদি কামাতে চাও তবে তার বন্দোবস্ত আমি করে দিতে পারি। আমার পরিচিত এক 'হঠাৎ-নবাবের' ছেলের যক্ষ্মা হয়েছে। একজন সঙ্গীর দরকার। খাওয়া থাকা তো পাবেই, মাইনেও দেবে ভালো। ওরা থাকে রাইন-ল্যাণ্ডে। বার্লিনের তুলনায় গরমে সাহারা।'

আমি রাজী হলুম। দু'দিন বাদ টেলিফোনে চাকরি হয়ে গেল। হানোফার হয়ে কলন পৌঁছলুম।'

মৌলা শুধাল, 'যেখান থেকে 'ও দ্য কলন' আসে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দাম এখানে যা, কলনেও তা। তারপর কলনে গাড়ি বদল করে বন্, বন্ থেকে গোডেসবের্গ্। রাইন নদীর পারে। স্টেশনের চেহারাটা দেখেই জানটা তর্ হয়ে গেল। ভারী ঘরোয়া ঘরোয়া ভাব। ছোট্ট শহরখানির সঙ্গে জড়িয়ে মড়িয়ে এক হয়ে আছে। গাছপালায় ভর্তি—বার্লিনের তুলনায় সোঁদর বন।

'হঠাৎ-নবাবই' বটে। না হলে জর্মনির আপন খাসা মের্সেডেজ্ থাকতে রোল্স্ কিনবে কেন? ড্রাইভার ব্যাটাও উর্দি পরেছে মানওয়ারি জাহাজের এ্যাডমিরালের।

কিন্তু কর্তা-গিন্নীকে দেখে বড় ভালো লাগল। 'হঠাৎ-নবাব' হোক আর যাই হোক আমাকে এগিয়ে নেবার জন্য দেখি দেউড়ির কাছে লনে বসে আছেন। খাতির যত্নটা যা করলেন, আমি যেন কাইজারের বড় ব্যাটা। দু'জনাই ইয়া লাশ—কর্তা বিয়ার খেয়ে খেয়ে, গিন্নী হুইপ্ট্ ক্রীম গিলে গিলে। কর্তার মাথায় বিপর্যয় টাক আর গিন্নীর পা দু'খানা ফাইলেরিয়ার মতো ফুলে গিয়ে আগাগোড়া কোলবালিশের মতো একাকার। দু'জনেই কথায় কথায় মুচকি হাসেন—ছোট্ট মুখ দু'খানা তখন চতুর্দিকে গাদা গাদা মাংসের সঙ্গে যেন হাতাহাতি করে কোনোগতিকে আত্মপ্রকাশ করে, এবং সে এতই কম যে তার ভিতর দিয়ে দাঁতের দর্শন মেলে না।

জিরিয়ে জুরিয়ে নেওয়ার পর আমি বললুম, 'এইবার চলুন, আপনাদের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাক।' তখন কর্তা গিন্নীকে ঠেলেন, গিন্নী কর্তাকে। বুঝতে পারলুম ছেলের অসুখে তাঁরা এতই বিহ্বল হয়ে গিয়েছেন যে সামান্যতম কর্তব্যের সামনে

দু'জনেই ঘাবড়ে যান—পাছে কোনো ভুল হয়ে যায়, পাছে তাতে করে ছেলের রোগ বেড়ে যায়।

যদি জানা না থাকত যে যক্ষ্মায় ভুগছে তাহলে আমি কার্লকে ওলিম্পিকের জন্য তৈরী হতে উপদেশ দিতুম। কী সুন্দর সুগঠিত দেহ—যেন গ্রীক ভাস্কর শাস্ত্র মিলিয়ে মেপেজুপে প্রত্যেকটি অঙ্গ নির্মাণ করেছেন, কোনো জায়গায় এতটুকু খুঁত ধরা পড়ে না আর সানবাথ নিয়ে নিয়ে গায়ের রঙটি আমাদের দেশের হেমন্তের পাকাধানের রঙ ধরেছে, চোখ দুটি আমাদেরি শরতের আকাশের মতো গভীর আসমানি।

ঘরে আরেকটি প্রাণী উপস্থিত ছিল, নিতান্ত সাদামাটা চেহারা, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী—রোগীর নার্স। গিন্নী আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদেরি শহর স্টুটগার্টের মেয়ে, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কার্লের সেবার ভাবনা আমাদের এতটুকুও ভাবতে হয় না। আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

'একে নিয়েই আমার অভিজ্ঞতা।'

লেডি-কিলার সরকার বলল, 'কিন্তু বললেন যে নিতান্ত সাদামাটা।'

রায় বললেন, 'চোপ।'

চাচা কোনো কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'অভিজ্ঞতাটা এমনি মর্মন্তুদ যে সেটা আমি চটপট বলে ফেলি। এ জিনিস ফেনিয়ে বলার নয়।

মেয়েটির নাম সিবিলা। প্রথম দর্শনে নার্সদের কায়দামাফিক গম্ভীর সরকারী চেহারা নিয়ে টেম্পারেচারের চার্টের দিকে এমনি ভাবে তাকিয়েছিল যেন চার্টখানা হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে যাবার চেষ্টা করলে সে সেটাকে খপ করে ধরে ফেলবে। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই টের পেলুম, সে কার্লকে যত না নিখুঁত সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তার চেয়ে ঢের বেশী প্রাণরস যোগাচ্ছে হাসিখুশী,

গালগল্প দিয়ে। সাদামাটা চেহারা—কিন্তু সেটা যতক্ষণ সে অন্যের প্রতি উদাসীন ততক্ষণই—একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে চোখমুখ যেন নাচতে থাকে, ড্যাবডেবে পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যে-রকম ধারা হয়। কারো কথা শোনার সময়ও এমন ভাবে তাকায়, মনে হয় যেন চোখ দিয়ে কথা গিলছে। তার উপর গানের ফোয়ারা তার ছিল অন্তহীন;—গ্যোটে, হাইনে, ম্যোরিকে, ক্ল্যকের্টের কথা, বেটোফেন, ব্রামস, শুমান, মেণ্ডেলজোনের সুর দিয়ে গড়া যে-সব গান সে কখনো কার্লের জন্য চেঁচিয়ে, কখনো আপন মনে গুনগুনিয়ে গেয়েছে তার অর্ধেক ভাণ্ডারও আমি অন্য কোনো এমেচারের গলায় শুনিনি।

কিন্তু কয়েক দিনের ভিতরেই লক্ষ্য করলুম, কথা বলার মাঝখানে সিবিলা আচমকা কেমন ধারা আনমনা হয়ে যায়, খানার টেবিলে হঠাৎ ছুরি কাঁটা রেখে দিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, আর প্রায়ই দেখি অবসর সময়ে রাইনের পারে একা একা বসে ভাবছে। দু-একবার নিতান্ত পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছি—সিবিলা কিন্তু দেখতে পায়নি। ভাবলুম নিশ্চয় প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কখন, আর কার সঙ্গে?

এমন সময় একদিন গিন্নী আমায় খাঁটি খবরটা দিলেন। ভদ্র-মহিলা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়েই আমাকে সব কিছু বললেন, কারণ তাঁর স্বামী কার্লের অসুখের ব্যাপারে এমনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে গিন্নী খবরটা তাঁর কাছে ভাঙতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

সিবিলা অন্তঃসত্ত্বা এবং অবিবাহিতা। পাঁচমাস। আর বেশী দিন চলবে না। পাড়ায় কেলেঙ্কারি রটে যাবে।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়নি। আমি গিন্নীকে বললুম, 'সিবিলা চলে গেলেই পারে।'

গিন্নী বললেন, 'যাবে কোথায়, খাবে কি? এ-অবস্থায় চাকরী তো অসম্ভব, মাঝখান থেকে নার্সের সার্টিফিকেটটি যাবে।'

আমি বললুম, 'তা হলে কর্তাকে না জানিয়ে উপায় নেই।'

গিন্নীর আন্দাজ ভুল; কর্তা খবরটা শুনে দু'হাত দিয়ে মাথার চুল ছেঁড়েননি, রেগেমেগে চেল্লাচেল্লিও করেননি। প্রথম ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন, 'সিবিলার সঙ্গে খোলাখুলি কথা-বার্তা না বলে উপায় নেই। কিন্তু আমি মনিব, সে কর্মচারী এবং ব্যাপারটা সঙ্গিন। আপনার মতো কেউ যদি মধ্যস্থ থাকে তবে বড় উপকার হয়। অথচ জিনিসটা আপনার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হবে বলে আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস পাচ্ছি না।'

আমি রাজী হলুম।

সিবিলা টেবিলের উপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদল। কর্তা গিন্নী দু'জনই খাঁটি লোক, সিবিলাকে এ বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার করা যায় তার উপায় অনুসন্ধান করলেন অনেক, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হল না। তার কারণটাও আমি বুঝতে পারলুম। এদিকে বিচক্ষণ সংসারী লোক পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মাথায় কাবুতে আনার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে গ্যোটে-হাইনের স্নেহ-প্রেমের কবিতায় ভরা, অনুভূতির ভাপে-ঠাসা জালে-পড়া সবৎসা সচকিতা হরিণী। ইনি বলছেন 'পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জাল ছেঁড়ো'; ও বলছে 'ছোঁড়াছুঁড়ি করলে বাচ্চা হয়তো জখম হবে।'—ইনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'বাচ্চার বাপ কে?' ও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বোঝাচ্ছে, 'তাতে কোনো লাভ নেই, সে বিবাহিত ও অত্যন্ত গরীব।'

বুঝলুম, সিবিলার মনস্থির, সে মা হবেই।

কেঁদে কেঁদে টেবিলের একটা দিক ভিজিয়ে ফেলেছে।'

চাচা স্পর্শকাতর বাঙালী, কাজেই তাঁর গলায় বেদনার আভাস পেয়ে আড্ডার কেউই আশ্চর্য হল না।

চাচা বললেন, 'দেশে আমার বোন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বাড়ি ফিরেছে। মা খুশী, বাবা খুশী। দু'দিন আগে নির্মম ভাবে যে-বোনের চুল ছিঁড়েছি তার জন্যে তখন কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা

ছপুর পাড়া চষি। তার শরীরের বিশেষ যত্ন নেওয়ার কথা উঠলে সে মিষ্টি হাসে—কি রকম লজ্জা, খুশী আর গর্বে মেশানো। ছোট বোনরা কাঁথা সেলাই করে, আর বাবার বন্ধু বুড়ো কবরেজ মশায় ছ'বেলা গলা খাঁকারি দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন।

আর এ-মেয়েও তো মা হবে।

থাক সে-সব কথা। শেষটায় স্থির হল যে কিছুই স্থির করবার উপায় নেই। উপস্থিত সিবিলা কাজ করে যাক, যখন নিতান্তই অচল হয়ে পড়বে তখন তাকে নার্সিঙ-হোমে পাঠানো হবে। আমি পরে কর্তাকে বললুম, 'কিন্তু বাচ্চাটার কি গতি হবে সে কথাটা তো কিছু ভাবলেন না।' কর্তা বললেন, 'এখন ভেবে কোনো লাভ নেই। বিপদআপদ কাটুক, তখন বাচ্চার প্রতি সিবিলার কি মনোভাব সেইটে দেখে ব্যবস্থা করা যাবে।'

প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিবিলা কাজ করেছিল। কিন্তু শেষের দিকে তার গান-গাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার বোন এমনিতে গান গাইত না। সে শেষের দিকে গুন্‌গুন্‌ করতে আরম্ভ করেছিল!

বাচ্চা হল। আহা, যেন একমুঠো জুঁই ফুল।

কিন্তু তখন আরম্ভ হল আসল বিপদ। বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে দিতে সিবিলা কিছুতেই রাজী হয় না। বলে, কোনো পরিবারে যেন সে আশ্রয় পায়। কিন্তু এরকম পরিবার পাওয়া যায় কোথায়? অনুসন্ধান করলে যে পাওয়া একেবারে অসম্ভব তা নয় কিন্তু জর্মনির সে ছুদিনে, ইনফ্লেশনের গরমিতে মানুষের বাৎসল্যরস শুকিয়ে গিয়েছে—আর তার চেয়েও বড় কথা, অতটা সময় আমাদের হাতে কই।

রোজ হয় ফোন, নয় চিঠি। নার্সিঙ-হোম বলে সিবিলাকে নিয়ে যাও। এখানে বেড দখল করে সে শুধু আসন্নপ্রসবাদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

এদিকে কর্তা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, পয়সা দিয়ে এজেন্সির লোককে লাগানো, আপন বন্ধুবান্ধবদের কাছে অনুসন্ধান কিছুই বাদ দেননি। আমাকে পর্যন্ত দু'তিনবার কলন, ড্যুসেলডর্ফ হয়ে আসতে হল। নার্সিঙ-হোমের তাড়া খেয়ে কর্তার ভুঁড়ি গিরে আষ্টেক কমে গেল। কী মুশকিল!

সব কিছু জানতে পেয়ে তখন সিবিলাই এক আজব প্যাঁচ খেলে আমাদের দম ফেলার ফুর্সৎ করে দিল। নার্স তো বটে, এমনি এক বিদঘুটে ব্যামোর খাসা ভান করলে যে পাঠশালার মিটমিটে শয়তান আর হলিউডের ভ্যাম্পে মিললেও ফল এর চেয়ে ভালো ওতরাতো না। ক্নুট হামসুন বলেছেন, 'প্রেমে পড়লে বোকা বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে, বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়।' সিবিলার মতো ভিতরে বাইরে সাদামাটা মেয়ে বাচ্চার মঙ্গলের জন্য ফন্দিবাজ হয়ে উঠলো।

এমন সময় কর্তা—কারবারে যাকে বলে ভালো 'পার্টি'র খবর পেলেন। অগাধ পয়সা, সমাজে উঁচু, শিক্ষিত পরিবার কিন্তু আমাদের এজেন্ট বলল 'পার্টি'—অর্থাৎ ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী—কড়া শর্ত দিয়েছেন যে সিবিলা এবং আমাদের অন্য কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পাবে না, এবং কথা দিতে হবে যে জানবার চেষ্টা করবে না যে কারা সিবিলার বাচ্চাকে গ্রহণ করলেন। এ শর্ত কিছু নূতন নয়, কারণ কল্পনা করা কিছু অসঙ্গত নয় যে সিবিলা যদি একদিন হঠাৎ তার বাচ্চাকে ফেরত চেয়ে বসে তখন নানা বিপত্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর কিছু না হোক বাচ্চাটা যদি জানতে পেরে যায় তার আসল মা কে তা হলেই তো উৎকট সঙ্কট।

কর্তার মতো ব্যবসায়ের পাঁজে পোড়-খাওয়া ঝামাও এ-প্রস্তাব নিয়ে নার্সিঙ-হোমে যাননি। সব কিছু চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন। দু'দিন পরে উত্তর এল, সিবিলা রাজী।

মনস্থির করতে সিবিলার দু'দিন লেগেছিল। সে আটচল্লিশ ঘণ্টা তার কি করে কেটেছিল, জানি না। বাড়িতে আমরা তিনজন নিঃশব্দে লাঞ্চ-ডিনার খেয়েছি, একে অন্যে চোখাচোখি হলেই একসঙ্গে সিবিলার দ্বিতীয় প্রসব-বেদনার কথা ভেবেছি। আইন মানুষকে এক পাপের জন্য সাজা দেয় একবার, সমাজ কতবার, কত বৎসর ধরে দেয় তার সন্ধান কোনো কেতাবে লেখা নেই, কোনো বৃহস্পতিও জানেন না।

ট্রাঙ্ককলে সব বন্দোবস্ত পাকাপাকি করা হল। কর্তা সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবেন। 'পার্টি'র ওয়েট নার্স (ধাই) বাচ্চার জন্য ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করবে। সিবিলা স্টুটগার্টের ট্রেন ধরলে পর কর্তা বাচ্চাটিকে সেই ধাইয়ের হাতে সঁপে দেবেন। 'পার্টি' কড়াক্কড় জানিয়েছেন, সিবিলা যেন ওয়েট নার্সকেও না দেখতে পায়।

যে দিন সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবার কথা সে-দিন দুপুর বেলা কার্লের গলা দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠল। ছ'মাস ধরে টেম্পারেচর, স্প্যুটাম কাবুতে এসে গিয়েছিল, এ-পি বন্ধ ছিল, তারপর হঠাৎ সাদা দাঁতের উপর কাঁচা রক্তের নিষ্ঠুর ঝিলিমিলি। আমরা তিনজনাই সামনে ছিলাম। কর্তারই কি একটা রসিকতায় হাসতে গিয়ে ব্যাপারটা ঘটল। ছেলের মন ভালো রাখবার জন্য ভদ্রলোক অনেক ভেবে চিন্তে রসিকতাখানা তৈরী করেছিলেন। অবস্থাটা বোঝো। আমি তাঁকে হাত ধরে নিজের ঘরে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করতে ছুটলুম।

আমাকে কর্তা গিন্নী এতদিন ধরে যে আদর আপ্যায়ন করেছেন তার বদলে যদি সে-সন্ধ্যায় আমি কর্তার বদলে সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে না যেতুম তা হলে নিছক নিমক-হারামি হত। হার্ট নিয়ে কর্তা আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন। আমি নাসিঙ-হোম যাচ্ছি শুনে আমার হাতে সিবিলার ছ'মাসের জমানো মাইনে দিলেন। গিন্নী

নিজের থেকে আরো কিছু, আর আপন হাতে বোনা বাচ্চার জন্য একজোড়া মোজা দিলেন।

গোডেসবের্গ ছোট শহর। কিন্তু নার্সিঙ-হোম থেকে স্টেশন যেতে হলে দুটি বড় রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হয়। আমি স্টিয়ারিঙে, সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে পিছনে। ইচ্ছে করেই ড্রাইভারকে সঙ্গে নিইনি, এবং ট্রেনটাও বাছা হয়েছে রাত্রের, যাতে করে খামকা বেশী জানাজানি না হয়। তার মাইনে তাকে দিয়েছি; মোজার মোড়ক যখন সে খুলল তখন আমি সে দিকে তাকাইনি।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি—ঝাঁকুনিতে কাঁচা বাচ্চার অনিষ্ট হয় কি না হয় তা তো জানি নে। থেকে থেকে সিবিলা আমার কাঁধের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি ঠিক জানেন যাঁদের বাড়িতে আমার বুবি যাচ্ছে তাঁরা ভালো লোক?' আমি আমার সাধ্যমত তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি আর ভাবছি কর্তা এলেই ভালো হত। তিনি সমস্ত জিনিসটা নিশ্চয়ই আরো গুছিয়ে করতে পারতেন।

সিবিলা একই প্রশ্ন বারে বারে শুধায়, তাঁরা লোক ভালো তো? আমি ভাবছি যদি শুধায় তাঁরা ভালো আমি কি করে জানলুম তা হলেই তো গেছি। আমার কেন কর্তারও তো সে-সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। কিন্তু যখন সিবিলা সে প্রশ্ন একবারও শুধালো না তখন বুঝতে পারলুম তার কাছে অজানার অন্ধকার আধা-আলোর দ্বন্দ্বের চেয়ে অনেক বেশী কাম্য হয়ে উঠেছে। জেরা করলে যদি ধরা পড়ে যায়—যদি ধরা পড়ে যায় যে আমার উত্তরে রয়েছে শুধু ফাঁকি? তখন? তখন সে মুখ ফেরাবে কোন্ দিকে, কোথায় তার সান্ত্বনা?

সিবিলা বলল, 'গাড়ি থামান একটু দয়া করে। ঐ তো খেলনার দোকান। আমার বুবির তো কোনো খেলনা নেই।' তাইতো,

কর্তা, আমি দু'জনেই এদিকে একদম খেয়াল করিনি। কিন্তু এক মাসের শিশু কি খেলনা বোঝে?

এক গাদা খেলনা নিয়ে সিবিলা গাড়িতে ঢুকল।

দশ পা যেতে না যেতেই সিবিলা বলল, 'ঐ তো জামা কাপড়ের দোকান। বুবির তো ভালো জামা নেই। গাড়ি থামান।' থামালুম। এবার বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে সে দোকানে ঢুকলো, জিনিস বয়ে আনতে অসুবিধে হতে পারে ভেবে আমিও সঙ্গে গেলুম।

দোকানি যেটা দেখায় সেটাই কেনে। কোনো বাছবিচার না, দাম জিজ্ঞেস করা না। দোকানি পর্যন্ত কেনার বহর দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'বুবির এখন বাড়ন্ত বয়স, জামাগুলো দু'দিনেই ছোট হয়ে যাবে না?'

বলে করলুম পাপ। সিবিলা বলল, 'ঠিক তো', আর কিনতে আরম্ভ করল সব সাইজের জামা, পাতলুন, মোজা, টুপি। আমি হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষটায় বললুম, 'ফ্রলাইন সিবিলা, ট্রেনের বেশী দেরী নেই।' সিবিলা বলল, 'চলুন।'

আরো দশ পা। সিবিলা হুকুম করল, 'থামান।'

এবারে কি কিনল ভগবানই জানেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দোকানপাট একটা একটা করে বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে। সিবিলা বলে, 'থামান,' সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গাড়ি থেকে নেবে পড়ে আর ছুটে গিয়ে দোকানিকে দরজা বন্ধ করতে বারণ করে। যে-দোকান দেখে বন্ধ হচ্ছে, ছুটে যায় সে-দোকানেরই দিকে। ছুটোছুটিতে চুল এলোথেলো হয়ে গিয়েছে, পাগলিনীর মত এদিক ওদিক তাকায়—সে একাই লড়বে সব দোকানির সঙ্গে। কেন? একদিনের তরে তারা দোকানগুলো দু'মিনিট বেশী খোলা রাখতে পারে না? আমি বার বার অনুনয় করছি, 'ফ্রলাইন সিবিলা, বিট্টে বিট্টে, প্লীজ, প্লীজ, জায়েন জী ফেরমুনফ্‌টিষ, একি করেছেন? গাড়ি ধরব কি করে?'

সিবিলা কোনো কথায় কান দেয় না। আমার মাথায় কুবুদ্ধি চাপল, ভাবলুম একটু জোরজার করি। বললুম এত সব জিনিসের কি প্রয়োজন?

চকিতের জন্য সিবিলা বাঘিনীর ন্যায় রুখে দাঁড়াল। হুঙ্কার দিয়ে 'কী?' বলেই থেমে গেল। তারপর হঠাৎ ঝরঝর করে চোখের জল বেরিয়ে এল।'

চাচা বলেন, 'আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। খোদার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলুম সিবিলার পরীক্ষা সহজ করে দেবার জন্য।'

তারপর আমি বাধা দিইনি। যায় যাক্ দুনিয়ার বেবাক ট্রেন মিস্ হয়ে। বিশ্বসংসার যদি তার জন্য আটকা পড়ে যায় তবে পড়ুক। আমি বাধা দেব না।

বোধ হয় টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। সিবিলা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কাছে আমার আর কোনো পাওনা আছে?' আমি বললুম, 'না, কিন্তু আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি দিতে পারি।' বলল, 'পাঁচটা মার্ক দিন, একখানা আ-বে-ৎসের বই কিনব।'

এক মাসের শিশু বই পড়বে!

গাড়ির পিছনটা জিনিসে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে আমার পাশে বসল। তার হাতের বেলুন উড়ে এসে আমার স্টিয়ারিঙে বাধা দিচ্ছে। সিবিলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

স্টেশনে যখন পৌঁছলুম তখন গাড়ি আসতে কয়েক মিনিট বাকি। গোডেসবের্গ ছোট স্টেশন, ডাকগাড়ি দু'মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। আমি বাচ্চাটাকে নেবার জন্য হাত বাড়ালুম, কোনো কথা না বলে। সিবিলা বলল, 'প্ল্যাটফর্মে চলুন, গাড়ি ছাড়লে পর—'। আমি কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললুম।

পোর্টারই দেখিয়ে দিল কোন জায়গায় দাঁড়ালে সেকেণ্ড ক্লাস ঠিক সামনে পড়বে। আমি সিবিলাকে আরো পঞ্চাশটি মার্ক দিলুম।

সিবিলা সিগনেলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের অন্ধকারের মাঝখানে তার দৃষ্টি ডুবে গিয়েছে। তার কোলে বুবি। ভগবানের জুঁই একরাতেই শুকিয়ে যায়, সিবিলার জুঁই যেন অক্ষয় জীবনের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুমুচ্ছে।

সিবিলা আমার হাতে বাচ্চাকে তুলে দিল। এক মুহূর্তের তরে সব কিছু ভুলে গিয়ে বলল, 'আপনি তো বেশ বাচ্চা কোলে নিতে জানেন; আমাদের পুরুষরা তো পারে না।'

আমি আরাম বোধ করলুম। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পোর্টার সিবিলার স্যুটকেশ তুলে দিয়েছে।

হঠাৎ সিবিলা সেই পাথরের প্ল্যাটফর্মে হাঁটুগেড়ে আমার দু' হাঁটু জড়িয়ে হাহা করে কেঁদে উঠল। সে কান্নায় জল নেই, বাষ্প নেই। বিকৃত কণ্ঠে বলল—

'আমায় কথা দিন, ঈশ্বরের শপথ, কথা দিন আপনি বুবির খবর নেবেন সে ভালো আছে কি না। মা মেরির শপথ,—না, না, মা মেরির না—আপনার মায়ের শপথ, কথা দিন।'

আমি আমার মায়ের নামে শপথ করলুম। 'পার্টি' যা বলে বলুক, যা করে করুক।

পোর্টার হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। সিবিলাকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিল।

গাড়ির গায়ে চলার পূর্বের কাঁপন লেগেছে। এমন সময় আমার আর সিবিলার কাম্‌রার মাঝখান দিয়ে একটি মহিলা ধীরে সুস্থে ছোট্ট একটি ছেলের হাত ধরে ধরে চলে গেলেন। সিবিলা দোরে দাঁড়িয়েছিল, তাদের লক্ষ্য করল কি না বলতে পারি নে, হঠাৎ দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।

আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

আমি বাধা দিলুম না।'

নবাব-জাদী

'বিশ্বাস!'

'জী, হুজুর?'

'কি হবে?'

'কী আর হবে।'

ছ বছর বয়স থেকে এই নবাব-বাড়ি দেখে আসছি। সকালবেলা বাবার হাত ধরে বেড়াতে বেরতুম, নবাব-বাড়ির পুব দিক দিয়ে। বিরাট পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতুম কী স্বচ্ছ, কাক-চক্ষু জল। এদেশে পুকুরমাত্রই পানা-ভরা, কিন্তু এ-পুকুরে কোথাও এতটুকুমাত্র কোনো ভেসে-যাওয়া শুকনো পাতার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আর দেখতুম ঐ দূরে, ওপারে, কারা যেন শানবাঁধানো ঘাটে নাইছে, কথাবার্তা বলছে নিশ্চয়ই কিন্তু এপারে কোনো শব্দ আসছে না। আর পাড়ে পাড়ে অসংখ্য জারুল গাছ সর্বাঙ্গ বেগনি ফুল পরে নিয়ে দুলছে।

সবসুদ্ধ সাতটা পুকুর ছিল নবাব-বাড়ি ঘিরে। পুবের পুকুরের পার হয়ে আমরা উত্তরের পুকুরে পৌঁছতুম। করে করে বাড়িসুদ্ধ সব কটা পুকুর পরিক্রমা করে আপন বাড়িতে যখন পৌঁছতুম তখন আমি রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

কিন্তু আমার কৌতূহলের ক্লান্তি ছিল না—ঐ যে পুকুর পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে বিরাট বিরাট—চণ্ডীমণ্ডপপানা খড়ের আটচালা, চারচালা, দুচালা ওখনে কি হচ্ছে? আমরা থাকি ছোট বাড়িতে—মাত্র চারখানা ঘর, এবং তাদের সব কখানাই এদের একটা ঘরে ঢুকে যেতে পারে। আমাদের জীবন আর ওদের জীবনের ধরন যে এক হতে পারে না সে বিষয়ে আমার মনে একটা আবছা-আবছা ধারণা ছিল। দুই পুকুরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে চওড়া

রাস্তা। শেষ হয়েছে বড় বৈঠকখানার সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে এক ল্যাণ্ডো গাড়ি। ঘোড়া কাঁকরের রাস্তায় যে পা ঠুকছে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি এখান থেকে। গাড়ির গা, ঘোড়ার গা থেকে যে সকালের রোদ টিকরে পড়ছে সেটা দেখতে পাচ্ছি আরো স্পষ্ট। আর পিছনে দেখছি, আবছা-আবছা বৈঠকখানার বারান্দায় কারা সব হাঁটাহাঁটি নড়াচড়া করছে।

বাবাকে জিজ্ঞেস করতুম, 'এসব কি? এখানে থাকে কারা?'

বাবা ছিলেন কট্টর। শুধু যে আপন ধর্মে অবিচল বিশ্বাস তাই নয়, তাঁর মতে সংসারে মাত্র দুটি রঙ। কালো আর সাদা। মিশমিশে কালো আর ধবধবে সাদা। পাপ পাপ, পুণ্য পুণ্য! পাপী যতই বোঝাবার চেষ্টা করুক না কেন, কোন্ নিদারুণ দায়ে পড়ে সে ঐ কর্ম করেছে বাবার কানে সেটা প্রবেশ করতো না। ভালো মন্দয় মিলিয়ে মানুষ গড়া—এটা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মনের এল্‌বামে কোনো হাফটোন্ ছবি ঢুকতে পারতো না। এসব অবশ্য আমি বড় হয়ে পরে বুঝতে পেরেছিলুম।

নবাব-বাড়ির বিলাস-ব্যসন, হয়তো বা অনাচার পাপাচারের খবরও তাঁর কানে গিয়ে পেঁ ৗচেছিল। 'পেঁ ৗচেছিল' ইচ্ছে করেই বলছি, 'প্রবেশ করেনি' নিশ্চয়ই, কারণ কোনো রকমের পাপাচারের কথা তাঁর সামনে কেউ তুলতে সাহস পেত না, এবং যদি বা মুরুব্বীদের পাতলা কোন একজন একটুখানি ফড়ুক্কিপনার কথা তুলতে চাইতেন, বাবা অমনি, 'ব্যস, ব্যস, হয়েছে হয়েছে' বলে থামিয়ে দিয়ে অন্য কথা পাড়তেন।

কাজেই নবাব-বাড়ির ব্যাপারে আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি পাইনি। বাবার গলা থেকে যে একটা গ-র্-র্-র্ জাতীয় শব্দ তখন বেরতো তার মানে আমি জানতুম—এসব বাজে প্রশ্ন আমায় শুধোসনি।

তার বছরখানেক পরে বাবা গেছেন মফস্বলে। আমি সেই

সুযোগে সোজা রওয়ানা দিয়েছি নবাব-বাড়ি পানে। রাস্তায় একা চলা অভ্যাস নেই, তার উপর দুই পুকুরের মাঝখানের পথের দু'ধারের নূতন নূতন ফুলের বাহার দেখে আমি তন্ময়, এমন সময় 'ধর ধর, গেল গেল' চীৎকার এবং চোখের দু'হাত সামনে দেখতে পেলুম জুড়ি গাড়ির দুই বিরাট ঘোড়া হঠাৎ থামতে গিয়ে সামনের দু' জোড়া পা আকাশের দিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। তারপর আর জ্ঞান ছিল না।

যখন চৈতন্য হল তখন প্রথমেই নাকে গেল গোলাপজলের মিষ্টি মোলায়েম গন্ধ। চোখ মেলে দেখি, অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মুখ —মেয়েদের। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার বয়েস তখনো আমার হয়নি কিন্তু তবু লক্ষ্য করেছিলুম তাদের মুখে ভীতি আর কৌতূহল। এরা অন্দরমহলের পর্দানশীন কিশোরী তরুণী। বাইরের অনাত্মীয় ছেলে কখনো দেখেনি।

আমার কাছে সে ঘর মায়াপুরী সদৃশ মনে হয়েছিল। কত ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি ফানুস, আমার পরিচিত মক্কা-মদীনার ছবি—কিন্তু কী বিরাট বড়, আর কতো সুন্দর সোনালী চওড়া ফ্রেমে বাঁধা—নীল মখমলের উপর সোনালী হরফে লেখা হজরৎ বড় পীর মুঈন উদ্-দীন চিশতীর নাম, আরো কত কী। আর বিছানাটাই বা কী মজার! একটু নড়তে গেলেই নীচের দিকে নেবে যায়।

মেয়েগুলি যেন এক একটি পরী। তাদের বুড়ী মা মাসীরাও যেন বুড়ী পরী। তারাও কী সুন্দর! উপরে টানাপাখা বেদম চলছে, তৎসত্ত্বেও গোটা তিনেক মেয়ে হাতপাখা দিয়ে অনবরত আমাকে পাখা করে যাচ্ছে আর আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে।

পিছনে দাসীদের কলগুঞ্জরণের মাঝখানে শুনতে পেলুম, 'পীরের ছেলে', 'মুন্সীদের ব্যাটা' এই সব বলে আমার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

হঠাৎ এরা সব চলে গেল। ডাক্তার সেনগুপ্ত এসেছেন।

আমার কিছুই হয়নি। হঠাৎ বিকটদর্শন জোড়া-ঘোড়া দেখে ভিরমি গিয়েছিলুম। আমার পরিচয় পেতে এদের কণামাত্র সময় লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ডাক্তার বললেন, 'কিছু হয়নি। আমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

বারান্দা থেকে গলা শোনা গেল: 'ল্যাণ্ডোয় করে নিয়ে যায় না যেন। হয়তো ঐ গাড়ি দেখে পীরের ছেলে ভয় পাবে। পালকি-গাড়িতে করে। আর বাতাসার মাকে বল, সঙ্গে যেতে।' বাতাসার মার সঙ্গে অনেক হালুয়া মোরব্বাও দেওয়া হয়েছিল। গাড়ির ভিতর লক্ষ্য করেছিলুম, ছোট্ট সুন্দর একটি আয়না, আর দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ফুলদানিতে কালো গোলাপ। মায়ের সঙ্গে যে ছ্যাকরা-গাড়িতে করে মামাবাড়ি যাই এ তো সে-রকম নয়।

নবাব-বাড়ির সঙ্গে এই আমার প্রথম এবং শেষ পরিচয়।

* * *

বাবা ট্র্যান্সফার হওয়াতে আমরা অন্য শহরে চলে গেলুম।

তারপর ঐ শহরের কাজল নদী দিয়ে কত জলই বয়ে গিয়েছে। নদীর উপর লোহার পোল হয়েছে। দূরের রেলগাড়ি পঁচিশ বছর ধরে চলতে চলতে নদীর ওপারে এসে ইস্টিশেন বানিয়ে এপারেরও জলুস বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই গাড়ি ধরেই একদিন পৌঁছলুম আবার সেই শহরে। স্টেশনে আমার আপিসের হেড ক্লার্ক, একাউনটেণ্ট উপস্থিত। বললে, ভালো বাড়িই ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সরকার এত ঘন ঘন আমায় বদলি করেছে যে এখন আর ওসব বাবদে আমার কোনো ঔৎসুক্য বা কৌতূহল নেই।

একদা এ শহরের রাস্তায় প্রতিটি গর্ত আমার মুখস্থ ছিল। সাইকেলের রডে বসিয়ে বড়দা আমাকে নিয়ে শহরে চক্কর লাগাতো। প্রতি গর্তে খেতুম ঝাঁকুনি। আজ সে রাস্তাগুলো ফিটফাট। গাঁধীজী আসেন, জিন্না সাহেব আসেন—লাটসায়েব আগেও আসতেন, এখন আসেন ঘনঘন।

অনেক পাকা বাড়ি হয়েছে। ১৮৯৭-এর ভূমিকম্পে প্রায় সব পাকা বাড়ি ধূলিসাৎ হওয়াতে আমার ছেলেবেলা পর্যন্ত অতি অল্প লোকই পাকা বাড়ি বানাতে সাহস করতো। এতদিনে সে স্মৃতিও ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে হেথা হোথা অনেকগুলো কৃষ্ণচূড়ার গাছ শহরে এক নূতন বাহারের সৃষ্টি করেছে। হলে কি হয়, ফরাসীতে বলে, 'প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা মেম্ শোজ'—'যতই সে বদলায় ততই তার চেহারা আগের মত দেখায়'—এখানকার সবুজ আর কাঁকরের রাস্তার লালে এমন ছুটো শেড আছে যেগুলো শহরের ছু'রঙা জাতীয় নিশান। হাত দেয় কার সাধ্য।

তবু কেন জানি নে, এই চেনা-অচেনায় মেশানো শহরের ছবি আমার মনে কোনো আনন্দ সঞ্চার করতে পারলো না। চোখ ছুটো বন্ধ করলুম।

ট্যাক্সি থামলো। আমি চোখ মেলে অবাক। সেই ছেলেবেলায় যে বাড়িতে আমরা থাকতুম, আমার আপিসের লোক ঠিক সেই বাড়িটাই আমার জন্য ভাড়া নিয়েছে। তফাতের মধ্যে শুধু এইটুকু যে দক্ষিণমুখো টিনের ছাতওলা সেই আসল বড় ঘরটা আর নেই; তার বদলে একখানা ছিমছাম দোতলা বিল্ডিং—সবুজ খড়খড়িওলা জানলা আর বাড়িটার রঙ ফিকে আসমানী।

স্মৃতির গামছাটা কে যেন নিঙড়ে নিয়ে চার ফোঁটা চোখের জল বের করে দিলে।

আপিসের লোকজন বিচক্ষণ। আমাকে আমার পুরনো স্মৃতির হাতে ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিল।

রাস্তার দিকে মুখ করে ডেকচেয়ারে শুয়ে তাকিয়ে আছি রাস্তার ওপারের সেই প্রাচীন দিনের আম জাম বাঁশ বেতে ঘেরা বাড়িটার সুপুরিগাছের ডগার দিকে, আর শুনছি ঘুঘুর সেই পুরনো ডাক, 'কেষ্ট ঠাকুর, ওঠো ; কেষ্ট ঠাকুর, ওঠো।'

সিগারেট বের করতে গিয়ে প্রথমটায় হাত পকেটেই থমকে গিয়েছিল—হঠাৎ মনে পড়েছিল, মুরুব্বীদের কেউ যদি দেখে ফেলেন! তখন মনে পড়লো, হায় এ শহরে আমার আর কেউ মুরুব্বী নেই। কোথায় না কারু তোয়াক্কা না করে ভস্ ভস্ করে সগর্বে সিগারেট খেতে পারার আনন্দটা মন ভরে দেবে—বীনু যে রকম প্রথম রেলগাড়িতে চড়ে সঙ্গে শ্বশুর-ভাসুর কেউ নেই বলে পুলকিত হয়েছিল—আমার হল উল্টোটা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলুম, দীঘির-পাড় মহল্লার ওসমান চাচা মেলা চোটপাট করতেন সত্য কিন্তু তাঁর বাগানের লিচু খাওয়ার জন্য খবরও যে পাঠাতেন সেও তো সত্য। তাঁর হাড়-কিপটে জামাই বাগানের তাবৎ লিচু পাইকারকে বিক্রি করার ইঙ্গিত দিলে পর চাচা নাকি জামাইকে—আপন জামাইকে খড়ম নিয়ে তাড়া করেছিলেন। আজ চাচা যেখানে সেখানে আল্লা নিশ্চয়ই তাঁর জন্যে মাইলকে মাইল জুড়ে লিচুবন তৈরি করে দিয়েছেন।

সেই ছাতা ল্যাম্পটা আর নেই। সন্ধ্যে হতে না হতে বেয়ারা এসে ফটফট করে গোটা তিনেক বিজলি বাতি অলস অবহেলায় জ্বালিয়ে দিলে। মনে পড়লো, সেই প্রাচীন ছাতা ল্যাম্পটা প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের কাছে কী আদরটাই না পেত।

গেটের কাছে দেখি দুজন লোক আমার বারান্দার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন আলোচনা করছে। শেষটায় দেখি সাহস সঞ্চয় করে দুজনাই কম্পাউণ্ডে ঢুকলো। আমিও এগিয়ে গেলুম। চলার ধরন থেকেই বুঝতে পেরেছি এরা কারা।

আহমদ আলী সুন্দর চাপদাড়ি রেখেছে, আর বিধু চক্রবর্তী

সেই প্রাচীন দিনের সাজে—ধুতি-পাঞ্জাবি-উড়ুনি। হাতে সেই রেলি ব্রাদার্সের সনাতন বাঁশের ডাঁটের ছাতা।

আহমদ আলী এগিয়ে এসে বললে, 'পরিচয় দিতে হবে নাকি? পাঠশালে পাশে বসতুম।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম, 'সে তো হতে পারে না আহমদ সাহেব; আমার পাশে এ রকম দাড়িওলা কেউ বসতো না।'

বিধু অল্পেতেই হাসতো—সেই ছেলেবেলায়ও। আহমদ আলীকে বললে, 'দেখলি? কি রকম একখানা মাল ছাড়লে। এবার বলবে, 'অন্য পাশে ও রকম নেয়াপাতি ভুঁড়ি নিয়ে কেউ বসতো না'।'

বলেই তার নেয়াপাতি ভুঁড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে হাসি আর থামাতে চায় না। দুজনাকে পরম সমাদরে বারান্দায় বসালুম।

গড়গড়ায় টান দিয়ে আহমদ আলী বললে, 'জানিস বিধু, এ বারান্দায় বসে গড়গড়ায় টান দিতে কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হয়। তবু না হয় মেরে কেটে সিগারেটটা বোঝা যায়। বিপাকে ওটাকে পকেটে পুরে নাক টিপেও মারা যায়।' বিধু বললে, 'স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কুঞ্জ খুঁজতেন, কিংবা যেতেন গোপীসহ যমুনার অতল জলে—তাঁর পর্যন্ত মুরুব্বীর ভয় ছিল।' তারপর 'রাধামাধব, রাধামাধব' বলে বার দুত্তিন হুংকার ছাড়লে। আমি চোখ টিপতে আহমদ আলী বললে, 'দেখ বিধে, বয়েস হয়েছে, এবারে ভণ্ডামি ছাড়। কেষ্টঠাকুর অনেক লীলাখেলা দেখিয়েছেন, কিন্তু ঐ ভণ্ডামিটা করেননি কক্‌খনো।'

বিধু পাষণ্ড। আমাদের ধর্মকথায় কান দিলে না।

পুরনো দিনের অনেক কথাবার্তা হল। ওঠবার সময় বিধু কিঞ্চিৎ কিন্তু কিন্তু করে পকেট থেকে একটা বড় সাইজের পানের ডিবে বের করে বললে, 'রাত্তিরে খাস। বউ দিয়েছে। সন্দেশ। তোর তো—'

পুরনো হলেও নূতন বাড়ি। রাত্রে ভালো ঘুম হল না। কত রকম স্বপ্ন যে তালগোল পাকিয়ে আমাকে বিব্রত করে গেলো তার ইয়ত্তা নেই। শুধু একটা স্বপ্ন দেখলুম খুব পরিষ্কার। ঐ বাড়িতে আমার একটি ছোট ভাই মারা যায়। স্বপ্নে দেখলুম, তাকে সাইক্লের রডে বসিয়ে বাড়ির লনে পাক খাচ্ছি আর সে খলখল করে হাসছে।

সেই শেষ স্বপ্ন। ভোরের আলো তখন ফুটি ফুটি করছে। শীতকাল। র‍্যাপারটা জড়িয়ে বারান্দায় বসলুম। কে যায় ঐ রাস্তা দিয়ে হনহন করে? বিধু না? 'আরে ও বিধুশেখর, ও চক্কোত্তী। থামই না।'

ব্রজসুন্দরীকে স্মরণ করতে করতে বিধু বারান্দায় উঠে বললে, 'অবাক করলি। তুই না বেলা দশটার আগে কখনো বিছানা ছাড়িস নে। জীবনে কখনো ফজরের নামাজ পড়েছিস? তা ভাই, আমি চললুম। দেরি হয়ে গিয়েছে। আহমদ আলী বসে আছে। ওকে নিয়ে মর্নিং ওয়াকে যাই। চল না। না না। তোকে আর ড্রেস বদলাতে হবে না। রাস্তায় লোকজন নেই।'

আমি বললুম, 'সে কি রে? বাবার সঙ্গে যখন ভোরে বেড়াতে বেরতুম তখন তো আমাদের এই অজ মহল্লাতেই বুড়া-ছোঁড়ায় গিসগিস করতো।'

বিধু বললে, 'সে সব দিন গেছে। এখনকার লেটেস্ট্ থিয়োরি হচ্ছে, ব্রাহ্মমুহূর্তে যে লক্ষ্মীছাড়া জড়নিদ্রা আসে সেইটেই নাকি সঞ্জীবনী নিদ্রা। যত সব হাড় আলসের দল।'

ঘন কুয়াশা। লাল কাঁকর-ঢালা এক ফালি আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা দিয়ে তিন জনায় চলেছি। রাস্তার দু'দিকের খালে হয় কচুরিপানা, নয় দুনিয়ার যত লতাপাতা, কচুঘেঁচু আর ঢেকিশাকের মত মাথা-বাঁকানো কি সব ফার্ন যার নাম দেওয়ার প্রয়োজন কেউ কখনো অনুভব করেনি। এক ইঞ্চি জায়গা নেই যেখানে কোনো

একটু সবুজ-কিছু গজায়নি। এই শীতকালেও। শিউড়ি বিষ্টুপুরের লোক কল্পনাও করতে পারবে না। ওদিকে আবার ওদের তাল, খেজুর, নারকোল গাছ এখানে খুঁজে বের করতে হয়। বদলে রয়েছে, রাস্তার দু'পাশে সুপুরির এভিনিউ। তাদের সাদা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা হিম—যেন লেসে গাঁথা মুক্তোর কাজ।

হঠাৎ ফাঁকায় বেরলুম। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ মন্ত্রবলে যেন কুয়াশা অন্তর্ধান করল। রোদ্দুরটা যেন সন্ধ্যেবেলার কনে-দেখার আলোর মর্নিং এডিশন। বাঁ দিকে নজর যেতে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালুম, এবং সেটা এমনই আচমকা যে আহমদ আলী বিধু চক্কো একসঙ্গে শুধলো 'কি হল?'

আমি নিস্পন্দ, নির্বাক। এই সেই নবাব-বাড়ি?

পানায় পানায় ছয়লাপ হয়ে সব-কটা পুকুর এক হয়ে গিয়েছে। জারুল কৃষ্ণচূড়ার এভিনিউ কে যেন সমূলে উৎপাটন করে নিয়ে চলে গিয়েছে। এখন সেখানে যে আশসেওড়া, আকন্দের ঝোপঝাড় হয়েছে তারা যেন পুকুরগুলোর কচুরিপানার সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে! বাড়িগুলোর দিকে চোখ যেতে দেখি, কতকগুলো কাত, কতকগুলোর গোটা দুই চাল উড়ে গিয়ে বেরিয়ে গেছে বাঁশের কাঠামোর পাঁজর, তার উপর বসে আছে সারি সারি পায়রা না ফিঙে ঠাহর করা গেল না, কোথাও বা বিশ্রী নোংরা জামধরা কেরোসিনের টিন দিয়ে চালগুলো মেরামতির চেষ্টা করা হয়েছে, একটা ঘরের উপরে কাত হয়ে পড়ে আছে ঝড়ে উপড়ে-পড়া একটা আস্ত গাছ—সেটা সরাবার জন্য কারো বোধহয় প্রয়োজন বোধ হয়নি—আর এখানে ওখানে সর্বত্র জমে আছে আবর্জনার স্তূপ, ঝোপঝাড়ে ভরতি তামাম বাড়িটা। এবং সবচেয়ে মর্মন্তুদ মনে হল, আনাড়ি হাতের একটি আধমরা আধফালি টমাটো খেত দেখে—এই দৈন্য, অবহেলা, লক্ষ্মীছাড়া পরিবেশের মধ্যে কে যেন অনিচ্ছায় অর্ধাবশ হস্তে আধখ্যাচড়া চেষ্টা দিয়েছে একমুঠো

খাদ্য সংস্থান করতে। এলোপাতাড়ি কঞ্চির বেড়ার মাঝখান দিয়ে সেখানে একটা ছাগল ঢুকছে।

বিধু বললে, 'কি রে, জ্যান্ত ভূত দেখলি নাকি? আমাদের দেখিয়ে দেনা।'

আমি ততক্ষণে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছি। বললুম, 'কিচ্ছু দেখছিস না?'

'না তো।'

বুঝলুম, নবাব-বাড়ির এ পরিবর্তন তো আর এক দিনে হয়নি যে এরা যারা পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ধরে এখানে বেড়াতে আসছে তারা লক্ষ্য করবে। তাই হেঁয়ালি বাদ দিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করলুম, 'নবাব-বাড়ির এ-অবস্থা হল কি করে?'

আহমদ আলী যদিও ঘড়ি ঘড়ি বিধুর মতো সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করে না তবু দেখলুম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হয়েছে তারই। বললে, 'আল্লা যাকে দিয়ে যা করান। কিন্তু ধনদৌলত যায় কি করে সেটা তুই বহু বৎসর শহরে কাটিয়ে এসে আমাদের শুধোচ্ছিস! সেখানে তো শুনেছি, আজ রাজা কাল ফকীর। নিত্যি নিত্যি এবং গণ্ডায় গণ্ডায়। এখানে সব-কিছুই চলে ধীরে ধীরে, তাই ধনী হতে সময় লাগে, আর গরীব হতেও সময় লাগে।'

বিধু দেখলুম, একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। আমার মন তখনো নবাব-বাড়িটার ঐ হতশ্রী ছবিটা গ্রহণ করতে পারছে না। বিধু বললে, 'চল, ঐ টিলাটার উপরে। বাবু সেখানে চা পান করেন'— বাবু অর্থাৎ আহমদ আলী।

টিলার উপর ছোট্ট একটি দেউল, কিন্তু বিগ্রহ নেই। কিংবা হয়তো চিতাভস্মের স্মৃতি-মন্দির। দেউলের কোলে একটি ছোট্ট ছত্রী। তারি উপরে বসে আহমদ আলী ঝোলা থেকে চায়ের ফ্লাস্ক বের করলো। বিধুর জন্য লেবু।

আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে আহমদ আলী বললে, 'বিধু বলুক। ওর মা বিশ্বাস বাড়ির মেয়ে।'

আমি বললুম, 'বিশ্বাসরা তো কায়েত হয়।'

বিধু বললে, 'হাতী হয়। বামুন হয়, কায়েত হয়, নমশূদ্র হয়, ডোম-চাঁড়াল ভী হয়। এই তো খবর রাখিস হিন্দুদের। আর আমরা মরি তোদের খবর নিয়ে নিয়ে। ওদিকে আবার গলাগলি, ভাই ভাই। যত সব!'

আমি বললুম, 'কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় যে আবার হিন্দুরা মুসলমানদের কোনো-কিছু জানে না, ওদিকে মুসলমানরা মনোরথ দ্বিতীয়া থেকে আরম্ভ করে রটন্তী পূজো পর্যন্ত ওকিবহাল। তা সে যাকগে।'

বিধু বলাতে আবছা আবছা মনে পড়লো, তার মামার বংশের বিশ্বাসরা অনেক পুরুষ ধরে নবাব-বাড়ির নায়েব।

বিধু কোথায় আরম্ভ করবে, ঠিক যেন বুঝতে পারছিল না। শেষটায় বললে, 'মা আর কি বলবে? জ্যাঠতুতো ভাই, অথচ বয়েসে প্রায় বাপের সমান। তদুপরি তিনি গম্ভীর। তদুপরি বছর পঁচিশ পূর্বে যখন পড়তা বিগড়োতে আরম্ভ করলো সেই থেকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বাড়ি ফেরেন দুপুর রাতে চোরের মতো, বেরিয়ে যান ভোরবেলা চোরের মতো। মামী নেই, ছেলেপুলে নেই, শুনো দেবে কে?'

আমি শুধালুম, 'আরম্ভ হল কি করে?'

বিধু বললে, 'সে আমি জানি। আমাদের দেশে তখনো ব্যাঙ্ক কাকে বলে লোকে জানতো না। শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে গোয়ালন্দ স্টীমারে কে নাকি নবাব সায়েবকে বোঝালে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে সুদ দেয়। এমনিতে কেউ নবাব সায়েবকে লগ্নির কারবার করতে বললে তিনি নিশ্চয়ই তাকে হাণ্টার নিয়ে তাড়া করতেন, কিন্তু কোথায় কোন্ কলকাতায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বেনাগালে

কাগজ-কলমেই সব-কিছু হয়—ওতে আর আপত্তি কি ? কিন্তু মামা আপত্তি করেছিল।

ব্যাঙ্ক শেখালে, শেয়ার কিনলে আরো বেশী লাভ। কিন্তু মামা আপত্তি করেছিল।

নবাব সায়েব শিখলেন, চায়ের বাগান মুনাফা করে শেয়ারহোল্ডারকে তারই কিছুটা দেয়; অতএব করো চায়ের বাগান। কিন্তু মামা আপত্তি করেছিল।

মামার জীবন-দর্শন বড় সরল। জমিদারের ব্যাটা তুমি জমিদারি করবে। বিলাস করবে, সমঝে-বুঝে ব্যসনও করতে পারো, এবং তার পরও, যদিস্যাৎ, নিতান্তই কিছু বেঁচে যায় তবে তাই দিয়ে কিনবে নূতন জমিদারি। কাছে-পিঠে হল ভালোই, দূর-দরাজে হলেও আপত্তি নেই। মামাকে খুশী করার জন্যই যেন নবাব সায়েব টাকা দিয়ে তাঁর ভাগ্নেকে পাঠালেন মালয় না বার্মায় কোথায় যেন—ওখানে সস্তায় বড় বড় মহল বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে চা-বাগানে নবাব খেলেন মার।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি ?'

বিধু বললে, 'একদম। কিন্তু তুই ঠিকই আশ্চর্য হয়েছিস। নেটিভরা তখন সবে চায়ের কারবারে ঢুকেছে। ধুলোমুঠো সোনা-মুঠো হচ্ছে, অথচ নবাব খেলেন মার। মামা নাকি বলেছিল, নবাবের ব্যাটা তুমি গিয়েছিলে দাঁড়ি-পাল্লা হাতে করে চা ওজন করে মুদীর সঙ্গে পাল্লা দিতে—বোঝো ঠ্যালা। অবশ্য সামনা-সামনি বলেনি—বলেছিল আড়ালে।

তারপর আরম্ভ হল নবাব পরিবারের পতন। চা-বাগানের দেনা শোধ করবার জন্য নবাব সায়েব ঢুকলেন ফটকা বাজারে। কলকাতার জুট আর বোম্বায়ের তুলো। ওদিকে নবাবের ভাগ্নে মারা যাওয়ার পর দেখা গেল বিরাট বিরাট জমিদারি সে কিনেছে

বহু জায়গায়, কিন্তু তার আপন নামে, নবাব সায়েবের নামে নয়। ভাগ্নের ছেলের সঙ্গে লাগলো মোকদ্দমা।

তখন আরম্ভ হল জমিদারি বন্ধক দেবার পালা। বিরহামপুরের লক্ষ্মণ পাল তার জন্য তৈরী হয়েছিল। আসতে লাগল কাঁড়া কাঁড়া টাকা এক দোর দিয়ে, বেরিয়ে গেল তিন দোর দিয়ে—ফটকা, মোকদ্দমা, আর কলকাতা-বিলাস। আগে নবাব সায়েবের একমাত্র শখ ছিল হরিণ শিকার। এখন যতই তাঁর টাকার অনটন বাড়তে লাগলো ততই চাপলো ফুর্তিবাজির নেশা। এদিকে নিজে মদ্য স্পর্শ করেন না, আবার শুনি কলকাতায় নাকি ইয়ার-বক্সীদের এক সন্ধ্যায় দশ হাজার টাকা মদ খাইয়েছিলেন। শেম্পেন না কি যেন। কি জিনিস রে ওটা? তুই তো কলকাতায় অনেক কাল ছিলি।'

আমি বললুম, 'দামী ফরাসী মদ। তবে শুনেছি, দ্রব্যগুণও আছে। বেহুঁশকে হুঁশে আনতে হলে নাকি ওর বাড়া জিনিস নেই।'

আহমদ আলী তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, 'লাও! আমি তো শুনেছি, মদ খেয়ে হুঁশিয়ার বেহুঁশ হয়।'

বিধু বৈষ্ণব। আদিরসের বেবাক বাৎ জানে। বললে, প্রেমের বেলাও তাই। প্রেমে পড়লে বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়, আর বোকা হয়ে যায় বুদ্ধিমান।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ওসব থাক। নবাব-বাড়ির কথা বলো।'

'হ্যাঁ, নবাব-বাড়ির কথাই সব কথার নবাব।' বিশেষ করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর একটা আন্তরিক মিল আছে। ওঁর রোক চাপাতে উনি এজমালি স্ত্রীটিকে পর্যন্ত খুইয়ে বসলেন। এঁর তাবৎ সম্পত্তি এঁরই এলাকার—যদিও পুষ্যে পুষ্যে মহলটি ভরতি, এবং আর কিছু না হোক মেয়েটার তো বিয়ে দিতে হবে। তবু সেই ক্ষয়ক্ষতি, বিলাস-ব্যসন এবং সর্বগ্রাসী সর্বনাশ থেকে তখন তাঁকে বাঁচায় কে?'

আহমদ আলী বললে,

> 'এমন অনেক বন্ধু আছে দেয় রে তুলে আশা গাছে
> ভালোবেসে নামায় এসে এমন বন্ধু ক'জন আছে?'

বিধু বললে, 'একদম খাঁটি কথা। আমাদের যুধিষ্ঠিরের মৌলা-মুরুব্বী তো কাছেপিঠেই ছিলেন, আর ভীষ্ম তো সভাস্থলে বসেই। কিন্তু তাঁরাই কি ঠেকাতে পেরেছিলেন তখন তাঁকে ?

ওদিকে তিনি হারলেন ভাগ্নের বেটার সঙ্গে মোকদ্দমায়। বিশ্বাস মামা অবশ্য এটা একদিন হতে পারে এই আশঙ্কায় কাগজ-পত্র ঠিকঠাক করে রেখেছিল, কিন্তু নবাব সায়েব মোকদ্দমা জিততে হলে যে এদিক ওদিক একটুখানি ইয়ে করতে হয়, অর্থাৎ মামার কাগজ-পত্র মোতাবেক একটুখানি উনিশ-বিশ করতে হয়, তার সুবিধে নিতে রাজী হলেন না।

ঋণে ঋণে নবাব-বাড়ি যেন চোখের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ে যেতে লাগলো। সে দুর্দৈবের কাহিনী আমি কি করে দু'ঘণ্টা, দু'দিন বা দু'মাসে তোকে বলবো—যেটা ঘটেছিল ঝাড়া পঁচিশ বৎসর ধরে, দিনে দিনে পলে পলে।

যে নবাব-বাড়িতে একদিন এত ঘড়া ঘড়া কলসীভরা ঘি মৌজুদ থাকতো, যে গাঁয়ের থেকে আসা দাসী জলের বদলে ভুলে ঘি দিয়ে বদনা ভরে নিয়ে পিছন ফিরতে গিয়েছিল, সেখানে আরেক দিন আরম্ভ হল তেল, তারপর এমন দিনও এল যখন বাড়ির চতুর্দিকে জমে ওঠা বন থেকে লতা-পাতা কচু-ঘেঁচু যোগাড় করে সেদ্ধ করে খাওয়া। একদিন এই নবাব-বাড়িতে শীতের গোড়ায় যখন গণ্ডায় গণ্ডায় সাটিনের লেপ তৈরী হত তখন তুলোর উপর ঢালা হ'ত কণ্টর কণ্টর আতর—'

আমি বাধা দিয়ে শুধালুম, 'কণ্টর কি রে ?'

আহমদ আলী তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, 'দিশী ভাষা বেবাক ভুলে গিয়েছিস। কণ্টর মানে ডিকেণ্টার। চা-বাগিচার সায়েবরা প্রথম এ দেশে আনে।'

বিধু বললে, শীতের রাতে শুতে শুতে সবাই শুঁকবেন সেই লেপের ভুরভুরে খুশবাই। শুধু সাহেব বিবিরা না—গোলাম,

দয়লা, নওলা পর্যন্ত। সেখানেই শেষটায় ছালার চট দিয়ে শুধু কাঁথার কাজ না, কেউ কেউ নাকি লজ্জানিবারণও করেছে। একমাত্র সান্ত্বনার কথা, দুর্দশা চরমে পৌঁছবার পূর্বেই একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সেই শেষ ধার দিয়েছিল লক্ষ্মণ পাল। সেই সঙ্গে সঙ্গে মামাও ঢেলে দিলেন—ঢেলে দিলেন বলা ভুল হল, ছিটে-ফোঁটায় দিলেন তাঁর হিস্যের পৈতৃক সম্পত্তি বেচে তিনি যা যোগাড় করতে পেরেছিলেন। বেশীর ভাগ আগেই গিয়েছিল নবাবের ছোট ছোট হাওলাত শোধ করে বড় বড় ঋণ আনতে।

পুষ্যিরা চতুর্দিকে ছিটকে পড়লো। সামান্য দু'চারজন যাদের অগতির গতি বলেও কোনো গতি ছিল না, তারা ঠিক যেন বাস্তু-সাপের মতোই বন-বাদাড়ে ভরতি বাড়ির আনাচে-কানাচে কাটাতো দিনটা, রাতে বেরতো তাদের ব্যাঙ ইঁদুর অর্থাৎ লতা কচুর জন্য।

এমন সময় নবাবের মস্তকে বজ্রাঘাত। মেয়ে আসছে বাপের বাড়িতে। বিয়ের পর এই প্রথম। সে তো সব জানে—তাঁর কী অবস্থা। সঙ্গে যে মেলা লোকজন আসবে। তিন পুরুষের ভিতর ব্যাটাছেলে মেয়েছেলের মধ্যে ও-ই তো সবচেয়ে বেশী মাত্রায় বুঝ-সমঝ নিয়ে জন্মেছিল। সে এ কি করতে চললো?

তার দিন তিনেক আগে তোদের মসজিদে মসজিদে শবীনা খতমের পরব হয়ে গিয়েছে। নবাব-বাড়ির পয়সায় ঐ যে পাশের টিলার মসজিদ, সেখানে নবাব সায়েবকে কিছু পাঠাতে হয়। তাঁর হাতে তাঁর আম্মাজান প্রথম মক্তব যাবার দিন বেঁধে দিয়েছিলেন একটি সোনার আশরফীর রক্ষাকবচ। কখনো সেটি হাত থেকে নাবেনি। সেইটি পাঠিয়ে দিলেন মসজিদে।

এই প্রথম নবাব সায়েব নিজে বেরলেন ধারের সন্ধানে। পায়ে হেঁটে।

লক্ষ্মণ পাল পিছনের দরজা দিয়ে পালালো।

মানুষ কি করে যে একদিন এমন অবস্থায় পৌঁছয় যে-দিন সে

আর চার আনা পয়সা পর্যন্ত যোগাড় করতে পারে না সে আমি কখনো বুঝতে পারিনি। ছেলেবেলায় মাইকেলের জীবনীতে পড়েছিলুম সেই নবাবের ছেলে মাইকেল—যে কিনা একদিন আস্ত সোনার মোহর দিয়ে সে যুগে চুল কাটাতেন—তিনি একদিন খয়রাতী হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে চার আনা পয়সা যোগাড় করতে পারেননি। তখন সেটা বিশ্বাস করিনি। আজ করি।'

"বিশ্বাস!"

"জী, হুজুর?"

"কি হবে?"

"কী আর হবে।"

সেই দিন সকালের গাড়িতে মেয়ের স্টেশনে পৌঁছাবার কথা। নবাব বিশ্বাস কেউই সেখানে যাননি।

সেই পায়রার ময়লায় ভরতি বৈঠকখানায় নবাব শুয়ে আছেন ভাঙা ইজিচেয়ারে। মামা সামনে বারান্দায় হেলান দিয়ে মাটিতে বসে।

এমন সময় অতি নিঃশব্দে কে যেন ঘরে ঢুকলো।

মেয়ে। সর্বাঙ্গে দামী গয়না। কিন্তু একা। রিকশায় করে এসেছে। কিন্তু একা।

বিধু দেখি চুপ করে গিয়ে, নবাব-বাড়ির দিকে পিছন ফিরে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

আমি শুধালুম, 'একা মানে?'

বিধু বললে, 'আমাদের ডিস্ট্রিকটে পয়লা স্টেশনে পৌঁছতেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন পাইক-বরকন্দাজদের নাকি নামবার হুকুম দিয়ে বলেছে, শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার বাপের বাড়িতে যায় এ-রেওয়াজ নাকি তাদের পরিবারে নেই। মেয়ে যাবে ধুলো-পায়ে—একা।

সে রাতে মেয়ে বাজার থেকে হাঁড়িকুড়ি এনে বাপকে রেঁধে খাইয়েছিল। ধনীর মেয়ে বেহুলা-ধনী যে রকম নারকোলের খোলে রান্না করে লক্ষ্মীন্দরকে দুপুর রাতে খেতে দিয়েছিল।'

স্নব

সমূচা হাজরা রোড হাওড়া প্ল্যাটফর্মে সমুপস্থিত। অর্থাৎ হাজরা রোডস্থ আমাদের রকফেলারগণ। অজনদা, মশাদা, ঘণ্টু, মুকুলদি,—ইস্তক পাঁচ বছরের গুড়গুড়ি।

আলিঙ্গন, মস্তকাঘ্রাণ ইত্যাদি শেষ হওয়ার পূর্বেই মশাদা বললে, 'ওঃ, কী গরমটাই না পড়েছে। ফোকাস্ ঢিলে করে দিলে।'

মশাদার ঐ একটা গুণ। কোনো নূতন টেক্‌নিকাল কাজ আরম্ভ করলে, তার প্রচলিত বুলিগুলো অন্য জিনিসে চট্ করে ট্রান্সফার করতে পারে। এই দুর্দিনে সবাই যখন ফটোগ্রাফি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে সেই সময় মশাদা ঐ কর্মে মন দিয়েছে।

ইতিমধ্যে অ্যারকণ্ডিশন কোচের স্টুয়ার্ড, মেট, রেস্তোরাঁকারের বাবুর্চী ইত্যাদি যাবতীয় চাকর-নফর, সরকারী ভাষায় ক্লাশ ফোর স্টাফ সারি বেঁধে আমায় গার্ড অব অনার দিলে।

আমার চোখে মুখে নিশ্চয়ই ভ্রূকুটিকুটিল বিরক্তি ফুটে উঠেছিল।

রক্ চুপ। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুতেই দেখি ঘণ্টু হনহন করে পালাচ্ছে। মুকুলদি হেঁকে শুধালে, 'ব্যাপার কি? ঘণ্টুদা পালাচ্ছো কোথায়?'

বললে, 'চাচা ক্ষেপেছে। নইলে অ্যারকণ্ডিশনে আসার পয়সাই পায় কোথায়, তাবৎকোচ ওকে সেলাম ঠুকবেই বা কেন? দেদার টিপ্‌স্ দিয়েছে নির্ঘাত। এবারে টাকা ধার চাইবে।'

রক্ বললে, 'সত্যি তো। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

আমি বিরস মুখে বললুম, 'বাড়ি গিয়ে।'

চা টা দেখেই জানটা তর-জল হয়ে গেল। চা আমরা বড় একটা খাই নে। কিন্তু সামনে না থাকলে আমরা আসামী খুনে। (আমি 'অহমিয়া' বলিনি, মনে থাকে যেন)। ওটা একটা

সিম্বল্। মা কালী নৈবেদ্য ছোঁন না কিন্তু না দিলে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'হালের বলদ বিক্রি করে রে, পালের গাই বিক্রি করে।'

সবাই শুধালে, 'সে আবার কি?' এরা শহুরে। 'হালের বলদ', 'পালের গাই' বলতে কি বুকের পাঁজর, জিগরের খুন জানে না।

বললুম, 'তাই দিয়ে অ্যারকোচের টিকিট কেটেছি—তোরা কলকাতার একশ'তে হিমসিম খাচ্ছিস। আমি যখন দিল্লী ছাড়ি তখন সেখানে ১১৮°।

পদ্মায় যখন উজোন বাইতে হয় তখন পাল যদি বাতাস পায় তা হলে দেখবি—আকছারই দেখবি—একা একজন মাল্লা মাঝ পদ্মা দিয়ে যাচ্ছে তরতর করে। আর সে কী এফর্ট্‌লেস্‌ ব্যাপার! লোকটার ডান হাত মোলায়েমসে অতি আলগোছে হালের উপর রাখা—যেন কোনো মহারাজ দামী সিংহাসনের মখমল-মোড়া হাতলের উপর হাত রেখে পোর্ট্রেট পেন্টিং করাচ্ছেন। আর বাঁ হাত দিয়ে ধরেছে পালের দড়ি। যেন প্রেমিক অলস রভসে প্রিয়ার বিনুনিটি তুলে ধরেছেন। প্রিয়া পালের বুক ফুলিয়ে উড়ে চলেছেন উজানে।

তখন যদি সে দেখে আরেক নৌকায় তিনজন মাল্লা হাল বৈঠা মেরে মেরে নেয়ে-ভিজে কাঁই হয়ে যাচ্ছে, এক বিঘৎ এগুতে পারছে না পাল নেই বলে, তখন সে চিৎকার করে তাদের বলে, 'হালের বলদ বিক্রি কর, পালের গাই বেচে দে'—বাকিটা আর বলে না। সবাই জানে। তার মানে ঐ পয়সা দিয়ে পাল কেন।'

টেটেনদি উপস্থিত অর্থাভাবে এটা সেটা বেচছে। নবীন হুদিশের আশায় শুধোলে, 'আপনি কি বেচলেন?' ইঙ্গিতটা বড় রূঢ়।

'মর্নিং স্যুট, ঈভনিং জ্যাকেট—'

বড়দা পিচভরা মুখ আকাশ পানে তুলে বললে, 'ভালো করেননি। এই আমি কেদার-বদ্রী হয়ে এলুম। পথেই যত বাহার—দেবতা দেখতে এমন কিছু না, কিন্তু যখন সাঁঝের ঝোঁকে ঈভনিং জ্যাকেটটি পরেন তখন দেখায় লাভ্লি।'

বিগ্রহের ঈভনিং জ্যাকেট। ওঃ, বুঝেছি। ঠাকুরকে যখন সন্ধ্যায় সিঁদুর চন্দন দিয়ে শৃংগার করানো হয়। সেইটে বড়দার ভাষায় ঈভনিং জ্যাকেট পরা। বুঝতে সময় লেগেছে। দিল্লীতে তিন বছর থেকে থেকে আক্কেল-বুদ্ধি ভোঁতা মেরে গিয়েছে।

টেটৈনদি শুধলে, 'আর গার্ড অব্ অনার পেলেন বুঝি সেই ঈভনিং জ্যাকেটের পয়সার মর্গানেটিক টিপ্স্ দিয়ে?' টেটেন ইংরিজিতে এম-এ। লাতিন শব্দের ইটের থান মারে।

অজনদা বললে, 'সে সব দিন গেছে রে টেটেন, তুই জানিস নে। টিপ্স্ দিলে তোকে খাতির করলে করতেও পারে, কিন্তু না দিয়ে তুই যদি এম-পি টেম-পি হবার ভান করতে পারিস অর্থাৎ ভি. আই. পি. টি. আই. পি—'

মশাদা আলট্রা ডিমোক্রেট। বাধা দিয়ে বললে, 'এই ভি. আই. পি. কথাটা প্রথম কে ব্যবহার করেছিল জানেন, চাচা? লোকটা নিশ্চয়ই জন্মদাস ছিল। ভি. আই. পি. যদি কেউ থাকে তবে সে মুটে, জুতা-বুরুশওলা—সরকারের এক পয়সা নেয় না, সরকারের গাড়ি মুফতে চড়ে না,—'

আমি বললুম, 'আমি টিপ্স্ দিইনি। শোন।'

পালের বলদ বিক্রি করে তো অ্যারকোচে চাপলুম। দিল্লী চিরতরে ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে দিল্লীর খানদানীর ইয়ারদোস্তরা গাড়িতে বিস্তর খাবার-দাবার তুলে দিলে। বিরয়ানী, মুরগী মুছল্লম থেকে মিঠা টুক্‌রা মোরব্বা ইস্তেক। চারটে টিফিন-কেরিয়র ভর্তি। দুজন তো এলেন কানপুর অবধি। তাঁরা আবার

দোস্তী পাকাতে ওস্তাদ। কোচের প্রায় সবাই জড়ো হল আমাদের কুপেতে। শুরু হল মুশাইরা, বয়েৎ-বাজি। তারপর নবাবী খানাপিনা। স্টুয়ার্ড সোডা সাপ্লাই করতে করতে কাহিল হয়ে গেল।

রাত বারোটার সময় যখন যে যার কোঠে ফিরে গেছেন, আমি একা, তখন দেখি স্টুয়ার্ড। পিছনে তারই দলের দু'তিনজন। ভাবলুম, লোকগুলো বিস্তর খেটেছে—এই বেলাই টিপ্‌স্‌টা দিয়ে দি। কিন্তু তার পূর্বেই সে ডবল সেলাম করে শুধালে, 'হুজুর, আপ তো ডক্টর হৈ?' গোয়ানীজ টোয়ানীজ হবে—'ডক্টর'ই বলেছিল। আমি না ভেবেই বললুম, 'হ্যাঁ।' তখন বিস্তর কাঁচুমাচু হয়ে, এন্তের ঢোক গিলে, ঘাড়ের চুল ছিঁড়ে প্রায় ক্লীন শেভ করে বললে, 'হুজুর যদি কিছু না মনে করেন—'

আমি বললুম, 'কী আপদ! বলেই ফেলো না।'

বহু কষ্টে বোঝালে, তার মেটের ভয়ঙ্কর জ্বর, বেহদ্দ বেহুঁশ, এই যায় কি তেই যায়। হুজুরের যদি দয়া হয়, হুজুর মেহেরবান।

প্রথমটায় আমি বুঝতে পারিনি। বললুম, 'বড়ী আফসোস্ কী বাৎ, কিন্তু আমি কি করবো?'

এবারে সে তার সর্বশরীর বাং মাছের মত মোচড়াতে আরম্ভ করলে। যেন জ্বরটা তারই! বললে, 'আপনি তো স্যর ডক্টর।'

তখন আমার কানে জল গেল। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আমি জ্বর সারাই কে বললে?'

লোকটা ভয় পেয়েছে। অথচ আপন কাজ উদ্ধার করতে চায় বলে মেলা তর্ক করে আমাকে চটাতেও চায় না। বললে, 'এই তো রিজার্ভেশন কার্ডে লেখাও রয়েছে, হুজুর।'

এ দুনিয়ায় 'আলী' নামটা বাঙলা দেশে 'কেষ্টা' নামটার মতই বিরল। গুবলেট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমার আপিস বার্থ

রিজার্ভ করার সময় ডক্টরটি জুড়ে দিয়েছিলেন। সেইটেই এখন কাল হল।

আমি সবিনয় বললুম, 'সে অন্য ডাক্তার।'

বোধ হয় ভুল করলুম। কারণ এর পর দেখি স্টুয়ার্ডের সাঙ্গোপাঙ্গরা তার পিছন থেকে মাসিকপত্রের উপন্যাসের মত 'ক্রমশ প্রকাশ্য' হচ্ছে। সকলেরই হাত জোড় করা। হুবহু মোগল পেন্টিংয়ের দরবারের মত। অবশ্য মুখের ভাব ;—আসামীর সনাক্তকরণ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে, এইবারে সাক্ষীশাবুদ-দলিল-দস্তাবেজ আরম্ভ হবে।

আমি অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি অন্য ডক্টর। তারা তর্ক করতে চায় না, কিন্তু জানতে চায়, তবে কিসের? ডক্টর অব ফিলসফি এদের বোঝাই কি প্রকারে? শেষটায় বললুম, 'দেমাগ সাফ করনেকা ডাক্‌টর—'অর্থাৎ মগজ সাফ করার ডাক্তার।' শুনেছি, দর্শন অধ্যয়ন করলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়, অবশ্য আমার বিশ্বাস বিপরীত।'

রাসা রোড থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত তাবৎ হাজরা রোড এ-কথার আনন্দে সায় দিলে। কথায় বলে 'দশের মুখ খুদার তবলা,' কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে উল্লাস বোধ করলুম না। যাক্‌ গে।

এই 'দেমাগ সাফ করাটা' গিলতে স্টুয়ার্ডগোষ্ঠীর সময় লেগেছিল। শেষটায় স্বয়ং স্টুয়ার্ডই হালে পানি পেল। ভয় পেয়ে বললে, 'না হুজুর, মেটের মাথা খারাপ নয়।'

ও হরি! এরা ভেবেছে, আমি পাগলের ডাক্তার।

টেটেনদি বললে, 'সাইকায়াট্রিস্ট্‌।'

আমি বললুম 'কচু। মেড্‌সিন না পড়েও ঐ কর্ম করা যায়। সেটা ওরা বুঝলে তো আমি বেঁচে যেতুম। তা নয়। ওরা ফিসফিস করছে, আর সব মেলা ব্যামো সারানোর পর আমি পাগল সারাতে মন দিয়েছি—ঐ কর্ম সব চেয়ে কঠিন বলে। পাগল সারাতে পারে,

আর জ্বর সারাতে পারে না। হুঁঃ 'হাতী' বানান করতে পারে আর 'পিপীলিকা' পারে না—হাতী কত বিরাট আর পিপীলিকা কত ছোট—ঐ গোছ যুক্তি।

কিংবা বলতে পারো, ছোট বিপদ এড়াতে গিয়ে পড়লুম বড় বিপদে। সেই যে কোন্ সুবুদ্ধিমান বৃষ্টি এড়াবার জন্তে ডুব দিয়েছিল পুকুরে।

তা সে যাকগে। ওরা আমাকে বিধান ডাক্তার, মানুষের ডাক্তার, পাগলের ডাক্তার, কুকুরের ডাক্তার, যা-খুশি ভাবুক, আমার তাতে থোড়াই এসে যায়।

কিন্তু ঐ বিধান ডাক্তার নিয়েই লাগল গোলমাল। ওরা ভেবেছে আমি বিধানবাবুর চেয়েও বড় ডাক্তার। কিছুটা আমায় শুনিয়ে, কিছুটা নিজেদের ভিতর তাদের মধ্যে যেন নিলাম ডাকাডাকি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আমার দক্ষিণা কত! চৌষট্টি না কত থেকে আরম্ভ হয়েছিল শুনতে পাইনি, কিন্তু আমার চোখের সামনেই দেখ তো না দেখ দশ বিশ হাজারে গিয়ে পৌঁচেছে। আর কত রকম যুক্তিই না একে অন্তকে দেখাচ্ছে। অ্যারকণ্ডিশন চড়ি, সে তো ডাল-ভাত। কটা বাক্স প্যাঁটরা—সব তাদের মুখস্থ। দামী দামী ডাক্তারির মালপত্র ওদের ভিতরে। সব বিলায়তী, জর্মনি, আরো কত কি!

আমার চেহারা দেখে আমাকে উজবুক মনে হতে পারে, কিন্তু পাষণ্ডের মত চেহারা আমার নয়, সে-কথা আমার মা আমাকে বলেছে। তবে কেন এরা ভাবছে, আমি একটা আস্ত কসাই মোটা টাকা না পেলে বরঞ্চ একটা লোককে মরতে দেখব, তবু কড়ে আঙুলটি তুলব না।

আমি বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি ডাক্তারির কিছুই জানি নে, খামখা একটা লোককে কুচিকিৎসায় মারি কোন আক্কেলে?

ওরা চুপ করে যেভাবে আমার দিকে তাকালে তাতে মনে হল আমি যেন একটি পয়লা নম্বরের গোড়সে। তবে গোড়সে শুধু একটিমাত্র গাঁধীকে খুন করেছিল, আমি করি গণ্ডায় গণ্ডায়।

আমিও চুপ।

শেষটায় তারা শ্লথ মন্থরে পা চালাতে আরম্ভ করলে।

আমার মনে করুণার উদ্রেক হল। আর ঐ করলুম ভুল। যুধিষ্ঠিরের মত খ্রীস্ট কোন একটি পাপ করার ফলে যদি কখনো নরক-দর্শনে আসেন তবে তাঁকে ঐ একটি উপদেশ দেব, 'মহাশয়, আপনি করুণা করে আর ঐ করুণা করার উপদেশটি দেবেন না।'

ওদের বললুম, 'তা ওকে এলাহাবাদে নামিয়ে দাও না'—মনে মনে বললুম, পণ্ডিতজীরও নিশ্চয়ই গণ্ডাকয়েক অনারারি ডক্টরেট আছে।

এক লম্ফে সবাই আবার আমার দোরের সামনে। এককণ্ঠে সবাই বললে, 'এলাহাবাদ তো পিছনে ফেলে এসেছি।'

তখন মনে মনে চিন্তা করলুম, হাওড়া পর্যন্ত তা হলে তো এর কোনো গতি নেই। তখন আরো মনে পড়ল, বছর তিনেক পূর্বে আমার ফ্লু হওয়াতে এক সহৃদয় বন্ধু আমাকে এক শিশি ফ্লু টেবলেট দিয়ে যান; আমি ভালো করেই জানতুম, ফ্লু ওষুধে সারে না, তাই সে ওষুধ তেমনি পড়েছিল। দিল্লী ছাড়ার সময় আমার সময় ছিল না বলে চাকরকে বলেছিলুম, ঘরের তাবৎ মাল যেন প্যাক করে দেয়। সেই কারণেই দুনিয়ার যত আবর্জনায় ভর্তি দু' গণ্ডা বাক্সোপ্যাঁটরা। ঘাঁটবে কে, খুঁজে পাবেন কোন হনুমান?

তারই ইঙ্গিত দিয়ে করলুম দুই নম্বরের ভুল—যদিও আসলে সেইটেই পয়লানম্বরী ভুল। সঙ্গে সঙ্গে আমার আটটা বাক্স

করিডোরে সারি বেঁধে সাজানো হল—আমি বাধা দিতে না দিতেই। তখন নাচার হয়ে সেই শিশিটার বর্ণনা দিলুম।

পুলিনবিহারী সেনের বাড়ি এক ভোরে সার্চ হয়েছিল। আমি সে রাত্রে তার সঙ্গে ছিলুম বলে স্বচক্ষে দেখেছি পুলিস কি রকম চিরুনি চালায় টুথব্রাশের উপর—তার থেকে কিছু বেরোয় কি না, সেই আশায়। মায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এদের কাছ থেকে তালিম নিয়ে যেতে পারত কি করে সার্চ চালাতে হয়।

আড্ডার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'বল দেখি ভাইরা সব, তিন বছরের প্রবাসে মানুষের কোন্ না দশ বিশটা ওষুধের শিশি জড় হয়। তারই এক-একটা বেরয় আর তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে। ভাবখানা,—তবে না বলছিলেন চাঁদ তিনি ডাক্তার নন। আর ইংরিজি পড়তে জানে না বলে লাইটার ফ্লুইডকে ভাবে ওষুধ, ফেন্সি গঁদের শিশিকে ভাবে ওষুধ, সেন্টের শিশিকে ভাবে ওষুধ—একমাত্র সসের শিশিকে ওষুধ ভাবেনি—রেস্তোরাঁকারে কাজ করে বলে।

ওষুধের শিশি তো আর রাসবিহারী বোস নন যে জাপান পালিয়ে যাবেন। ধরা পড়লেন। বমালসুদ্ধ গ্রেফ্তার—'

অজন বললে, 'এই 'বমালসুদ্ধ' কথাটা কি ভুল নয়? 'ব' মানেই তো 'সুদ্ধ', ইংরেজিতে যাকে বলে 'উইথ'। উইথ মাল গ্রেফ্তার। আবার সুদ্ধ কেন? হয় হবে 'বমাল গ্রেফ্তার', না হয় হবে 'মালসুদ্ধ গ্রেফ্তার'। যেমন বলি 'বহাল তবিয়তে' আছি, 'বহালসুদ্ধ তবিয়তে আছি' তো বলি নে।'

মশাদা বললেন, 'রবিঠাকুর ব্যবহার করেছেন।'

অজনদা চটে বললে, 'তিনি তো দক্ষিণ আমেরিকায় বসে কবিতায় লিখলেন, আকাশে সপ্তর্ষি উঠলো। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কি সপ্তর্ষি দেখা যায়? আরো কি যেন আছে? হ্যাঁ—

'বেতসের বাঁশী'—বেতস মানে তো বেত। বেত দিয়ে বাঁশী হতে কখনো দেখেছিস ?'

টেটেনদি অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েছে। বললে 'যত সব বেরসিক !'

বড়দা সদুপদেশ দিলেন, 'সে না হয় পণ্ডিত মশাইকে পরে শুধনো যাবে, কোন্‌টা ঠিক। উপস্থিত তোদের বলে দিচ্ছি, রবিঠাকুরের সেণ্টেনারি আসছে। এখন বছর তুই এসব কথা বলেছিস কি পাড়ার ছেলেরা মারবে।'

মুকুলদি উঠে চলে যাচ্ছে দেখে সবাই হন্তদন্ত হয়ে বললে, 'বলুন, চাচা, তারপর কি হল।' মুকুলদিকে কে না সমীহ করে। ভাঁড়ারের চাবি তার হাতে।

আমি বললুম, 'ওষুধটা বেরুলে পর আমি বললুম, "এরই ছুটি গুলি খাইয়ে দাও।" মনে মনে বললুম, "এতে তার ভালো-মন্দ কিস্‌সুটি হবে না—হাওড়া গিয়ে যা হবার তাই হবে।"

নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে গেলুম। ভাবলুম, আপদ গেছে। ঐ করলুম আরেক ভুল।

পরদিন সকালে বর্ধমানে চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমার কুপের সামনে একপাল লোক একসারি কাপড়ে ঢাকা ট্রে নিয়ে হাজির। ভাই, তোরা যদি থাকতিস—রুটি-মাখন-ওমলেট বাদ দে—ফ্রাঙ্কফুর্টার সসেজ, মালাবারের টিনের চিংড়ি, ইস্তেক মুসলমানী কাবাব পরোটা।'

আমার ভ্রূকুটিকুটিল নয়ন তারা লক্ষ্যই করলে না। সমস্বরে চেঁচিয়ে বললে, 'সেরে গেছে, হুজুর, একদম সেরে গেছে।'

আমি বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। বললুম, 'কে ?'

সবাই প্রথমটায় থ মেরে পরে বললে, 'ঐ যে মেট।' তারা যেভাবে তাকালে তাতে মনে হল ওরা যেন বলতে চায়, ডাক্তার-গুলো কি বেদরদ চামার—রুগীর কি হল না হল থোড়াই পরোয়া করে—ইস্তেক কে রুগী সেও ভুলে যায়।

স্টুয়ার্ড সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'সকালে উঠেই তিনখানা ডবল রুটি খেয়েছে। দু পট চা। আমরা বারণ করিনি। আপনি তো রয়েছেন। আর ভাবনা কি।'

আমি মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম।

অজনটা পেটুক। বললে, 'তা বেশ, তা বেশ। ব্রেকফাস্টটা ভালো করে খেয়ে নিলেই পারতেন।'

আমি বললুম, 'দেখ অজন, আস্ত একটা বুজরুক পেলি নাকি আমাকে—পেশাদার গুরু-মুর্শীদরা ঐ রকম ধাপ্পা মেরে খায়। আমাকে কি তাই ঠাওরালি?' মশাদা বললে, 'চাচাকে কখনো ব্রেকফাস্ট খেতে দেখেছিস—সেইটে হল আসল কারণ।'

টেটেন বললে, 'আপনি থামুন, মশাদা। চাচাকে আর চটাবেন না। বলুন, চাচা।'

আমি বললুম, 'ব্রেকফাস্ট খেলুম না দেখে ওরা ভড়কে গেল—অবশ্য চা দু' কাপ খেয়েছিলুম। ওরা নিঃশব্দে চলে গেল।

হাওড়া পৌঁছবার পূর্বে চীফ স্টুয়ার্ডকে ডেকে বললুম, "এই নাও চায়ের এক টাকা, আর তোমাদের টিপস্ চারটাকা।"

স্টুয়ার্ড ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তার পিছনে একটা অচেনা চেহারার লোক ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে—পরে জানলুম ঐ লোকটাই মেট, আমাকে সেলাম জানাতে এসেছিল—তার পর ডুকরে বললে, "আমরা গরীব, আপনার ফীজ দিতে পারলুম না, আর আপনি উল্টে দিচ্ছেন বখশিশ্।"

আমি বিরক্ত হয়ে সব কটাকে বের করে দিয়ে কুপের দরজা বন্ধ করে দিলুম। তারপর তোরা তো দেখলি আমাকে প্ল্যাটফর্মে গার্ড অব অনার দিলে।'

বলে গুম হয়ে বসে রইলুম।

ঘণ্টুদা একটু মুরুব্বী ঢঙে কথা কয়। বললে, 'এতে আপনি

অত চটছেন কেন ? আপনার ওষুধেই সারুক আর নিজের থেকেই সারুক, আপনার মন খামখা চঞ্চল করছেন কেন ?'

আমি উষ্মার সঙ্গে বললুম, 'তোদের মতো আকাট নিরেট গবেট আমি ইহজন্মে পূর্বজন্মে, জন্মে-জন্মে কখনো দেখিনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ওদের মুখের উপর কৃতজ্ঞতা মাখা ছিল বটে—যার উপর হক্ক অবশ্য আমার নেই—তার পিছনে ছিল লেখা স্নব। অর্থাৎ আমি গরীব দুঃখীর চিকিৎসা করি নে, সেটা এড়াবার জন্য মিথ্যে কথা বলতেও তৈরী—অথচ আমি যে হাত উপু করলেই ওদের পর্বত সেটা সুপ্রমাণ হয়ে গেল। সোজা বাঙলায় স্নব, ক্যাডও বলতে পারিস—'

আমার কণ্ঠ তখন পর্দার পর পর্দা চড়েই যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি জনা পাঁচেক লোক আমাদের বাড়ির নেমপ্লেট পড়ছে। লীডার সেই ব্যাটা স্টুয়ার্ড! আমি আঁতকে উঠলুম। কিন্তু ঠিকানা পেল কি করে ? ওঃ! লাগেজগুলোর উপর নাম-ঠিকানা সাঁটা ছিল। অবশ্য বাড়ির নেম-প্লেটে আমার নাম নেই।

আমি বৈঠকখানায় গা ঢাকা দেবার পূর্বে বললুম, 'ঐ সব মালরা আসছে! ওদের একটু বুঝিয়ে দে না, ভাইরা সব, চাচা-জানরা আমার, যে আমি ডাক্তার নই। তোদের কথা তো বিশ্বাস করবে।'

* * * *

আড়াল থেকে অনিচ্ছায় নিম্নলিখিত কথোপকথন কর্ণে প্রবেশ করল।

'এটা ডাক্তার সাহেব অমুকের বাড়ি ?'

অজনের গলা : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।—ঐ ঢাউস বাড়ি আমার নয়।'

'নেমপ্লেটে নাম না দেখে ভাবলুম, কি জানি—'

বাধা দিয়ে মশার গলা : 'আরে নাম থাকলে কি আর রক্ষে ছিল। ছিঁড়ে ফেলতো না দুনিয়ার যত সব রুগী টুকরো টুকরো করে।'

একাধিক গদগদ কণ্ঠস্বর : 'তা হুজুর আর কি বলবেন, আমরা কি জানি নে? এই মোতীর জ্বরটা বড্ডই পাজী। একবার ধরলে দশদিনের কমে—'

অন্য কণ্ঠ : 'বিশদিনের কমে ছাড়ে না। আর ডাক্তার সায়েবের দুটি গুলিতেই—'

আরেক কণ্ঠ—বোধহয় স্টুয়ার্ডের : 'কিছু যদি মনে না করেন, ওঁর ফীজ কত?'

অজনের টেনে-টেনে বলা : 'তা—তা—তা, দেড়, দুই—'

'দু শ? বাপ্।'

'হাজার—হাজার, শ নয়।'

নিশ্চুপ।

মশার গলা : 'অবশ্য যখন বাইরে যান ঐ যে, মাসখানেক আগে রামপুরের নবাবের ছেলে এসে তাঁকে জোর করে নিয়ে গেল—স্পেশাল ট্রেনে—তখন ত্রিশ হাজার না কত—বল না ঘণ্টু, তুই তো সঙ্গে ছিলি—'

*   *   *

ভাবছি এ রক্‌টা ছাড়ব।

বসন্ত-প্রাতে বাহিরিনু ঘর হতে
ভিক্ষার লাগি চলেছি ভাণ্ড ধরে—
হেরি মাঠ-ভরা নাচে ফুলদল
নাচে পথ-ঘাট ভরে।
দাঁড়াইনু আমি এক লহমার তরে
কথা কিছু ক'ব বলে
ও মা, এ কি দেখি! সমস্ত দিন
কি করে যে গেছে চলে!

শ্রমণ রিয়োকোয়ান

রম্যরচনা

রসগোল্লা
বেদে
পুলিনবিহারী
'কলচর'
বড়দিন
নেভার রাধা

রসগোল্লা

'চুঙ্গিঘর' কথাটা বাংলা ভাষাতে কখনো খুব বেশী চালু ছিল না বলে আজকের দিনে অধিকাংশ বাঙালী যদি সেটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাই নিয়ে মর্মাহত হবার কোনো কারণ নেই। ইংরেজীতে একে বলে 'কাস্টম্ হাউস', ফরাসীতে 'দুয়ান্', জর্মনে 'ৎসল-আম্ট্', ফার্সীতে 'গুম্‌রুক্' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতগুলো ভাষাতে যে এই লক্ষ্মীছাড়া প্রতিষ্ঠানটার প্রতিশব্দ দিলুম তার কারণ আজকের দিনে আমার ইয়ার, পাড়ার পাঁচু, ভূতো সবাই সরকারী নিম-সরকারী, মিন-সরকারী পয়সায় নিত্যি নিত্যি কাইরো-কান্দাহার প্যারিস-ভেনিস সর্বত্র নানাবিধ কনফারেন্স করতে যায় বলে, আর পাকিস্তান হিন্দুস্থান গমনাগমন তো আছেই। ওই শব্দটি জানা থাকলে তড়িঘড়ি তার সন্ধান নিয়ে পাঁচজনের আগে সেখানে পৌঁছতে পারলে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ওটাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কস্মিনকালেও করবেন না। বরঞ্চ রহমত কাবুলীকে তার হকের কড়ি থেকে বঞ্চিত করলে করতেও পারেন কিন্তু তার দেশের 'গুম্‌রুক্'টিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন্ না। 'কাবুলি-ওয়ালা' ফিল্ম আমি দেখিনি। রহমতও বোধ করি সেটাতে তার 'গুম্‌রুক্'কে এড়াবার চেষ্টা করেনি।

কেন? ক্রমশ-প্রকাশ্য।

ডাক্তার, উকিল, কসাই, ডাকাত, সম্পাদক (এবং সম্পাদকরা বলবেন, লেখক) এদের মধ্যে সকলের প্রথম কার জন্মগ্রহণ হয় সে-কথা বলা শক্ত। যারই হোক, তিনি যে চুঙ্গিঘরের চেয়ে প্রাচীন নন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষে মানুষে লেনদেন নিশ্চয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল এবং সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠল, 'আমার ট্যাক্সোটা ভুলো না কিন্তু'—তা সে তৃতীয় ব্যক্তি গাঁয়ের মোড়লই হন, পঞ্চাশখানা

গাঁয়ের দলপতিই হন, কিংবা রাজা অথবা তাঁর কর্মচারীই হন। তা তিনি নিন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কারণ এ-যাবৎ আমি পুরনো খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বিক্রি করিনি। কিন্তু যেখানে দু পয়সা লাভের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে যখন চুঙ্গিঘর তার না-হকের কড়ি না-হক চাইতে যায়, তখনই আমাদের মনে সুবুদ্ধি জাগে, ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় কী প্রকারে।

এই মনে করুন, আপনি যাচ্ছিলেন ঢাকা। প্যাক করতে গিয়ে দেখেন, মাত্র দুটি শার্ট ধোপার মারপিট থেকে গা বাঁচিয়ে কোনো গতিকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। ইস্টিশানে যাবার সময় কিনলেন একটি নয়া শার্ট। বাস্, আপনার হয়ে গেল। দর্শনা পৌঁছতেই পাকিস্তানী চুঙ্গিঘর হুলুধ্বনি দিয়ে দর্শনী চেয়ে উঠবে। তারপর আপনার শার্টটির গায়ে হাত বুলবে, মস্তক আঘ্রাণ করবে এবং শেষটায় ধৃতরাষ্ট্র যে-রকম ভীমসেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন ঠিক সেই রকম বুকে জড়িয়ে ধরবে।

আপনার পাঁজর কখানা পটপট করতে আরম্ভ করেছে, তবু শুকনো মুখে চিঁ-চিঁ করে বলবেন, 'ওটা তো আমি নিজের ব্যবহারের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওতে তো ট্যাক্স লাগবার কথা নয়।'

আইন তাই বলে।

হায় রে আইন! চুঙ্গিওলা বলবে, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু ওটা যদি আপনি ঢাকাতে বিক্রি করেন ?'

তর্কস্থলে ধরে নিলুম, আপনার পিতামহ তর্কবাগীশ ছিলেন তাই আপনি মূর্খের ন্যায় তর্ক তুললেন, 'পুরনো শার্টও তো ঢাকাতে বিক্রি করা যায়।'

এই করলেন ভুল। তর্কে জিতলেই যদি সংসারে জিত হত তবে সক্রাতেসকে বিষ খেতে হত না, যীশুকে ক্রুশের উপর শিব হতে হত না।

চুঙ্গিওলা জানে, জীবনের প্রধান আইন, চুপ করে থাকা, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল নয়। একেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।

কী যেন এক অজানার খেয়ানে, দীর্ঘ অ্যারস্ট্রিপের পশ্চাতের সুদূর দিক্‌চক্রবালের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'তা পারেন।'

তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে কী সব টরে-টক্কা করবে। তারপর বলবে, 'পনের টাকা।'

আপনার মনের অবস্থা আপনিই তখন জানেন—আমি আর তার কী বয়ান দেব! ব্যাপারটা যখন আপনার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল, তখন আপনি ক্ষীণতম কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ওই শার্টটার দামই তো মাত্র চার টাকা।'

চুঙ্গিওলা একখানা হলদে কাগজে চোখ বুলিয়ে নেবে। আপনি এটাতে দরখাস্ত করেছিলেন এবং নূতন শার্টটার উল্লেখ করেননি। চুঙ্গিওলার কাছে তার সরল অর্থ, আপনি এটা স্মাগ্‌ল করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পাচার করতে চেয়েছিলেন, হাতে-নাতে বেআইনী কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার জরিমানা দশ টাকা, জেলও হতে পারত, আফিং কিংবা ককেইন হলে—এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

সেই হলদে কাগজখানা অধ্যয়ন করে কোনো লাভ নেই। কারণ তার প্রথম প্রশ্ন ছিল,

১। আপনার জন্মের সময় যে কাঁচি দিয়ে নাড়ি কাটা হয়েছিল, তার সাইজ কত?

এবং শেষ প্রশ্ন,

২। আপনার মৃত্যুর সন ও তারিখ কী?

আপনি তখন শার্টটির মায়া ত্যাগ করে ঈষৎ অভিমান ভরে বললেন, 'তা হলে ওটা আপনারা রেখে দিন।'

কিন্তু ওইটি হবার জো নেই। আপনি ঘড়ি চুরি করে

পেয়েছিলেন তিন মাসের জেল। ঘড়ি ফেরত নিলেই তো আর হাকিম আপনাকে ছেড়ে দেবে না। শার্ট ফেরত দিতে চাইলেও রেহাই নেই।

তখন শার্টটা চড়বে নিলামে। এক টাকা পেলে আপনি মহা ভাগ্যবান। জরিমানাটার অবশ্য নড়নচড়ন হল না।

ঢাকা থেকে ফিরে আসবার সময় ভারতীয় চুঙ্গিওলা দেখে ফেললে আপনার নূতন পেলিকান ফাউন্টেন পেনটি। কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আপনি ভাবলেন, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই এ-কর্মে নূতন, তাই প্যাসেঞ্জারকে খামকা হয়রান করে। বিলেত-ফিলেতে বোধহয় চুঙ্গিঘর টুরিস্টদের নিছক মনোরঞ্জনার্থে। তবে শুনুন।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকা যান। এতই বেশী যাওয়া-আসা করেন যে, তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশ যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন। ওই যে রকম ঢাকার কুট্টি গাড়ওয়ান এক ভদ্রলোককে ভি-শেপের গেঞ্জি উল্টো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কর্তা আইতেছেন, না যাইতেছেন?'

তিনি নেমেছেন ইটালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। ঝাণ্ডু ব্যবসায়ী লোক। তাই চুঙ্গিঘরের সেই হলদে কাগজখানায় যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে শেষটায় লিখেছেন, 'এক টিন ভ্যাকুয়াম প্যাক্‌ড্ ভারতীয় মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।' অস্কার ওয়াইল্ড যখন মার্কিন মুল্লুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন চুঙ্গিঘর পাঁচজনের মতো তাঁকেও শুধিয়েছিল, 'এনিথিং টু ডিক্লেয়ার?' তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মগজের বাক্সটি বার কয়েক ট্যাপ করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই জিনিয়াস।' আমার পরিচিতদের ভিতর ওই ঝাণ্ডুদাই একমাত্র লোক, যিনি মাথা তো ট্যাপ করতে পারতেনই,

সঙ্গে সঙ্গে হার্টটা ট্যাপ করলেও কেউ কোনো আপত্তি করতে পারত না।

জাহাজখানা ছিল বিরাট সাইজের—ঝাণ্ডুদার বপুটি স্বচক্ষে দেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন যে, তাঁকে ভাসিয়ে রাখা যে-সে জাহাজের কর্ম নয়—তাই সেদিন চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছিল মোহনবাগান ভর্সস ফিল্ম-স্টার-টীম ম্যাচের ভিড়। ঝাণ্ডুদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল ইতালির 'কিয়ান্তি' জিনিসটি বড়ই সরেস এবং সরস। চুঙ্গিঘরের কাঠের খোঁয়াড়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল এক পাহারাওলা। তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কয়েক বোতল 'কিয়ান্তি' রাস্তার ওধারের দোকান থেকে নিয়ে আসতে। পাহারাওলা খাঁটি খানদানী লোকের সংস্পর্শে এসেছে ঠাহর করতে পেয়ে খাঁটি নিয়ে এল তিন মিনিটেই। পূর্বেই বলেছি ঝাণ্ডুদা জন্মেছিলেন ডাগড়াই হার্ট নিয়ে—জাহাজের পরিচিত অপরিচিত তথা চুঙ্গিঘরের পাহারাওলা, সেপাই, চাপরাসী, কুলী সবাইকে 'কিয়ান্তি' বিলোতে লাগলেন দরাজ দিলে। 'স্বাস্থ্যপান' আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ঝাণ্ডুদার ডাক পড়ে গেল চুঙ্গির কাউন্টারে। মাল খালাসিতে তাঁর পালা এসে গেছে। নিমন্ত্রিত রবাহূত সব্বাইকে দরাজ হাত দুখানা পাখির মত মেলে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ততক্ষণে ইচ্ছে করুন ; আমি এই এলুম বলে।' 'কিয়ান্তি' রানীকে বসিয়ে রাখা মহাপাপ।

ঝাণ্ডুদার বাক্স-প্যাটরায় এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকত যে, অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার তোয়াক্কা করে না—তাই জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। আজকের চুঙ্গিওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে-রকম বানান ভুল করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারা বদখত। টিঙটিঙে রোগা,

গাল দুটো ভাঙা, সে-গালের হাড় দুটো জোয়ালের মতো বেরিয়ে পড়েছে, চোখ দুটো গভীর গর্তের ভিতর থেকে নাকটাকে প্যাঁসনের মতো চেপে ধরেছে, নাকের তলায় টুথব্রাশের মতো হিটলারী গোঁপ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, ঝাণ্ডুদা ঝাণ্ডু লোক, তাই তিনি মানুষকে তার চেহারা থেকে যাচাই করেন না। এবারে কিন্তু তাঁকেও সেই নিয়মের ব্যভিচার করতে হল। লোকটাকে আড়চোখে দেখলেন, সন্দেহের নয়নে আমার কানে কানে বললেন, 'শেক্স্পিয়ার নাকি বলেছেন, রোগা লোককে সমঝে চলবে।' আমার বিশ্বাস, আজ যে শেক্স্পিয়ারের এত নাম-ডাক সেটা ওই দিন থেকেই শুরু হয়—কারণ ঝাণ্ডুদা আত্মনির্ভরশীল মহাজন, কারও কাছ থেকে কখনো কানাকড়ি ধার নেননি। তিনি ঋণ স্বীকার করাতে ওই দিন থেকে শেক্স্পিয়ারের যশ-পত্তন হয়।

চুঙ্গিওলা শুধালে, 'ওই টিনটার ভিতর আছে কী?'

'ইণ্ডিয়ান সুইট্স।'

'ওটা খুলুন।'

'সে কী করে হয়? ওটা আমি নিয়ে যাব লণ্ডনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে?'

চুঙ্গিওলা যে-ভাবে ঝাণ্ডুদার দিকে তাকালে তাতে যা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচশো ট্যাঢরা পিটিয়ে কোন বাদশাও ও-রকম হুকুম-জারি করতে পারতেন না।

ঝাণ্ডুদা মরিয়া হয়ে কাতর নয়নে বললেন, 'ব্রাদার, এ-টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্য লণ্ডনে—নেহাতই চিংড়ি মেয়ে। এটা খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

এবারে চুঙ্গিওলা যে-ভাবে তাকালে, তাতে আমি হাজার ট্যাঢরার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরাট-লাশ ঝাণ্ডুদা পিঁপড়ের মতো নয়ন করে সকাতরে বললেন,

'তা হলে ওটা ডাকে করে লণ্ডনে পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করব।'

আমরা একবাক্যে বললুম, 'কিন্তু তাতে তো বড্ড খরচা পড়বে। পাউণ্ড পাঁচেক—নিদেন।'

হুস্বশ্বাস ফেলেই বললেন, 'তা আর কী করা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গিওলা তাতেও রাজি হয় না। আমরাও অবাক। কারণ এ-আইন তো সকলেরই জানা।

ঝাণ্ডুদা একটুখানি দাঁত কিড়মিড় খেয়ে লোকটাকে আইনটার মর্ম প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝালেন। তার অর্থ টিনের ভিতরে বাঘ-ভাল্লুক ককেইন-হেরয়িন যা-ই থাক্, ও-মাল যখন সোজা লণ্ডনে চলে যাচ্ছে তখন তার পুণ্যভূমি ইতালি তো আর কলঙ্কিত হবে না।

আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝাণ্ডুদার প্রস্তাবটি অতিশয় সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। আমাদের দল তখন বেশ বিরাট আকার ধারণ করেছে। 'কিয়াস্তি'-রানীর সেবকের অভাব ইতালিতে কখনো হয়নি—প্রাচুর্য থাকলে পৃথিবীতেও হত না। এক ফরাসি উকিল কাইরো থেকে পোর্ট সঈদে জাহাজ ধরে—সে পর্যন্ত বিন্ ফীজে লেকচার ঝাড়লে। চুঙ্গিওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোনো ভাষাই বোঝে না।

ঝাণ্ডুদা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'শালা, তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।' তারপর ইংরেজীতে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে ওটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে ওটা সত্যি ইণ্ডিয়ান সুঈট্স কি না।'

শয়তানটা চট করে কাউণ্টারের নীচে থেকে টিন-কাটার বের করে দিলে। ফরাসী বিদ্রোহের সময় গিলোটিনের অভাব হয়নি।

ঝাণ্ডুদা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গিওলাকে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু ওই মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।'

চুঙ্গিওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাটলে আমরা যে-রকম হেসে থাকি।

ঝাণ্ডুদা টিন কাটলেন।

কী আর বেরবে? বেরল রসগোল্লা। বিয়ে-শাদিতে ঝাণ্ডুদা ভূরি ভূরি রসগোল্লা স্বহস্তে বিতরণ করেছেন—ব্রাহ্মণ-সন্তানও বটেন। কাঁটা-চামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালীদের, তারপর যাবতীয় ভারতীয়দের, তারপর আর সবাইকে, অর্থাৎ ফরাসী জর্মন ইতালীয় স্পানিয়ার্ডদের।

মাতৃভাষা বাংলাটাই বহুত তকলিফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারিনি, কাজেই গণ্ডা তিনেক ভাষায় তখন বাঙালীর বহু যুগের সাধনার ধন রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার ফটোগ্রাফ দি কী প্রকারে?

ফরাসীরা বলেছিল, 'এপাতাঁ!'

জর্মনরা, 'ক্লর্কে!'

ইতালিয়ানরা, 'ব্রাভো!'

স্প্যানিশরা, 'দেলিচজো, দেলিচজো।'

আরবরা, 'ইয়া সালাম, ইয়া সালাম।'

তামাম চুঙ্গিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। কিউবিজ্‌ম বা দাদাইজ্‌মের টেক্‌নিক দিয়েই শুধু এর ছবি আঁকা যায়। চুঙ্গিঘরের পুলিস-বরকন্দাজ, চাপরাসী-প্যাই সক্কলেরই হাতে রসগোল্লা। প্রথমে ছিল ওদের হাতে 'কিয়াস্তি', আমাদের হাতে রসগোল্লা। এক লহমায় বদলাবদলি হয়ে গেল।

আফ্রিকার এক ক্রিশ্চান নিগ্রো আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ক্রিশ্চান মিশনারিরা যখন আমাদের দেশে এসেছিলেন তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমিজমা। কিছুদিন বাদেই দেখি, ওদের হাতে জমিজমা, আমাদের হাতে বাইবেল।'

আমাদের হাতে 'কিস্তি।'

ওদিকে দেখি, ঝাণ্ডুদা আপন ভুঁড়িটি কাউন্টারের উপর চেপে ধরে চুঙ্গিওয়ালার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন—বাংলাতে—'একটা খেয়ে দেখ।' হাতে তাঁর একটি সরেস রসগোল্লা।

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হটিয়ে গম্ভীররূপ ধারণ করেছে।

ঝাণ্ডুদা নাছোড়বান্দা। সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে বললেন, 'দেখছ তো, সবাই খাচ্ছে। ককেইন নয়, আফিঙ নয়। তবু নিজেই চেখে দেখ, এ বস্তু কী।'

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা আরও পিছিয়ে নিলে। লোকটা অতি পাষণ্ড। একবারের তরে 'সরি-টরি'ও বললে না।

হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই, ঝাণ্ডুদা তামাম ভুঁড়িখানা কাউন্টারের উপর চেপে ধরে ক্যাঁক করে পাকড়ালেন চুঙ্গিওলার কলার বাঁ হাতে আর ডান হাতে থেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর। ঝাণ্ডুদার তাগ সব সময়েই অতিশয় খারাপ।

আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায়, 'শালা, তুমি খাবে না। তোমার গুষ্টি খাবে। ব্যাটা, তুমি মস্করা পেয়েছ। পই পই করে বললুম, রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, চিংড়িটা বড্ড নিরাশ হবে, তা তুমি শুনবে না'—আরও কত কী।

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছে ধুন্দুমার। চুঙ্গিওলার গলা থেকে যেটুকু মিহি আওয়াজ বেরুচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে সে পরিত্রাণের জন্য চাপরাসী থেকে আরম্ভ করে ইল্‌দুচে মুস্‌সোলিনী—মাঝখানে যত সব কনসাল, লিগেশন মিনিস্‌টার, অ্যাম্বসেডর—প্লেনিপটিনশিয়ারি—কারুরই দোহাই কাড়তে কসুর করছে না। মেরি মাতা, হোলি যিসস, পোপঠাকুর তো বটেনই।

আর চিৎকার-চেঁচামেচি হবেই না কেন? এ যে রীতিমত বে-আইনী কর্ম। সরকারী চাকুরেকে তার কর্তব্যকর্ম সমাধানে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাকে সাড়ে তিনমনী লাশ দিয়ে চেপে ধরে রসগোল্লা খাওয়াবার চেষ্টা করুন আর সেঁকো খাওয়াবারই চেষ্টা করুন, কর্মটির জন্য আকছারই জেলে যেতে হয়। ইতালিতে এর চেয়ে বহুত অল্পেই ফাঁসি হয়।

ঝাণ্ডুদার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জনাপাঁচেক তাঁকে কাউন্টার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পর্দার পর পর্দা চড়াচ্ছেন, 'খাবিনি, ও পরান আমার, খাবিনি, ব্যাটা— 'চুঙ্গিওলা ক্ষীণকণ্ঠে পুলিসকে ডাকছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আমার মাতৃভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষের ট্রাঙ্ককলে যেন কথা শুনছি। কিন্তু কোথায় পুলিস? চুঙ্গিঘরের পাইক বরকন্দাজ ডাণ্ডাবরদার, আস-সরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বেমালুম গায়েব! এ কি ভানুমতী, এ কি ইন্দ্রজাল!

দেখি, ফরাসী উকিল আকাশের দিকে দু হাত তুলে অর্ধনিমীলিত চক্ষে, গদ্‌গদ কণ্ঠে বলছে, "ধন্য পুণ্যভূমি ইতালি, ধন্য পুণ্যনগর ভেনিস্! এ-ভূমির এমনই পুণ্য যে হিদেন রসগোল্লা পর্যন্ত এখানে মিরাক্‌ল্ দেখাতে পারে। কোথায় লাগে 'মিরাক্‌ল্ অব মিলান' এর কাছে—এ যে সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা, পুলিস-মুলিস সবাইকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিলেন এখান থেকে! ওহোহো, এর নাম হবে 'মিরাক্‌ল্ অ্ব রসগোল্লা'।"

উকিল মানুষ, সোজা কথা প্যাঁচ না মেরে বলতে পারে না। তার উচ্ছ্বাসের মূল বক্তব্য, রসগোল্লার নেমকহারামি করতে চায় না ইতালীয় পুলিস-বরকন্দাজরা। তাই তারা গা-ঢাকা দিয়েছে।

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলুম। কিন্তু কে এক কাষ্ঠরসিক

বলে উঠল, 'রসগোল্লা নয়, কিয়াস্তি।' আরও দু চার পাষণ্ড তায় সায় দিলে।

ইতিমধ্যে ঝাণ্ডুদাকে বহু কষ্টে কাউন্টারের এদিকে নামানো হয়েছে। চুড়িওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লার থ্যাব্‌ড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা পুঁছিসনি ; আদালতে সাক্ষী দেবে—ইগজিবিট্ নাম্বা ওয়ান।'

ওদিকে তখন বেটিং লেগে গিয়েছে, ইতালিয়ানরা 'কিয়াস্তি' পান করে, না রসগোল্লা খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে ? কিন্তু ফৈসালা করবে কে ? তাই এ-বেটিঙে রিস্‌ক্ নেই। সবাই লেগে গিয়েছে।

কে একজন ঝাণ্ডুদাকে সদুপদেশ দিলে, 'পুলিস-টুলিস ফের এসে যাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।'

তিনি বললেন, 'না ওই যে লোকটা ফোন করছে। আসুক না ওদের বড় কর্তা।'

তিন মিনিটের ভিতর বড় কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ফরাসী উকিলের বোধহয় সবচেয়ে বড় যুক্তি ঘুষ। এক বোতল 'কিয়াস্তি' নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝাণ্ডুদা বাধা দিয়ে বললেন, 'নো।'

তার পর বড় সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিন্নোর, বিফো ইউ প্রসীড, অর্থাৎ কিনা ময়না তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি ইণ্ডিয়ান সুঈট্‌স্ চেখে দেখুন।' বলে নিজে মুখে তুললেন একটি। আমাদের সবাইকে অরেক প্রস্থ বিতরণ করলেন।

বড় কর্তা হয়তো অনেক রকমের ঘুষ খেয়ে ওকিবহাল এবং তালেবর। কিংবা হয়তো কখনো ঘুষ খাননি। 'না-বিইয়ে কানাইয়ের মা' যখন হওয়া যায় এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র যখন এ-

প্রবাদটি ব্যবহার করে গেছেন তখন 'ঘুষ না-খেয়েও দারোগা' তো হওয়া যেতে পারে।

বড় কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের। আবার।

এবারে ঝাণ্ডুদা বললেন, 'এক ফোঁটা কিয়াস্তি?'

কাদম্বিনীর ন্যায় গম্ভীর নিনাদে উত্তর এল, 'না। রসগোল্লা।'

টিন তখন ভোঁ-ভোঁ।

চুঙ্গিওলা তার ফরিয়াদ জানালে।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ তো বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কী করে?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী করতে? আরো রসগোল্লা নিয়ে আসুন।' আমরা সুড় সুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম, বড় কর্তা চুঙ্গিওলাকে বলছেন, 'তুমিও তো একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর ওই সরেস মাল চেখে দেখলে না?'

'কিয়াস্তি' না রসগোল্লা সে-বেটের সমাধান হল।

ইতালির প্রখ্যাতা মহিলা-কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন,

'ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে নিরাশার কালিমায়।'

আমিও তাঁর স্মরণে গাইলুম,

রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে হায়!
ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়!!

[ধূপছায়া]

বেদে

ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর মিশরে চাকরি করার পর ইংরেজ রাস্‌ল্‌ পাশা (পাশা খেতাবটি তিনি মিশরীয় সরকারের কাছ থেকে পান) একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছেন। সা'দ জগলুল পাশা থেকে আরম্ভ করে বহু বাঘ বহুৎ চিড়িয়ার সঙ্গে তাঁর বিস্তর যোগাযোগের ফলে এই কেতাবখানি লেখা হয়েছে।

এমনকি বেদেরাও এ বইয়ে বাদ পড়েনি। রাস্‌ল্‌ পাশার মতে মিশরের বেদেরা আসলে ভারতীয়। শুধু তাই নয়, রাস্‌ল্‌ পাশা পৃথিবীর আর সব পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন পৃথিবীর সব বেদেরই ভাষা নাকি আসলে ভারতীয়—তা সে ইয়োরোপীয় বেদেই হোক্ আর চীনে বেদেই হোক্।

পণ্ডিত নই, তাই চট্ করে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ইয়োরোপীয় বেদেরা ফর্সায় প্রায় ইংরেজের শামিল, সিংহলের বেদে ঘনশ্যাম। আচার-ব্যবহারেও বিস্তর পার্থক্য, বহুৎ ফারাক। আরবিস্থানের বেদেরা কথায় কথায় ছোরা বের করে, জর্মনীর বেদেরা ঘুষি ওচায় বটে, কিন্তু শেষটায় বখেড়ার ফৈসালা হয় বিয়ারের বোতল টেনে। চীন দেশের বেদেরা নাকি রূপালি ঝরণাতলায় সোনালি চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চুকুস চুকুস করে সবুজ চা চাখে। তবু আজ স্বীকার করি গুণীরাই হক্ কথা বলেছেন।

* * *

আমার বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ। আজ যেখানে জর্মনীর রাজধানী, সেই সাদা-মাটা বন্ন্ (Bonn) শহরে আমি তখন কলেজ যাই। এগারোটার ঝোঁকে কলেজের পাশের কাফেতে বসে এক পাত্র কফি খাই। ও সময়টায় বনের মত আধা-ঘুমন্ত পুরীর কাফেতে খদ্দেরের ঝামেলা লাগে না। খদ্দের বলতে নিতান্ত আমারই মতো দু'একটি কফি-কাতর প্রাণী।

সেদিনও তাই। আমি এক কোণে কফি সাজ করে উঠি-উঠি করছি, এমন সময় অন্য কোণের কাউণ্টারে, আমার দিকে পিছন ফিরে, দাঁড়াল এসে এক বেদেনী। গোলাপী স্কার্ট, বেগুনী ব্লাউজ, লাল-নীলে ডোরা-কাটা স্কার্ফ, মিশকালো খোঁপা-বাঁধা চুল। কেক্ আর কফির গুঁড়ো কিনতে এসেছে। সওদা শেষ হয়ে গেলে পর যখন সে ঘুরে দাঁড়াল তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার উপর। প্রথমটায় থ হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাট প্যাট করে। তারপর কি এক বিজাতীয় ভাষায় চীৎকার করে সোল্লাসে এগিয়ে এল আমার দিকে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় সর্বমুখ টমাটোর মতো লাল করে অনর্গল বকে যেতে লাগল সেই 'যাবনিক' ভাষায়। সে ভাষা আমার চেনা-অচেনা কোনো ভাষারই চৌহদ্দি মাড়ায় না, কিন্তু শোনালো—তারই মুখের মতো—মিষ্টি।

আমি জর্মনে বললুম, 'আমি তো আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।' মেয়েটি মুখ করল আরো লাল। বুঝলুম, চটেছে। ফের চালাল সেই তুবড়ী বাজী—সেই বিজাতীয় বুলিতে। কিছুতেই জর্মন বলতে রাজী হয় না।

আমি কাতর হয়ে কাফের মালিককে বললুম, 'একে বুঝিয়ে বলুন না, আমি ভারতীয়; এর ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

আমার সকরুণ নিবেদনটা শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়েটা হুঙ্কার দিয়ে কাফেওয়ালাকে পরিষ্কার জর্মনে বলল, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। আমরা বেদে, ভারতবর্ষ আমাদের আদিম ভূমি। এও ভারতীয়। আমার জাত-ভাই। ভদ্রলোক সেজেছে, তাই আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না।'

আমি আর কি বলব? পণ্ডিতেরাও তো এই মতই পোষণ করেন। তবু বললুম, 'কিন্তু সত্যি বলছি, আমি আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

চোখে-মুখে—এমনকি আমার মনে হল চুলে পর্যন্ত—ঘেন্না মেখে

মেয়েটা গটগট করে কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বোকা বনে তাকিয়ে রইলুম।

কয়েক মিনিট পরে জানলার দিকে নজর যেতে দেখি সেই মেয়েটি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কফির দাম পূর্বেই চুকিয়ে দিয়েছিলুম—চুপ করে বেরিয়ে পড়ে তার মুখোমুখি হলুম।

ধবধবে দাঁতে হাসির ঝিলিক লাগিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে বললো—ছুত্তোর ছাই আবার সেই বিজাতীয় ভাষায়—কি বললো, খোদায় মালুম। গড় গড় করে চোখে-মুখে হাসি মেখে, সুডৌল দু'খানি বাহু দুলিয়ে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে।

আমি আবার জর্মনে বললুম, 'সত্যি ফ্রলাইন (কুমারী), আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছি নে।' কেউটে সাপের মতো ফণা তুলে যেন আমাকে ছোবল মারতে এল। আমি তড়াক করে তিন কদম পিছিয়ে গেলুম।

হঠাৎ মেয়েটা কি যেন ভেবে নিয়ে আবার হাসিমুখে বলল,—যাক্ বাঁচাল, এবার জর্মনে—'সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু পাগলামি থাকে, তোমার বুঝি মাতৃভাষায় কথা না বলার? তা আমি সেটা সয়ে নিলুম। কিন্তু কেন এ স্নবারি, আপন ভাষাকে অবহেলা, কাফের লোকের সামনে আপন জনকে অস্বীকার করা? তাই তো তোমাকে বাইরে ডেকে আনলুম।'

আমি বললুম, 'তোমার আপন জন হতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমি তো তা নই।' ফের ফণা তুলতে গিয়ে নিজেকে চেপে নিয়ে বলল, 'তোমার আপন জন নই আমি? দেখো দিকিনি তোমার রঙ আর আমার রঙ মিলিয়ে—একই বাদামী না? হাঁ, আমার একটু সোনালী বটে—তা সে আমি রোদবৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি করি বলে। দেখো দিকিনি চুলের রঙ—মিশকালো, ঢেউখেলানো। নিজের চোখ দেখনি কখনো আয়না দিয়ে?—আমার চোখের রঙ তোমারই মতো কালো। আর সব জর্মনদের দিকে তাকিয়ে দেখো, হাবা-গবার দল, শ্বেত কুষ্ঠের মত সাদা, মাগো!'

আমি চুপ। বলল, 'বুঝতে পেরেছি, বাপু, বুঝতে পেরেছি; বাপ তোমার দু'পয়সা রেখে গিয়েছে—হঠাৎ-নবাব হয়েছ। এখন আর বেদে বলে পরিচয় দিতে চাও না। হাতে আবার খাতাপত্র—কলেজ যাও বুঝি? ভদ্রলোক সাজার শখ চেপেছে, না?'

আমি বললুম, 'ফ্রলাইন, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার সাতপুরুষ লেখাপড়া করেছে, আমিও তাই করছি। ভদ্রলোক সাজা না-সাজার কোনো কথাই উঠছে না।' মেয়েটি এমনভাবে তাকালো যার সোজা অর্থ 'গাঁজা গুল।' জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভারতীয় নও?'

আমি বললুম, 'আলবৎ!'

আনন্দের হাসি হেসে বলল, 'ভারতীয়েরা সব বেদে।'

আমি বললুম, 'সুন্দরী, তোমরা ভারতবর্ষ ছেড়েছ হাজার, দু'হাজার বছর কিংবা তারও পূর্বে। বাদবাকী ভারতীয়রা এখনো গেরস্থালী করে।'

কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলল, 'তোমার সঙ্গে আর কাঁহাতক খাম্‌কা তর্ক করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে। আমাদের সার্কাসের গাড়ি শহরের বাইরে রেখে এসেছি। বাবা, মা সেখানে। তোমাকে পেলে ভারি খুশী হবেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করো। তখন বুঝবে ঠ্যালা কারে কয়। বাবা সব জানে। কাচের গোলার দিকে তাকিয়ে তোমাকে সব বাৎলে দেবে।'

অনেকক্ষণ ধরে এ রকম ধারা কথা হয়েছিল। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, আমি বেদে নই, স্নব নই,সাদা-মাটা ভারতীয়।

* * * *

এ-কথাটা কিন্তু সেদিন সাফ সাফ বুঝে গেলুম, দু'হাজার কিংবা তার বেশি বছর ধরে যাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তারা যদি বিদেশে-বিভূঁইয়ে দেখামাত্র আমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি আমাদের আপন জন, তখন কি করে বুক ঠুকে বলি—যদিও জানি, আজ আমাদের ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা—যে ওরা ভারতীয় নয়??'

[পঞ্চতন্ত্র]

পুলিনবিহারী

ছেলেবেলায় যে-রকম গলাজল ঠেলে ঠেলে খাল পেরতুম, ঠিক সেই রকম পুবের হাওয়া ঠেলে ঠেলে সমুদ্রপারে পোঁছতে হল।

অন্য দিন সমুদ্র থেকে থেকে এক একখানা করে ঢেউ পাঠায়। সে অনেক দূর থেকে পাঁয়তারা কষে কষে দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে কোমর বেঁধে শেষটায় পাড়ে এসে আছাড় খায়। আজ বিশাল আয়োজন। এক সঙ্গে অনেকগুলো পালোয়ান, একজনের পিছনে আরেকজন পাঁয়তারা কষে কষে আসছে। তারপর পাড়ে এসে হুটোপুটি—দোস্ত-দুশমনের সনাক্ত হওয়ার গোলমালে আপোসে হানাহানি। শেষটায় কোলাকুলিতে মিলে গিয়ে ছোট ছোট দ'য়ে মজে যাওয়া।

সমস্ত আকাশ জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন মেঘ—এলোমেলো, যেন আর্টিস্টের পেলেটে এলোপাতাড়ি হেথা হোথায় এবড়ো-খেবড়ো রঙ। কিন্তু তবু সবসুদ্ধ মিলে গিয়ে যেন কেমন একটা সামঞ্জস্য রয়েছে—মনে হয় না, অদলবদল করলে কিছু ফেরফার হবে।

বসেছিলুম জলের আর জেলেপাড়ার মাঝখানে। পিছনে নারকেল বন—তাতে আগুন লাগিয়ে সূর্য প্রচণ্ড মহিমায় অস্ত গেলেন—গরবিনীর সতীদাহ। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ে ভেসে-আসা পোনা মাছ লুব্ধ কাকের কর্কশ চিৎকার, নারকেল গাছের উস্কোখুস্কো মাথার অবিশ্রান্ত আছাড় খাওয়া—অশান্তির চরম আয়োজন।

তাই বোধ করি একটি জেলে-ডিঙিও জলে নামেনি। লম্বা সারি বেঁধে কাত হয়ে পড়ে আছে ডাঙ্গায়, যেন ডিসেকশান টেবিলের সারি সারি মড়া। সমস্ত তীরে মাত্র দু'টি জেলে সুতো ফেলে গভীর ধৈর্যে মাছ ধরার চেষ্টাতে আছে। জোয়ারের জোর

টোপ ধুয়ে নিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে, নূতন টোপ সাজাতে হয়—তবু তাদের ধৈর্য অসীম। বাদবাকি ছেলেবুড়ো বালুপাড়ে বসে আছে—এত মেহন্নত করে লাভ নগণ্য।

অন্ধকার নামল অতি ধীরে ধীরে। পাটরাণী তো চিতেয় উঠলেন লাল টকটক হয়ে। আকাশ সিঁদুর মুছলেন অতি অনিচ্ছায়—এমেঘে ওমেঘে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। সকলের শেষ পান্না জল লালে-নীলে মেশা বেগুনি ঝিলিকটুকু মুছে ফেলে আস্তে আস্তে শ্যাওলা সবুজ হলেন।

কোনদিন আবার রঙের রাজা মাত্র তিনটি রঙ নিয়ে খেলায় বসেন। সমুদ্র আর পূবের আকাশকে দেন কালো-নীল, পশ্চিম আকাশকে একটুখানি গোলাপী আর মাথার উপর বাকী সমস্ত আকাশ পায় ফিকে ফিরোজা। যতক্ষণ না কালো পর্দায় সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়, ততক্ষণ শুধু এই তিন রঙের ফিকে ঘন'র খেলা। তাতে কতই না কারচুপি। এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগল, ওদিকে তেমনি গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরিষ রঙের আমেজ নিতে আরম্ভ করল। মাঝখানের আকাশ ফিরোজাতে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিন স্বর নিয়ে খেলা। আর তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুত লয়ে রঙ বদলান তবে পূবও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জনে যেন তানপুরোর আমেজ।

সমে এসে যখন পূব-পশ্চিম মিলে গেল অন্ধকারে, তখন তানপুরোর রেশটুকুমাত্র রইল সাগরপারে। মশালচি এসে আসমানের ফরাশে এখানে-ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেল। এবারে রাত্রির মুশায়েরা (কবি সঙ্গম) বসবে। নারকেল মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নূপুর বাজিয়ে নাচবে, পূবের বাতাস সভার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে। তারপর দূর

সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে মাতাল চাঁদ উঠবেন ধীরে ধীরে গা টেনে টেনে, একটুখানি কাত হয়ে। মোসাহেবদের মুখে হাসি ফুটবে—অন্ধকারে যারা গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল, তাদের সবাইকে তখন চেনা যাবে।

* * * *

সমুদ্রপারে, নীল গম্বুজের তলে, বিশ্বসংসারের ঠিক মাঝখানে যখন বসি তখন মনে হয়, যেন সার্কাসের গোল তাঁবুর মাঝখানে আমাকে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে আর চতুর্দিকে গ্যালারিতে লাল হলদে সোনালি মেঘের পাল অপেক্ষা করছে আমি কখন বাঁদর-নাচ আরম্ভ করব।

ভারি অস্বস্তি বোধ হয়।

এই সব রঙচঙা মেঘের দল অত্যন্ত অভদ্র চার-আনী দর্শক।

হঠাৎ একজন যেন হেসে হেসে লাল হয়ে ফেটে পড়ার যোগাড় করে পাশের আরেক চার-আনীকে কি বলে। সেও তখন লাল হয়ে উঠে তার পাশের জনকে সে কথা বলে—দেখতে দেখতে সমস্ত তাঁবুর সবাই লাল হয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই হাসির লুটোপুটি।

লুকোবার জায়গা নেই।

বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলুম বিরক্ত হয়ে।

কিন্তু তবু সেই মাঝখানেই। তবু যেন তার চার-আনীর দলকে সঙ্গে নিয়ে আমারই চতুর্দিকে ঠিক তেমনি ঘিরে দাঁড়াতে চায়।

বিশ্বসংসার আমাকে বাঁদর-নাচ না নাচিয়ে ছাড়বে না!

* * * *

দু'জোড়া কপোত-কপোতী নিত্যি নিত্যি দেখতে পাই। একে অন্যকে পেয়েই তারা খুশী। সে খুশী তাদের বসাতে, চলাতে, তাদের হাত-পা নাড়া-চাড়াতে যেন উপছে পড়ে। এক জোড়া সমুদ্রের পারে পারে পা-চারী করে—ছেলেটা যেমন ছ'ফুট ঢ্যাঙা, মেয়েটিও তেমনি পাঁচ ফুটের কমতি। ছেলেটার কর্ম, মেয়েটার

দুই জুতো এক ফিতেতে বেঁধে কড়ে আঙুলে ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলা; মেয়েটা শুধু-পায়ে ভিজে বালির উপর দিয়ে চড়ুই পাখীর মতো লাফ দিয়ে দিয়ে নেচে যায়—ঢেউ তাড়া করে এলে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে যায়, চলে গেলে বেঁকে গিয়ে জলের দিকে এগোয়। খাটো করে পরা ফ্রক, পা দু'টি সুডৌল ঘন শ্যামবর্ণ। কথাবার্তা কখনো কইতে শুনিনি—একে অন্যের দিকে তাকায় পর্যন্ত না। এগুতে এগুতে তারা আড়ায়ার পর্যন্ত চলে যায়, তবু দূর থেকেও তাদের চেনা যায়—ঢ্যাঙা আর বেঁটে। ঢ্যাঙা নাক-বরাবর সোজা চলেছে, মেয়েটি এঁকে বেঁকে।

আরেক জোড়া সমস্তক্ষণ বসে থাকে ডাঙায়-তোলা একটা নৌকোর আড়ালে কুণ্ডলী-পাকানো জালের বস্তায় হেলান দিয়ে। সমুদ্রের দিকে তাকায় না, পিছনের সূর্যাস্তও জালের বস্তায় ঢাকা পড়ে। সমস্তক্ষণ গুজুর গুজুর। কখনো খুব পাশাপাশি ঘেঁষে বসে, ছেলেটা মেয়েটির কোলে হাত রেখে, কখনো দেখি মেয়েটির হাত ছেলেটির কোমর জড়িয়ে। বেড়ায় না, ডাইনে বাঁয়ে তাকায় না। রাত ঘনিয়ে এলে একই সাইকেল চড়ে উত্তর দিকে চলে যায়।

* * * *

দূর থেকে রোষে-ক্রোধে তর্জন-গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে অবশেষে এ কী বিগলিত আত্মনিবেদন!

তাণ্ডবের ডমরু বাজিয়ে, ছিন্নমস্তার আত্মঘাতে নিজেকে বারে বারে দ্বিখণ্ডিত করে, পাড়ে এসে অবশেষে লক্ষ কিঙ্কিণীর এ কী মৃদু শান্ত নূপুর-গুঞ্জরণ!

সূর্যোদয়ের লোহিতোজ্জ্বল রক্ত-টিপ, দ্বিপ্রহরের অতি ঘন নীলাম্বরি, সন্ধ্যার গৈরিক পট্টবাস, সর্বশেষে অন্ধকারে সর্বস্ব ত্যাগ করে কার অভিসারে সিন্ধুপারে মৃদুপদসঞ্চারণ!!

[পঞ্চতন্ত্র]

'কলচর'

'পরশুরামের' কেদার চাটুজ্যেকে বাঘা তাড়া করেছে, ভূত ভয় দেখিয়েছে, হনুমান দাঁত খিচিয়েছে, পুলিস কোর্টের উকীল জেরা করেছে, তবু তিনি ভয় পাননি কিন্তু শেষটায় এক আমেরিকান মেম সায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান। কেদার চাটুজ্যের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাকে সবিনয় বলতে হবে তাঁর তুলনায় আমি দেশভ্রমণ করেছি অনেক বেশী, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়েছে আরো অনেক বেশী ভূত, অভূত, নাৎসী, কম্যুনিস্ট, মিশনারী, কলাবৎ, সম্পাদক, দারোয়ান ইত্যাদি কিন্তু তবু যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ কাটতে হয়, তবে বলব আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছি 'কলচরের' সামনে।

বাঙলা দেশে 'কলচর' আছে কিনা জানি নে; যদি বা থাকে তবে আমি নিজে বাঙালী বলে সে জিনিস এড়িয়ে যাবার অন্ধিসন্ধি জানি। কিন্তু বিদেশ-বিভূঁইয়ে হঠাৎ বেমক্কা এ জিনিসের মুখোমুখি হয়ে পড়লে যে কি দারুণ নাভিশ্বাস ওঠে তার বর্ণনা দেবার মতো ভাষা এবং শৈলী আমার পেটে নেই।

পশ্চিম ভারতে একবার এই 'কলচর' অথবা 'কলচরড্' সমাজের পাল্লায় পড়েছিলুম। তার মর্মন্তুদ কাহিনী নিবেদন করছি।

এক যুবতীর সঙ্গে কোনো এক চায়ের মজলিসে আলাপ হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। সুন্দরী রমণী। প্রত্যাখ্যান করি কি প্রকারে? তখন যদি জানতুম তিনি আমাকে বাঙালী অতএব 'কলচরড্' ঠাউরে নিমন্ত্রণ করেছেন তাহলে ধর্ম সাক্ষী আমি কেটে পড়তুম। কারণ, আমি 'কলচরড্' নই, এবং পূর্বেই বলেছি ও-জিনিসটাকে আমি বড্ড ডরাই।

সুন্দরী মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই বাড়ি খুঁজে বের করার মেহন্নত থেকে রেহাই পেলুম। গাড়ি এসে এক

বিপুলায়তন বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়ি বলা হয়তো ভুল হল। সংস্কৃতে খুব সম্ভব এই বস্তুকেই 'প্রাসাদ' বলে।

কিন্তু সে কী অদ্ভুত বিভীষিকা। সাঁচীর স্তূপ, অজন্তার প্রবেশ-দ্বার, অশোকের স্তম্ভ, মাদুরার মণ্ডপ, তাজের জালির কাজ, জামী মসজিদের আরাবেস্‌ক্ ভারতবর্ষের তাবৎ সৌন্দর্য নিদর্শন সেখানে যেন এক বিরাট তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়েছে। যে ফিরিস্তিটা দিলুম সেটা পূর্ণাবয়ব কি না জানি নে এবং এসব স্থাপত্য কলার মর্ম এ অধম জানে না সেটাও সে সবিনয় স্বীকার করে নিচ্ছে। আমি সাহিত্য নিয়ে ঈষৎ নাড়াচাড়া করি, কারণ ঐ একমাত্র জিনিসই মাস্টার অধ্যাপকেরা আমাকে স্কুল-কলেজে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে কিছুটা শিখিয়েছেন। সাহিত্যের দৃষ্টিবিন্দু দিয়ে তাই যদি সে-প্রাসাদের বর্ণনা দিই তবে বলতে হবে, আমি যেন এক কবিতার সামনে দাঁড়ালুম যার প্রথম লাইন চর্যাপদী, দ্বিতীয় লাইন চণ্ডীদাসী, তৃতীয় লাইন মাইকেলী, চতুর্থ লাইন রঙ্গলালী, পঞ্চম লাইন ঠাকুরী এবং শেষ লাইন নজরুলী। জানি, আজ যদি কেউ এই সব ক'জন মহাজনের শৈলী এবং ভাষা আয়ত্ত ক'রে কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন তবে তিনি কি কালিদাস, কি সেক্সপীয়ার, কি গ্যোটে সর্বযুগের সর্ব কবিরাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু আমি যে বিভীষিকার সামনে দাঁড়ালুম সে তো তা নয়। এ যেন কেউ কাঁচি দিয়ে নানান কবির লেখা নিয়ে হেথা থেকে দু'ছত্র হোথা থেকে তিন পংক্তি কেটে গঁদ দিয়ে জুড়ে দিয়ে বলছে, 'পশ্য, পশ্য, কী অপূর্ব কবিতা; এ-কবিতা মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো কবির লেখাকে হার মানায় কারণ এ-কবিতা দুনিয়ার তাবৎ কবির বারোয়ারী চাঁদা দিয়ে গড়া। বাঁদর হারালেও এখানে খুঁজে পাবে।'

তখনো পালাবার পথ ছিল, কিন্তু সুন্দরীর—যাক্‌গে। না পালাবার অন্য আরেকটা কারণও মজুদ ছিল। এ বিভীষিকা

দেখে গাঙ্গুলী মশাই অথবা ক্রামরিশ বীবী পালাবেন, কিন্তু আমি তো 'কলচরড্' নই, আমি পালাব কেন?

ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি লিফ্‌টের সামনে। অপূর্ব সে খাঁচা। এতদিন বাদে আজ আর মনে নেই কোন্ কোন্ শৈলীর ঘুষোঘুষিতে (কোলাকুলিতে নয়) সে লিফ্‌টের চারখানা কাঠের পাট নির্মিত ছিল। প্রত্যেক পাটে অতি সূক্ষ্ম নাজুক, মোলায়েম দারুশিল্প। জয়পুরে মিনা যেন সূক্ষ্মতায় তার কাছে হার মানে।

ভিতরে ঢুকলুম। তখন লক্ষ্য করলুম লিফ্‌টবয় দরজাখানা বন্ধ করল অতিশয় সন্তর্পণে—পাছে কাঠের চিকণ কাজে কোনো জখম হয়। কিন্তু ফল হল এই যে লিফ্‌ট আর উড্ডীয়মান হতে চায় না। বয় ধীরে ধীরে চাপ বাড়ায় কিন্তু লিফ্‌ট নড়তে চায় না। তারপর হুস করে বলা নেই, কওয়া নেই লিফ্‌ট উপরের দিকে চলল, পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ জিন লাগালে সে যে-রকম ধারা আচমকা লম্ফ দিয়ে ওঠে।

তারপর দোতলায় নামবার কথা—লিফ্‌ট সেখানে থামে না। থামলো গিয়ে আচম্বিতে দোতলা আর তেতলার মধ্যিখানে।

একে তো গাঁয়ের ছেলে, বয়স হওয়ার পর শহরে এসে প্রথম লিফ্‌ট দেখেছি এবং তখনকার দিনে ধুতিকুর্তা পরা থাকলে লিফ্‌ট চড়তে দিত না বলে এ ফাঁড়া থেকে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি, তার উপর জানি দড়াম করে দরজা বন্ধ না করলে ভালো লিফ্‌টও নড়তে চায় না এবং তার উপর দেখি এই ছোকরা চাকরি যাবার ভয়ে দরজার উপর জোর লাগাতেও রাজী হয় না। এই 'কলচরড্' লিফ্‌টটাকে জখম চোটের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রাণটা বলি দিতে হবে নাকি?

আমি তখন হন্যে হয়ে উঠেছি। ধমক দিয়ে বললুম, 'দরজা জোরে বন্ধ করো।'

সে করে না। এই মাগ্‌গীর বাজারে প্রাণের চেয়ে চাকরি

বড়। প্রাণ জিনিসটা জন্মে জন্মে বিনা খরচে, বিনা মেহন্নতে পাওয়া যায়; কিন্তু চাকরির জন্য বিস্তর বেদরদ বেইজ্জতী সইতে হয়।

আমি আর কি করি? ধাক্কা দিয়ে ছোঁড়াটাকে পথ থেকে সরিয়ে দরজায় দিলুম বিপুল এক ধাক্কা। হুস করে লিফ্‌ট্‌ উঠে গেল তেতলায়। আমি দরজা খুলে নাবতে যাচ্ছি, বয় চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি যাবেন দোতলায়, তেতলায় নয়।' আমি বললুম, 'তুমি যাও চুলোয়।' ছোকরা বাঙলা বোঝে না।

তেতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামলুম দোতলায়।

ততক্ষণে লিফ্‌টের ধড়াধড় শব্দ শুনে সুন্দরীর ভাই-বেরাদর দু'একজন সিঁড়ির কাছে জমায়েত হয়ে গিয়েছেন। আমি ছোকরার চাকরি বাঁচাবার জন্য নিজের অপরাধ স্বীকার করলুম।

ওঁরা যে-রকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে মনে হলো আমি যেন তাজমহলের উপর এটম বম মেরেছি অথবা ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের গলা কেটে ফেলেছি।

'কলচরড্' নই, তাই বলতে পারবো না, 'কলচর' দেশ-কাল-পাত্র মেনে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় কি না। কিন্তু লিফ্‌টের ভিতরকার 'কলচর'কে সম্মান দেখাতে গিয়ে আমি প্রাণটা দিতে রাজী নই। তাই বলছিলুম, আমি 'কলচর' জিনিসটাকে ডরাই॥

[পঞ্চতন্ত্র]

শুধায়োনা ঘড়িটারে কটা বাজে এইবারে
লাভ কিবা ভাই
বউ বকে দশটায় যে বকাটা তিনটায়
তফাৎ তো নাই।

বড় দিন

বাইবেলে বলা হয়েছে পুব থেকে তিন জন ঋষি প্যালেস্টাইনের জুডেয়া প্রদেশের রাজা হেরোডের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহুদিদের নবীন রাজা কোথায় জন্ম নিয়েছেন? আমরা পূর্বাকাশে তাঁর তারা দেখতে পেয়ে তাঁকে পুজো করতে এসেছি।'

সেই তারা-ই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বেৎলেহেম—যেখানে প্রভু যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। মা মেরী আর তাঁর বাগদত্ত যোসেফ পান্থশালায় স্থান পাননি বলে আশ্রয় নিয়েছিলেন পান্থশালার পশ্বালয়ে। তারই মাঝখানে কুমারী মেরী জন্ম দিলেন এ জগতের নবজন্মদাতা প্রভু যীশুকে।

দেবদূতরা মাঠে গিয়ে রাখাল ছেলেদের সুসংবাদ দিলেন—প্রভু যীশু, ইহুদিদের রাজা জন্ম নিয়েছেন। তারাও এসে দেখে, গাধা-খচ্চর, খড়-বিচুলির মাঝখানে মা-জননীর কোলে শুয়ে আছেন রাজাধিরাজ।

এই ছবিটি এঁকেছেন যুগ যুগ ধরে বহু শিল্পী, বহু কবি, বহু চিত্রকর। নিরাশ্রয়ের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন বিশ্বজনের আশ্রয়-দাতা।

*　　　*　　　*

বাইরের থেকে গম্ভীর গুঞ্জরণ শুনে মনে হল বিদ্যালয়ের ভিতর বুঝি তরুণ সাধকেরা বিদ্যাভ্যাস করছেন। জানা ছিল টোল-মাদ্রাসা নয়, তাই ভিতরে ঢুকে ভিরমি যাইনি।

ক'শ নারী পুরুষ ছিলেন আদম-শুমারী করে দেখিনি। পুরুষদের সবাই পরে এসেছেন ইভ্‌নিং ড্রেস। কালো বনাতের চোস্ত পাতলুন—তার দু'দিকে সিল্কের চকচকে দু' ফালি পট্টি; কচ্ছপের খোলের মতো শক্ত শার্ট, কোণ-ভাঙা কলার—ধবধবে

সাদা; বনাতের ওয়েস্‌ট্ কোট আর কোটের লেপেলে সেই সিল্কের চকচকে ট্যারচা পট্টি; কালো বো ফুটে উঠেছে সাদা শার্ট কলারের উপর—যেন শ্বেত সরোবরে কৃষ্ণা কমলিনী। পায়ে কালো বার্নিশের জুতো—হাতে গেলাস।

কিংবা শার্ক-স্কিনের ধবধবে সাদা মসৃণ পাতলুন। গায়ে গলাবন্ধ 'প্রিন্‌স্ কোট'—সিক্‌স্-সিলিণ্ডারী অর্থাৎ ছ-বোতামওয়ালা। কারো বোতাম হাইদ্রাবাদী চৌকো, কারো বা বিদরী গোল—কালোর উপরে সাদা কাজ। একজনের বোতামগুলো দেখলুম খাস জাহাঙ্গীর-শাহী মোহরের।—হাতে গেলাস।

তারি মধ্যিখানে বসে আছেন এক খাঁটি বাঙালী নটবর। সে কী মোলায়েম মিহি চুনট-করা শান্তিপুরে ঘি রঙের মেরিনার পাঞ্জাবি আর তার উপরে আড়করা কালো কাশ্মীরী শালে সোনালী জরির কাজ। হীরের আংটি বোতাম ম্যাচ করা, আর মাথায় যা চুল তাকে চুল না বলে কৃষ্ণমুকুট বললেই সে তাজমহলের কদর দেখানো হয়। পায়ে পাম্প—হাতে গেলাস।

'দেশসেবক'ও দু' একজন ছিলেন। গায়ে খদ্দর—হাতে? না, হাতে কিচ্ছু না। আমি আবার সব সময় ভালো করে দেখতে পাই নে—বয়স হয়েছে।

কিন্তু এ সব নস্যি। দেখতে হয় মেয়েদের। ব্যাটাছেলেরা যখন মনস্থির করে ফেলেছে, সাঁঝের ঝোঁকে সাদা কালো ভিন্ন অন্য রঙ নিয়ে খেলা দেখাবে না তখন এই দুই স্বর সা আর রে দিয়ে কি ভেল্কিই বা খেলবে?

হোথায় দেখো, আহা-হা-হা। দুধের উপর গোলাপী দিয়ে ময়ূরকণ্ঠী-বাঙ্গালোরী শাড়ি? জরির আঁচল। আর সেই জরির আঁচল দিয়ে ব্লাউজের হাতা। ব্লাউজের বাদ-বাকী দেখা যাচ্ছে না, আছে কি নেই তাই বলতে পারব না। বোধহয় নেই—না থাকাতেই সৌন্দর্য বেশি। ফরাসীরা কি এ জিনিসকেই বলে

'দেকোল্‌তে'? বুক-পিঠ-কাটা মেম সায়েবদের ইভ্‌নিং ফ্রক এর কাছে লজ্‌জায় জড়সড়।

ডান হাতে কমুই অবধি সোনার চুড়ি—বাঁ হাতে কবজের মতো বাঁধা হোমিওপ্যাথিক রিস্টওয়াচ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিনারের কত বাকি? কটা বেজেছে?' বলেই লজ্‌জা পেলেন, কারণ ভুলে গিয়েছিলেন নিজের হাতেই বাঁধা রয়েছে ঘড়ি। কিন্তু লাল হলেন না, কারণ রুজ আগে-ভাগেই এত লাল করে রেখেছে যে, আর লাল হবার 'পার্কিঙ-প্লেস' নেই।

হাতে? যান মশাই,—আমার অতশত মনে নেই। হালকা সবুজ জর্জেটের সঙ্গে রক্ত-রাঙা ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বাঁ হাতে ঝুলছে ব্যাগ, কিন্তু ব্যাগের স্ট্র্যাপটার রঙ মেলানো রয়েছে রক্ত-রাঙা ব্লাউজের সঙ্গে এবং তাকে ফের মেলানো হয়েছে স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে। আর কোথায় কোথায় মিল অমিল আছে দেখবার পূর্বেই তিনি সরে পড়লেন। ডান হাতে কিছু ছিল? কী মুশকিল!

আরে! মারোয়াড়ী ভদ্রলোকেরা কি পার্টিতে মহিলাদের আনতে শুরু করেছেন? কবে থেকে জানতুম না তো।

একদম খাঁটি মারোয়াড়ী শাড়ি। টকটকে লাল রঙ—ছোটো ছোটো বোট্টাদার। বেনারসী-ব্যাপার। সেই কাপড় দিয়েই ব্লাউজ—জরির বোট্টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সকাল বেলা হাওড়ায় নামলে ব্রিজ পেরিয়ে হামেশাই এ রকম শাড়ি দেখতে পাই—মহিলারা স্নান সেরে ফিরছেন। সেই শাড়ি এখানে? হাতে আবার লাইফ বেল্ট সাইজের কাঁকন।

মাথার দিকে চেয়ে দেখি, না, ইনি মারোয়াড়ী নন। চুলটি গুছিয়েছেন একদম পাকাপোক্ত গ্রেতা গার্বো স্টাইলে। কাঁধের উপর নেতিয়ে পড়ে ডগার দিকে একটুখানি ঢেউখেলানো। শুধু চুলটি দেখলে তামা-তুলসী স্পর্শ করে বলতুম, জীবনের শেষ স্বপ্ন

সফল হল—গ্রেতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে। কিন্তু কেন হেন জঙ্গলী শাড়ির সঙ্গে মডার্ন চুল ?

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে ধ্যান করে হৃদয়ঙ্গম করলুম তত্বটা। শাড়ি ব্লাউজের কনট্রাস্‌ট্‌ ম্যাচিঙের দিন গেছে। এখন নব নব কনট্রাস্‌ট্‌-এর সন্ধান চলেছে। এ হচ্ছে প্রাচীন পন্থা আর আধুনিক ফ্যাশানের দ্বন্দ্ব। গলার নীচে ত্রয়োদশ শতাব্দী—উপরে বিংশ। প্রাণভরে বাঙালী মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করলুম। উচ্চকণ্ঠে করলেও কোনো আপত্তি ছিল না। সে হট্টগোলের ভিতর এটম বমের আওয়াজও শোনা যেত না। কি করে খানার ঘণ্টা শুনতে পেলুম, খোদায় মালুম।

হাওড়া থেকে শেয়ালদা সাইজের খানা-টেবিল। টার্কি পাখিরা রোস্ট হয়ে ঊর্ধ্বপদী হয়েছেন অন্ততঃ শ জনা, মুর্গসী-মুসল্লম অগুনতি সাদা কেঁচোর মত কিলবিল করছে ইতালির মাকরোনি হাইনৎসের লাল টমাটো সসের ভিতর, আণ্ডার রাশান স্যালাড গায়ে কম্বল জড়িয়েছে প্যোর ব্রিটিশ মায়োনেজের ভিতর, চকলেট রঙের শিক-কাবাবের উপর আঁকা হয়েছে সাদা পেঁয়াজ-মূলোর আলপনা, গরমমশলার কাথের কাদায় মুখ গুঁজে আছেন রুইমাছের ঝাঁক, ডাঁটার মতো আটা আটা এসপেরেগাস টিন থেকে বেরিয়ে শ্যাম্পেনের গন্ধ পেয়ে ফুলে উঠেছে, পোলাওয়ের পিরামিডের উপর সসজের ডজন ডজন কুতুব মিনার।

কনট্রাস্‌ট্‌, কনট্রাস্‌ট্‌, সবই কনট্রাস্‌ট্‌।

প্রভু যীশু জন্ম নিলেন খড়বিচুলির মাঝখানে—আর তার পরব হল শ্যাম্পেনে টার্কিতে !!

[ময়ূরকণ্ঠী]

নেভার রাধা

অনেক প্রেমের কাহিনী পড়েছি, এমন সব দেশে বহু বৎসর কাটিয়েছি যেখানে প্রেমে না পড়াতেই ব্যত্যয়—তাই চোখের সামনে দেখেছি প্রেমের নিত্য নব প্যাটার্ন—কিন্তু একটা গল্প আমি কিছুতেই ভুলতে পারি নে। তার প্রধান কারণ বোধহয় এই যে গল্পটি বলেছেন ওস্তাদ তুর্গেনিয়েফ। এবং শুধু তাই নয়—ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছিল।

দস্তয়েফেস্কি-তলস্তয়ের সৃজনীশক্তি তুর্গেনিয়েফের চেয়ে অনেক উঁচু দরের কিন্তু তুর্গেনিয়েফ যে স্বচ্ছ সলীল ভঙ্গীতে গল্প বলতে পারতেন, সে কম কৃতিত্ব বিশ্ব-সাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন অতি অল্প ওস্তাদই। তুর্গেনিয়েফের শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক রুশ সমঝদার বলেছেন, 'তাঁর শৈলী যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে—ইট্ ফ্লোজ্ লাইক্ অয়েল।'

তুর্গেনিয়েফ ছিলেন খানদানি ঘরের ছেলে—তলস্তয়েরই মতো। ওরকম সুপুরুষও নাকি মস্কো, পিটার্সবুর্গে কম জন্মেছেন। কৈশোরে তাঁর একবার শক্ত অসুখ হয়। সেরে ওঠবার পর ডাক্তার তাঁকে হুকুম দেন, নেভা নদীর পারে কোনো জায়গায় গিয়ে কিছুদিন নির্জনে থাকতে। নেভার পারে এক জেলেদের গ্রামে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের জমিদারি ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে জমিদারের একখানি ছোট্ট বাংলো—চাকর-বাকর নিয়ে ছোকরা তুর্গেনিয়েফ বাংলোয় গিয়ে উঠলেন।

সেই ছবিটি আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জমিদারের ছেলে, চেহারাটি চমৎকার আর অসুখ থেকে উঠে সে চেহারাটি দেখাচ্ছে করুণ, উদাস-উদাস, বেদনাতুর। তার উপর তুর্গেনিয়েফ ছিলেন মুখচোরা এবং লাজুক, আচরণে অতিশয় ভদ্র এবং নম্র। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, গ্রামে হুলস্থূল

পড়ে গিয়েছে—জেলে-মেয়েরা দূর থেকে আড়নয়নে দেখছে তুর্গেনিয়েফ মাথা নিচু করে, দু'হাত পিছনে এক জোড় করে নদীর পারে পায়চারি করছেন। জরাজীর্ণ গ্রামে হঠাৎ যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

মেয়েরা জানে এরকম খানদানি ঘরের ছেলে তাদের কারো দিকে ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু তা হলে কি হয়, তরুণ হৃদয় অসম্ভব বলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে না। সে রববারে জেলে তরুণীরা গীর্জায় গেল দুরুদুরু বুক নিয়ে—বড়দিনের ফ্রক-ব্লাউজ পরে।

তরুণীদের হৃদয় ভুল বলেনি। অসম্ভব সম্ভব হল। তুর্গেনিয়েফ মেয়েদের দিকে তাকালেন। তাঁর মনও চঞ্চল হল।

তুর্গেনিয়েফ পষ্টাপষ্টি বলেননি, কিন্তু আমার মনে হয় মস্কো পিটার্সবুর্গের রঙ-মাখানো গয়না-চাপানো লোক-দেখানো সুন্দরীদের নখরা-ককেট্রি তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছিল বলে তিনি জেলে গ্রামের অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্যের সামনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তুর্গেনিয়েফের কবি-হৃদয় অতি সহজেই হীরার ফুল অনাদর করে বুনো ফুল আপন বুকে গুঁজে নিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের সুন্দরীদের পয়লানম্বরী কাউকে তিনি বেছে নিলেন না। এই উল্টোস্বয়ম্বরে যাকে তিনি হৃদয় দিলেন সে স্বপ্নেও আশা করতে পারেনি, এই প্রিয়দর্শন তরুণটি সুন্দরীদের অবহেলা করে তাকেই নেবে বেছে। সত্য বটে, মেয়েটি কুৎসিত ছিল না, এবং তার স্বাস্থ্যও ছিল ভালো; কিন্তু তাই দিয়ে তো আর প্রেমের প্রহেলিকার সমাধান হয় না।

মেয়েটির মনে যে কী আনন্দ, কী গর্ব হয়েছিল সেটা কল্পনা করতে আমার বড় ভালো লাগে। তুর্গেনিয়েফ তার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন—নিজের জীবনে ঘটেছিল বলে হয়তো তিনি এ

ঘটনাটিকে বিনা অলঙ্কারে বর্ণনা করেছেন। আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছে হয়, মেয়েটির লজ্জা-মেশানো গর্ব যদি আরো ভালো করে জানতে পারতুম—তুর্গেনিয়েফ যদি আরো একটুখানি ভালো করে তার হৃদয়ের খবরটি আমাদের দিতেন।

শুধু এইটুকু জানি, মেয়েটি দেমাক করেনি। ইভানকে পেয়ে সে যে-লোকে উঠে গিয়েছিল সেখানে তো দেমাক-দম্ভের কথাই উঠতে পারে না। আর তুর্গেনিয়েফ হিংসা, ঈর্ষা থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অন্য মেয়েদের সঙ্গে অতি ভদ্র মিষ্ট আচরণ দিয়ে—কোনো জমিদারের ছেলে নাকি ওরকমধারা মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিচু হয়ে জেলেনীদের কখনো নমস্কার করেনি।

কৈশোরের সেই অনাবিল প্রেম কিরূপে আস্তে আস্তে তার বিকাশ পেয়েছিল, তুর্গেনিয়েফ তার সবিস্তার বর্ণনা দেননি—তাই নিয়ে আমার শোকের অন্ত নেই।

দুজনে দেখা হত। হাতে হাত রেখে তারা নদীর ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদ উঠত। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে তুর্গেনিয়েফ তাঁর ওভারকোট দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে দিতেন। সে হয়তো মৃদু আপত্তি করত—কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ইভানের কোনো ইচ্ছায় সে বেশীক্ষণ বাধা দিতে পারত না।

তুর্গেনিয়েফ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। বাড়ি থেকে হুকুম এসেছে প্যারিস যেতে।

বিদায়ের শেষ সন্ধ্যা এল। কাজ সেরে মেয়েটি যখন ছুটে এল ইভানের কাছ থেকে বিদায় নিতে, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

অঝোরে নীরবে কেঁদেছিল শুধু মেয়েটি। তুর্গেনিয়েফ বারে বারে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এরকম ধারা কাঁদছো কেন? আমি তো আবার ফিরে আসব—শিগগিরই। তোমার কান্না

দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাবছ, আমি আর কখনো ফিরে আসব না।'

কিন্তু হায়, এসব কথায় কি ভাঙা বুক সান্ত্বনা মানে? জানি, তুর্গেনিয়েফের তখনো বিশ্বাস ছিল তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু যে ভালোবেসেছে সমস্ত সত্তা সর্বৈব অস্তিত্ব দিয়ে তার হৃদয় তো তখন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়—বিধাতাপুরুষেরই মতো।

তুর্গেনিয়েফ বললেন, 'তোমার জন্য প্যারিস থেকে কি নিয়ে আসব?'

কোনো উত্তর নেই।

'বল কি নিয়ে আসব?'

'কিচ্ছু না—শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'কিছু না? সে কি কথা? আর সবাই তো এটা, ওটা, সেটা চেয়েছে। এই দেখো, আমি নোটবুকে সব কিছু টুকে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে দামী জিনিস আনতে চাই। বলো কি আনব?'

'কিচ্ছু না।'

তুর্গেনিয়েফকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল, মেয়েটির কাছ থেকে কোনো একটা কিছু একটার ফরমাইশ বের করতে। শেষটায় সে বললে, 'তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান নিয়ে এস।'

তুর্গেনিয়েফ তো অবাক। 'এই সামান্য জিনিস! কিন্তু কেন বলো তো, তোমার আজ সাবানে শখ গেল? কই, তুমি তো কখনো পাউডার সাবানের জন্য এতটুকু মায়া দেখাওনি—তুমি তো সাজগোজ করতে পছন্দ করো না।'

নিরুত্তর।

'বলো।'

'তা হলে আনবার দরকার নেই।' তারপর ইভানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে বলল, 'ওগো, শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'আমি নিশ্চয়ই সাবান নিয়ে আসব। কিন্তু বল, তুমি কেন সুগন্ধি সাবান চাইলে?'

কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বলল, 'তুমি আমার হাতে চুমো খেতে ভালোবাসো আমি জানি। আর আমার হাতে লেগে থাকে সব সময় মাছের আঁশটে গন্ধ। কিছুতেই ছাড়াতে পারি নে। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনেছি সব গন্ধ কেটে যায়। তখন চুমো খেতে তোমার গন্ধ লাগবে না।'

অদৃষ্ট তুর্গেনিয়েফকে সে গ্রামে ফেরবার অনুমতি দেননি।

সে দুঃখ তুর্গেনিয়েফও বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেননি॥

[ময়ূরকণ্ঠী]

শতাব্দী হয়েছে পূর্ণ। আজি হতে শতবর্ষ পরে
নরনারী বালবৃদ্ধ কাব্য তব বক্ষোপরি ধরে
ভাবিয়া অবাক হবে কী করে যে হেন ইন্দ্রজাল
বঙ্গভূমে সম্ভাবিল। পরাধীন দীন দগ্ধ ভাল
অন্ধভূমি। তারি তমা বিকশিতে উদিল যে রবি
স্বর্গের করুণা সে যে। বঙ্গ কবি হল বিশ্বকবি।
তারপর এ যুগের লোকে স্মরি মানিবে বিস্ময়
কোন পুণ্য বলে মোরা পেনু তার সঙ্গ, পরিচয়!

সাহিত্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো সভ্য জাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোনো বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে। এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তারা স্বভাবতঃ এবং ঐতিহ্যবশতঃ ধর্মানুরাগী। তার কোনো বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূলস্বরূপ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ না থাকলে সে তখন সবকিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।[১]

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যে সব হিন্দু এ শহরের গোড়া-পত্তনকালে ইংরেজের সাহায্য করে বিত্তশালী হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোনো চর্চা ছিল না। বাঙলা গদ্য তখনো জন্মলাভ করেনি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোনো উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ। তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল-পার্বণে যা সমারোহ করলো তা দেখে অধিকতর বিত্তশালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হল। এর শেষ-রেশ 'হুতোমে' পাওয়া যায়।

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বার বার ঘটে থাকে। এবং সমগ্রভাবে বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। গরীব-দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থনৈতিক মূল্য তো আছে বটেই, তদুপরি এক যুগের অত্যধিক

১। বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্য মুনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম—যাগযজ্ঞ-পশুহত্যা তখন সত্য-ধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সর্বজনবোধ্য লোকায়ত প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষার শরণ নেন।

পাল-পার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন ঐ ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশী ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন-আলোড়ন নিয়ে। এবং এই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (কোঁৎ, মিল ইত্যাদি) প্রশ্নের যুক্তিতর্কমূলক আলোচনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে ক্রিয়াকর্মাসক্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙালী সমাজের অগ্রণীগণ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি ইংরেজী শিখে ফেলেছেন এবং খ্রীস্টধর্মের মূলতত্ত্ব তার মহান আদর্শবাদ, সেই ধর্মে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা তাঁদের মনকে বার বার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে কি, আছে তো শুধু দেখতে পাই অন্তঃসারশূন্য পূজা-পার্বণ, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন চরম মূল্য লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পরিসমাপ্তিতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

হিন্দুশাস্ত্রের অতি সামান্য অংশও যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, এ সব কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। বস্তুতঃ জীবনসমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন প্রলোভন, অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ—এ দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহী হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে দেখিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এ সব তত্ত্ব যাঁরা জানতেন তাঁরা থাকতেন গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়াতেন টোল চতুষ্পাঠীতে এবং তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে

আসেননি বলে ওদের ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচলিত করে তুলেছে সে সংবাদও তাঁদের কানে এসে পৌঁছয়নি।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য, এই সব 'টোলো' 'বিটেল বামুনরা' যে শুধু পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মর্যাদা মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতো তা নয়, তারা যে কান্টহেগেলের চেলাদের সঙ্গে বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল—এ তত্ত্বটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। 'ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর' লালন ফকিরের অর্থহীন গীত নয়।[২] এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু স্মার্ত নন, নৈয়ায়িকও ছিলেন, এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলবট নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে বিধানের সামাজিক মূল্যও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারতেন।

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণীজন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হয়। তাঁর ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙালী জাতির কি পরিমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাহ্মসমাজের কীর্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ এখনো শেষ হয়নি। বাঙালী সাধক, বাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠক সকলেই সে কথা স্বীকার করেছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—

এদানির ব্রাহ্মধর্ম ঝার ছড়াছড়ি।
তাহারেও বার বার নমস্কার করি॥

২। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি;
আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃঃ।

'ছড়াছড়ি' শব্দে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু ক্ষুদ্র তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও 'নমস্কার' করেছেন।

রাজা রামমোহন খ্রীস্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলবী' ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, সে যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে বস্তু সম্পূর্ণ অবান্তর এমন কি অন্তরায়, সেই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

রাজা জানতেন, সে যুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খ্রীস্টান মিশনারীর সামনে 'ক' অক্ষরে 'কৃষ্ণনাম' স্মরণে 'একঘটি'[৩] চোখের জল ফেললেই আপন ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—খুব বেশী হলে, ভদ্র মিশনারী হয়তো তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে, হিন্দুর ষড়দর্শন, বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বেদ-বেদান্তের অখণ্ড দিব্যদৃষ্টি।

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দুধর্মের নব উন্মাদনা আনতে হলে রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের কোন্ কোন্ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার করতেন সে কথা বলা শক্ত; কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে যুগের কলিকাতাবাসী সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ থেকেই শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় খ্রীস্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার উদ্দেশ্য নহে,—অনুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কী পণ্ডিত অলবীরূণী,

৩। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কথার আড়।

মোগল সূফী দারাশীকুহ্, (ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)[৪] এবং জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন।

ধর্মের যে সব বাহ্যানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সে সংগ্রামের জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করলেন হিন্দু স্মৃতি থেকেই। এ স্থলে রাজা বিশ্বজনীন যুক্তিতর্ক ব্যবহার না করে প্রধানতঃ ব্যবহার করলেন হিন্দুশাস্ত্র সম্মত ন্যায় এবং উদাহরণ। রাজা প্রমাণ করলেন যে তিনি দর্শনে যে রকম বিদগ্ধ, ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও অনুরূপ স্মার্ত মল্লবীর।

শাস্ত্রালোচনায় ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বাঙলা সাহিত্যানু-রাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় একটি বস্তুর দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাঙলা ভাষাতে। পদ্য এ সব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তার-ই মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে বাঙলা গদ্য লেখা হয়নি এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু হিন্দু-ধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ষণ মন্থনের ফলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গদ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনা বহুবার ঘটেছে ; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাবীরের

৪। দারা তাঁর অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলে : "হে প্রভু, তুমি তোমার সুন্দর মুখ কুফ্র্ (অবিদ্যা) কিম্বা ইমান (বিদ্যা) দু'পাশের কোনো অলকগুচ্ছ (জুল্ফ) দিয়ে ঢেকে রাখোনি।" এই শ্লোক ঈশোপনিষদের 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥'-রই অনুবাদ।

কৃপায় অর্ধ-মাগধী। হজরৎ মুহম্মদের কৃপায় আরবী গদ্য, লুথারের কৃপায় জর্মণ গদ্যের সৃষ্টি। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার পায়; তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিংবা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়;[৫] এবং সে আন্দোলনকে বাধ্য হয়েই গণ-ভাষা আশ্রয় নিতে হয়।

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয়, বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (Folk religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল।[৬] প্রমাণ-স্বরূপ বলতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজও যদি কেউ ব্রাহ্ম-মন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্ম-সাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে হবে, উপনিষদ-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনো প্রকারের উন্নতি করতে পারেননি। এমন কি গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের

৫। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম পৃথিবীতে কোনো মহাপুরুষ কখনোই আরম্ভ করেননি। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বা জিন। খ্রীস্ট বলেন তিনি বিধির বিধান ভাঙতে আসেননি—তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে, হজরৎ মুহম্মদ বলতেন তাঁর পূর্বে বহু সহস্র পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ এঁদের কেউ বলেননি, আমি প্রথম। প্রায় সকলেই বরঞ্চ বলেছেন, আমিই শেষ।

৬। একটা অবিশ্বাস্য গল্প শুনেছি, কোনো ব্রাহ্ম ভক্ত নাকি কদম্বতরুকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায়, হিন্দুরা ব্রাহ্মদের 'গোঁড়ামি' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা পোষণ করতেন।

কথা প্রায় কখনোই শুনিনি। বৃন্দাবনের রসরাজ-রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোনো ব্রাহ্ম কখনো কোনো দৃষ্টান্ত আহরণ করেননি।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রাহ্মও তা, আমি হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বার বার নমস্কার করি।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রাহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। এ যুগেও তার উদাহরণ পাইনি। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হৃদ্যতা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্ম পরিবারে হিন্দু চাকর-বাকরকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখিনি। মুসলমান-খ্রীস্টানরা সর্বদাই করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র সর্বজনীন কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে কোনো কারণেই হোক সর্বজনকে আহ্বান জানাতে পারেননি। মুসলমানের নমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশী, হিন্দুর সংকীর্তনে ভাবোল্লাসে নৃত্য করে 'নিম্নশ্রেণী'র প্রচুর হিন্দু, আর মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-সম্মেলনে ব্রাহ্ম চাকর-নফর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তার জন্য আমি ব্রহ্মবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি না। এঁরা অক্ষম ছিলেন, একথা আমি কখনো স্বীকার করবো না। আমার

মনে হয়, এঁরা প্রধানতঃ সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে যে আমাদের মতো বহু হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে হিন্দুধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন হয় দীক্ষা নিয়েছেন, কিংবা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরীব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কি না এ বিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিত জনেরই শাস্ত্রাধিকার।

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তা হলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিতজনকেও শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদ করতে হয়।[৭]

* * * *

ঠিক এই সময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সব কিছুরই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তিতর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধু-সন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশটুকুর খবর যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ বস্তুটি যে ষষ্ঠেন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই।

৭। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মফল ভোগ করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এ স্থলে অবান্তর।

তৎসত্ত্বেও যারা তার বিচার করে তাদের নিয়ে মৃদু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন—

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহরী
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি।

যার যেমন মাপকাঠি। স্যাকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে যায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব— একাধিক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল।[৮]

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার এক ঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে তোমার কি হবে?[৯]

তাই মা ভৈঃ। যারা বলে আমাদের মতো পাপীতাপীর অধিকার নেই পরমহংসের মতো মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার—তারা ভুল বলে। অধিকার আমাদেরই—এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীন প্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোঝা যায়, এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই

৮। আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, 'যে জন ডুবলো, সখী, তার কি আছে আর বাকি গো?' ঠাকুরও প্রায়ই গাইতেন 'ডোব ডোব, ডোব।'

৯। এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 'মাই কাপ্ ইজ স্মল; বাট্ আই ড্রিঙ্ক অফনার।'

সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 'নিখিরকিচ'—চাঁচা-ছোলা। যেন এইমাত্র তৈরী হয়েছে কাঁসার ঘটিটি—কোন জায়গায় টোল পড়েনি।

এঁর মতো সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এঁর ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য খ্রীস্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গীর। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য।' এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোনো বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'তার জাঁতায় যাই ফেলো না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হল। সময়মত ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন কি, যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু-কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরণের 'বেগে'র প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটির উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন) আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গী সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। কিন্তু যেখানে সুদ্ধমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 'ধোপদুরস্ত' 'ফিটফাট' হবার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার 'ছুঁৎবাই' রোগ আমরা

পেয়েছিলুম ভিক্টোরীয় প্যুরিটানিজ্‌ম্‌ থেকে—তখন কে জানতো পঞ্চাশ বছর যেতে না যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের 'ভণ্ডামি' লণ্ডভণ্ড করে দেবেন।'[১০]

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পূজা করে প্রধানতঃ কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখলে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন।

অথচ 'দূরের কথা' বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এ-তিন মার্গ তিনি অবস্থাভেদে একে ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সব কিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন, 'কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে পারোনি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না।' 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

'কি রকম জানো, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের

১০। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে দু'রকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। 'সীতার বনবাসে'র ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্যামাকে বিধবা বিবাহের শত্রুদের বিপক্ষে ক্ষেপাতে চেয়েছেন, সেখানে 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই বেনামীতে, 'ফাজিল-চালাক', 'দিলদরিয়া তুখোর' ইয়ার, 'তার একটি বেদড়া মন্ত্রী আছে—এটি তারই ত্যাঁদড়ামি', 'লোকটা লক্ষ্মীছাড়া বকেশ্বর আনাড়ির চূড়ামণি বে-অকুফের শিরোমণি।' ইত্যাদি 'গ্রাম্য' বাক্য পরামনন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যে সব আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (!) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনো সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পর সমাধি হয়। তখন 'আমি', 'তুমি', 'জগৎ' এ সবের খবর থাকে না।'

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলছেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী।' যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে।'[১] আর একটি কথা—

১১। শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপ কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম।

"মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্যবায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়। ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

ইংরেজিতে এর প্রথম ছত্র "The Stars are blotted out!"—আশ্চর্য বোধহয় রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪?) কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো কিন্তু মাতুয়ার (dogmatism) বুদ্ধি করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। "ব'লো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।"[১২]

জনগণপূজ্য শক্তির সাকার সাধনা ('পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বথা বর্জনীয়—এটাতে তাচ্ছিল্য এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে, কিন্তু প্রশ্ন, জড়সাধনার অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বার বার সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি 'মতুয়া' কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।

বস্তুতঃ একটি চরম সত্য আমাদের বার বার স্বীকার করা উচিত: যেখানেই যে কোনো মানুষ যে কোনো পন্থায় ভগবানের

১২। ডগমাটিজম্ না করে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা এর উৎকৃষ্ট প্রকাশ কেনোপনিষদে :—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

'আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি; অর্থাৎ 'জানি না' ইহাও মনে করি না, এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।'—গম্ভীরানন্দ

চতুর্থ পাদটীকা পুনরায় দ্রষ্টব্য।

সন্ধান করেছে তাকেই সম্মান জানাতে হয়। এমন কি ক্ষুদ্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করে (হায়, কলকাতায় সরস্বতীপূজার বাহ্য আড়ম্বর দেখে অনেক সময় মনে হয়, এরাই বুঝি এ যুগে দেবীর একমাত্র সাধক) তাকেও মানতে হয়,—গাছের পাতা, জলের ফোঁটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তারও বিলক্ষণ মূল্য আছে। গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাষায় বলা হয়েছে।

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কি? বাঙলা দেশে আজ আর ক'জন লোক নিরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শক্ত—কারণ সে পূজা হয় গৃহকোণে, নির্জনে। আর কলকাতায় বারোয়ারী সাকার পূজার যা আড়ম্বর তা দেখে বাঙলার কত গুণী-জ্ঞানী যে বিক্ষুব্ধ হন তার প্রকাশ খবরের কাগজে প্রতি বৎসর দেখি। এইমাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য আছে—তাই আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, 'কিন্তু কি ভয়ঙ্কর স্ট্রেন করে এ স্থলে সে সত্যটি স্বীকার করি।'

সাকার নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে তা আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাধানের সামাজিক মূল্য কি?

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী সমাজে সমান অংশীদার। এঁদের ধর্মাচরণ যা-ই হোক না কেন, সমাজে তাঁরা মেলামেশা করেছেন অবাধে। একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলামেশা না থাকলে খ্রীস্টান মাইকেল, মুসলমান মুশরফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীন বাঙলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। সমঝদার ও রসিক জনের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহ লাভ না করে কম কবিই এ সংসারে সার্থক কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং এঁদের সকলেরই উৎসাহী পাঠক এবং গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধানতঃ হিন্দুরাই।[১৩]

১৩। পূর্ববর্তী যুগে পরাগল, ছুটি খাঁর মতো মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি— 'মহতী বিনষ্টি' হয়; এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সে যুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন? মুসমলান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সে যুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুণ্ণ হয়নি? তবে কেন ঐ কারণেই ব্রাহ্মে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে?

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মূল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেননি। তাই বার বার দেখি, তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বার বার দেখি, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন, কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালী-কাল্টে কন্‌ভার্ট' করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।[১৪]

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তাঁর অর্থ-নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন এ কখনোই হতে পারে না।

বলেই হিন্দুরা মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমুখ বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

১৪। এ বিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বান্দা' ছিলেন তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাবেন অনিল গুপ্ত সংস্করণ চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে। পাঠক তখন 'নাছোড়বান্দা'র সত্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

পক্ষান্তরে, আবার অন্য সত্যও সর্বজনবিদিত—কামিনী-কাঞ্চনে পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থ-সমস্যা আপন সত্তায় (per se) তাঁর সামনে উপস্থিত হয়নি। যারা মুখ্যতঃ অর্থ কামনা করে, রামকৃষ্ণদেব তো তাঁদের উপদেষ্টা নন। যাঁরা মুখ্যতঃ ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর তিনি তাঁদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহু বার বলেছেন, 'কলিকালে মানবের অন্নগত প্রাণ।' এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণনীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্য কোনো চিন্তার স্থান আর তার মস্তকে নাই। তবু যাঁরা ধর্মে অনুরক্ত তাঁরা বার বার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, 'উপায় কি?'

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তা হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে জগৎ মায়া মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখীর মতো দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায়। অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে সচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন জোটাবে আর তুমি নিশ্চিন্তমনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যে সব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না,—যাঁরা ব্রহ্ম-জ্ঞানের তপস্বী তাঁদের বার বার বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলকেই এ কথা বলেছেন, এই জন্মেই যারা সাধনার

সর্বশেষ স্তরে পেঁছিতে চায়—রাখাল, নরেন্দ্রের মতো যারা জন্মাবধি জীবন্মুক্ত তাদের ক'জন বাদ দিলে আর ক'টি প্রাণী সে স্তরে পেঁছিতে পারবে সে বিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—তাদের হতে হবে নিরঙ্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। এ-কথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি, তবে বলবো, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ—পরম পুরুষ। কোনো মহাপুরুষকে যদি দম্ভভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করবো। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোনো চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। এ তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

*　　*　　*　　*

যে পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগল্‌ভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতূহলবশতঃ স্বতঃই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ তো হল মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জ্বল রামকৃষ্ণদেব।' কিন্তু যেখানে তিনি একা—তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাঙলায়, 'তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?'

এর উত্তরে বলবো, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারোরই নেই। এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য। রামকৃষ্ণের সমকক্ষ জনই এর উত্তর দিতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছিনর পরও কোনো কোনো মানুষ লোকহিতার্থে এ সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ শুকদেবাদি।' এ কথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি, এ-কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান, এ রকম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এ যাবৎ কেউ নির্মাণ করেননি।

*　　　*　　　*

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই।

পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গীর মতো পরে আল্লা আল্লাও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খ্রীস্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে-কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এল কোথা থেকে? বিশেষতঃ যখন একাধিক-বার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলার সময় পরমহংসদেব কায়মনো-বাক্যে সে-ই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সম্যূলার দেখিয়েছেন ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি করেন তখন তিনি বলেন,—'হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।'

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিকেও তাই,—'হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।' অর্থাৎ ঋষি যখন যে দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহু-ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সম্যূলার এর নূতন নাম করেছিলেন, 'হেনোথেয়িজম'।

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থাই বরণ করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন আল্লা আল্লা করেছেন তখন আল্লাই পরমাত্মা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন।

কোনো বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সব কিছুর অবহেলা করেননি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ যুগের হিন্দু সম্বন্ধে এ কথা হয়তো খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাহ্য করেনি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান, ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে।

[চতুরঙ্গ]

ছিল একদিন পরিচয় হয় নাই
এল সেই দিন, তবে কেন দুখ পাই ?
ছিল একদিন তোমারে চিনিনি যবে
এখন চেন না ; তবে কেন দুখ হবে ?
একদিন ছিল, দোহাতে অপরিচয়
ছাড়াছাড়ি হল ; তবে কেন দুখ ভয় ?
একদিন ছিল চেনাশোনা হয় নাই
আবার তেমনি, তবে কেন ব্যথা পাই ?
অচেনা যখন ছিলে
ছিল না তো মোর দুখ
এখন চেন না ফের
ঘুচে গেল কেন সুখ ?

নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবী-ফার্সীর চর্চা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ব-বাংলার মতো ছড়িয়ে পড়তে পারেনি, কাজেই অতি সহজেই অনুমান করা যায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর-দরবেশদের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবী-মৌলানারা সেখানে আরবী-ফার্সীর বড় কেন্দ্র স্থাপনা করতে পারেননি।

তদুপরি নজরুল ইসলাম ইস্কুলে সুবোধ বালকের মতো যে খুব বেশী আরবী-ফার্সী চর্চা করেছিলেন তাও মনে হয় না। ইস্কুলে তিনি আদৌ ফার্সী (আরবীর সম্ভাবনা নগণ্য) অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানি নে।

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি যে এ সব ভাষায় খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না। পল্টনের হাবিলদার যে জাব্বা-জোব্বা পরে দেওয়ানা-দেওয়ানা ভাব ধরে হাফিজ-সাদীর কাব্য কিংবা মৌলানা রুমীর মসনবী সামনে নিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াবে তাও তো মনে হয় না। এমন কি রঙীন সদরিয়ার উপর মলমলের বুটিদার অঙ্গরখা পরে হাতে শিরাজীর পাত্র নিয়ে সাকীর কণ্ঠে ফার্সী গজল আর কসীদা-গীত শুনছেন, এও খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় না। কসম খেয়ে এ বিষয় কোনো কিছু বলা শক্ত, তবে এটা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কাব্যে যদ্যপি 'খাকী' এবং 'সাকী' চমৎকার মিল, তবু বাস্তব জীবনে এ দুটোর মিল এবং মিলন সচরাচর হয় না।

তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরের সন্তান। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন, দোয়া-দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র)

মুখস্থ করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাঙলা ছন্দে অনুবাদ করেন— হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবি-জনোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং আমপারার সঙ্গে তাঁর যে আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে স্বষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি লিরিকের রাজা মেঘদূতখানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ততখানি কি কোনো পণ্ডিত পেরেছেন? বহু লোকই বাঙলা দেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছে, কিন্তু ঐ মাটির জন্য প্রাণ তো তারা দেয়নি। কানাইলাল, ক্ষুদিরাম ভালো জরিপ জানতেন একথাও তো কখনো শুনিনি।

কাজী রোমান্টিক কবি। বাঙলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যাননি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (শুনেছি, পণ্ডিত হয়েও মাক্সম্যুলার ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন এবং তাই বহুবার সুযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজী হননি।) কিন্তু ইরানের গুল্‌-বুল্‌বুল্‌, শিরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে এমনই এক জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিল যে গাইড-বুক, টাইম-টেবিল ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন।

গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি করে মাতৃভূমি—একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি প্যারিস। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান। কীটস বায়রনের বেলা যে রকম ইংল্যাণ্ড ও গ্রীস।

আরবভূমির সঙ্গে কাজী সায়েবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের 'হারানো ইউসুফের' যে করুণ কাহিনী বহু মুসলিম অমুসলিমের চোখের জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে।

দুঃখ করো না, হারানো য়ুসুফ
কানানে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥
ইউসুফে গুম্‌গশ্‌তে বা'জ্‌ আয়দ্‌ ব্‌কিনান্‌
গম্‌ ম্‌-খুর।
কুল্‌বয়ে ইহজান্‌ শওদ্‌ রুজি গুলিস্তান্‌
গম্‌ ম্‌-খুর॥

কাজী সায়েবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাঙলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়ে'র অনুকরণে 'শাতিল আরব শাতিল আরব' ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোনো কোনো মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী 'বিদ্রোহী' লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিল (যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে, কাজীর হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধহয় বাঙলার জন্য নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে—পরবর্তী যুগে কেন, ঐ সময়েই কবিকে যাঁরা ভালো ক'রে চিনতেন,

তাঁরাই জানতেন, ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানী বলে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী বলে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।

সে বিদ্রোহ কিসের বিরুদ্ধে?

এ স্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন।

ইরানী ও ভারতীয় একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। দুই জাতির ইতিহাসেই অনেকখানি মিল দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইরানীরা যে রকম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে একদিকে মিশর প্যালেস্টাইন, অন্য দিকে গ্রীস পর্যন্ত হানা দিয়েছিল, ভারতীয়েরা সে রকম করেনি। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী অভিযানের ফলে ইরানভূমি যে রকম একাধিকবার সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়েছে, ভারতবর্ষের ভাগ্যে তা কখনো ঘটেনি। এ সব কারণেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক ইরানীরা সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই সে এক উগ্র স্বাজাত্যভিমানের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ যেখানে শান্তভাবে বিদেশীর ভালো-মন্দ দেখে-চিনে নিজেকে মেলাবার, পরকে আপন করার চেষ্টা করেছে, ইরান সেখানে আদৌ সে চেষ্টা করেনি এবং শেষটায় যখন বাধ্য হয়ে সব-কিছু নিতে হয়েছে তখন করেছে পরবর্তীকালে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

গ্রীস-রোমের কাছে পরাজিত হওয়া এক কথা, আর প্রতিবেশী 'অনুন্নত', 'অর্ধসভ্য' আরবদের কাছে পরাজিত হওয়া আরেক কথা। তদুপরি গ্রীক রোমানরা ইরানে যে সভ্যতা এনেছিল, তাতে গরীব-দুঃখীর জন্য নূতন কোনো আশার বাণী ছিল না। যে নবীন ধন-বণ্টন পদ্ধতি দ্বারা হজরৎ মুহম্মদ আরব দেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রন্থন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর বাণী এসে পৌঁছল ইরানে। ফলে মুহম্মদ সাহেবের পরবর্তীগণ যখন

একদিন অন্যান্য জাতির মতো দিগ্বিজয়ে বেরোল তখন ইরানী পোষক সম্প্রদায় দেখে মর্মাহত ও স্তম্ভিত হল যে, ইরানের জনসাধারণ আরবের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হল না। তারপর আরবরা বিজিত দেশের ধর্মজগতে যে সাম্যবাদ ও অর্থের ক্ষেত্রে যে ধনবণ্টন পদ্ধতি প্রচার করলো, তাতে আকৃষ্ট হয়ে ইরানের জনসাধারণ মুসলমান হয়ে গেল। জ্ঞানাভিমানী ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ও শেষ পর্যন্ত ঐ ধর্ম গ্রহণ করল। তখনকার মতো ইরানী সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু বিদ্রোহ লুপ্ত হল না।

সেটা দেখা দিল প্রায় চার'শ বছর পরে ফিরদৌসীর মহাকাব্য 'শাহনামা'তে। রাষ্ট্রভাষা আরবীকে উপেক্ষা করে ফিরদৌসী গাইলেন প্রাক-মুসলিম যুগের ইরানী বীরের কাহিনী, রাজার দিগ্বিজয়, প্রেমিকের বিরহ-মিলন গাথা—নবীন অথচ সনাতন সেই ফার্সী ভাষায়। সে ফার্সী কাব্য-সাহিত্য পরবর্তী যুগে বিশ্বজনের বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তার প্রথম সার্থক কবি ফিরদৌসী।

এই নূতন ভাষাতে, নবীন প্রাণে উন্মত্ত হয়ে যে সব কবি কাব্যের সর্ব বিষয়বস্তু নিয়ে নব নব কাব্যধারার প্রবর্তন করলেন তার কাছে পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় রেনেসাঁসও এতখানি সর্বমুখী বলে মনে হয় না। দু'শ বছর যেতে না যেতেই বিশ্বের কাব্যজগতে ইরান তার অদ্বিতীয় আসন সৃষ্টি করে নিল।

এঁদের মধ্যে সত্য বিদ্রোহী কবি ওমর খৈয়াম।

ইরানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত তথা পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভিতর বিভিন্ন আন্দোলনের সৃষ্টি হল। তার প্রথম

(১) যাঁরা মুসলিম শাস্ত্রের চর্চা করে যশস্বী হলেন। ভাবলে আশ্চর্য বোধহয়, ইরানীরা আরবীর মতো কঠিন ভাষা আয়ত্ত করে সে শাস্ত্রে এতখানি ব্যুৎপত্তি অর্জন করলো কি করে? মুসলমানদের

মন্থুর নাম ইমাম আবু হানীফা। পৃথিবীর শতকরা আশী জনেরও বেশী মুসলমান আজ নিজকে হানফী অর্থাৎ আবু হানীফার মতবাদে বিশ্বাসকারী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার মতো কীই বা আছে? শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য তো শুনেছি ভারতবর্ষের দক্ষিণতম কোণের লোক, এবং তাঁর ধমনীতে যে অত্যধিক আর্যরক্ত ছিল তাও তো মনে হয় না, অন্ততঃ একথা তো অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, আর্য উত্তর ভারতের তুলনায় মালাবারে সংস্কৃত-চর্চা ছিল অনেক কম। তবু যে তিনি শুধু তাঁর মাতৃভূমি মালাবারে বৌদ্ধদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, আর্য উত্তর ভারতেও তিনি তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরানী আবু হানীফার মতবাদও একদা ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদীনা তথা আরব দেশ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এ রকম উদাহরণ পৃথিবীতে আরো আছে।

(২) যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ড, টীকা-টিপ্পনী, মন্ত্রতন্ত্রে সম্পূর্ণ আস্থা না দিতে পেরে 'রহস্যবাদ' বা সুফীতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসার করতে লাগলেন; এঁরা ভগবানের আরাধনা করেন রসের মাধ্যমে এবং বাঙলার বৈষ্ণব তথা 'মরমিয়াদের' সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যেতে পারে।

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই, সখি তাঁদের কথায়
বাহিরে থাকেন তাঁরা।

* * *

ঐ চাহনিতে বিশ্ব মজেছে
পড়িয়াছে কত অশ্রুধার
পাগল করিল এ প্রমত্ত আঁখি
কুলমান রাখা হৈল ভার।

এ ধরনের কবিতা সূফী ও বৈষ্ণবদের ভিতর এতই প্রচলিত যে, কোন্‌টি সূফী কোন্‌টা বৈষ্ণব ধরে ওঠা অসম্ভব। যদি বলি,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
রাধিকার মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

তবে চট করে কেউ আপত্তি করবেন না। অথচ আসলে আছে,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

('সদ্ভাব-শতক' কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অনুবাদ)

বৈষ্ণবদের সঙ্গে এঁদের আরো বহু মিল আছে। এঁদের সূফীবাদ পরবর্তীযুগে তথাকথিত 'তুর্কী'রা গ্রহণ করে। বাঙলা দেশে প্রথম যে মুসলমানরা আসেন তাঁদের আমরা 'তুর্ক' 'তুরুক্', নাম দি (প্রাচীন বাঙলায় 'মুসলমান' শব্দের প্রতিশব্দ 'তুর্ক',—তামিলে এখনো 'তুরস্কম') এবং তাঁদের চক্রাকারে নৃত্য করে আল্লার নাম জপ ('জিক্‌র'—যার থেকে বাঙলা 'জিগির' শব্দ এসেছে) করা দেখে 'তুর্কী-নাচন-নাচা' প্রবাদটি এসেছে। বৈষ্ণবদের মতো এঁরাও জপ করতে করতে 'হাল' ('দশা') প্রাপ্ত হন,—অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও মুখ দিয়ে তখন প্রচুর ফেনা বেরয়। পূর্ব ইয়োরোপে এই নাচ দেখে ইয়োরোপীরা এদের নাম দিয়েছিল 'ডানসিং দরবেশ'। ইংরিজীতে কথাটা এখনো চালু আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্যধিক বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, কারণ আউল-বাউল, ভাটিয়ালি-মুর্শীদীয়া গীত যাঁরাই শুনেছেন, তাঁরাই এই ফার্সী, সূফী, ভক্তিবাদের কিঞ্চিৎ গন্ধস্পর্শ পেয়েছেন।

(৩) দার্শনিক সম্প্রদায়। আর্যগোষ্ঠীর দুই সম্প্রদায়—ভারতীয় ও গ্রীকরাই প্রধানতঃ দর্শনের চর্চা করেছেন।

মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত 'ভারতবর্ষ' পুস্তকের (প্রাচীন তথা অর্ধার্বাচীন ভারতের বহুমুখী কার্যকলাপ, চিন্তা অনুভূতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান তাঁদের পক্ষে এ পুস্তক অপরিহার্য; বস্তুতঃ বর্তমান লেখক ব্যক্তিগতভাবে এ পুস্তককে 'মহাভারতের' পরেই

স্থান দেয়) লেখক পণ্ডিত অল-বীরুনী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'দর্শনের চর্চা করেছেন গ্রীক এবং ভারতীয়েরা—আমরা (অর্থাৎ আরবী লেখকেরা) যেটুকু দর্শন শিখেছি তা এঁদের কাছ থেকেই।' কথাটা মোটামুটি সত্য, যদিও পণ্ডিতজনসুলভ কিঞ্চিৎ বিনয় প্রকাশ এতে রয়েছে, কারণ আরবরা গ্রীকদর্শনের আরবী অনুবাদ দিয়ে দর্শন-চর্চা আরম্ভ করেছিলেন সত্য কিন্তু পরবর্তী যুগে আভিচেন্না (বু আলী সিনা), আভেরস (আবু রুশ্‌দ্) ও গজ্জালী (অল-গাজ্জেল—এঁর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহীতে প্রকাশিত হয়) বহু মৌলিক চিন্তা দ্বারা পৃথিবীর দর্শন ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা ভালো, এঁদের দর্শন শঙ্কর দর্শনেরই ন্যায় ধর্মাশ্রিত এবং যে-স্থলে কুরানের বাণীর সঙ্গে গ্রীক দর্শনের দ্বন্দ্ব বেঁধেছে সেখানে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে-দ্বন্দ্বের সমাধান করার এবং সময়ে সময়ে তখন তাঁরা নিও-প্লাতোনিজম অর্থাৎ ভারতের উপনিষদসম্মত অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করেছেন। এঁদের বিশেষ নাম 'মুতকল্লিমুন' এবং পরবর্তী যুগে এদেশের রাজা রামমোহন তাঁর বিশ্বদর্শন (ভেল্টানশাউউঙ) নির্মাণে এঁদের পারপূর্ণ সাহায্য নিয়েছেন।

(৪) ঐতিহাসিক ও কবিগোষ্ঠী। ইতিহাস-চর্চায় আরবদের দক্ষতা সর্বজনমান্য, তবে ইরানীরাও এ-শাস্ত্র তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে এর অনেক উন্নতিসাধন করেন। কিন্তু আমরা যে যুগের আলোচনা করছি তখনো ইরানীদের কাছে ইতিহাস ও পুরাণের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়নি। ফিরদৌসীর 'শাহনামা' (রাজবংশ) কাব্যের রাজা-মহারাজা, নায়ক-নায়িকারা অধিকাংশই কবিজনসুলভ কল্পনাপ্রসূত—অন্তত: তাঁদের কীর্তিকলাপ তো বটেই। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়, প্রাক-ইসলামী এই সব অগ্নিউপাসক নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ফিরদৌসীর কী গগনচুম্বী গরিমা, দম্ভ এবং সময় সময় আস্ফালন। এ যেন বিজয়ী আরবদের বার বার শুনিয়ে

শুনিয়ে বলা, 'কালনেমির বিরূপাবর্তনে আজ আমাদের পতন ঘটেছে বটে, কিন্তু এই কাব্যে দেখ, আমরা একদিন সভ্যতার কত উচ্চ শিখরে উঠেছিলুম। সে-দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো। ওখানে তোমরা কখনো পৌঁছওনি, পৌঁছবেও না।' এ সুর কেমন যেন আমাদের চেনাচেনা মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ইংরেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে বার বার এই গান গেয়েছে। ('অন্য জাতি দিগ্বসন পরিত যখন। ভারতে ঋগ্বেদ পাঠ হইত তখন।') কিন্তু, আফসোস। শাহনামার মতো মহাকাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেনি। হেমচন্দ্র ও ইকবালকে ফিরদৌসীর আসনে বসানো কঠিন এবং অন্যান্য কবিরা যে 'নির্লজ্জতা' দেখালেন ('নির্লজ্জতা' শব্দটি ভেবে চিন্তেই কুটেশনের ভিতর ফেললুম, কারণ কাব্যে রসস্বরূপে প্রকাশ পেলে চরম নির্লজ্জতাও পাঠকের মনে বিদ্রোহ সঞ্চার করতে পারে না। আমাদের দুই মাইডিয়ার হীরো পবননন্দন ভীমসেন ও হনুমান যে সব দম্ভ এবং আস্ফালন করেছেন তা স্বকর্ণে শুনতে হলে 'রাম রাম' বলতে হত, কিন্তু কাব্যে পাঠ করে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়, মনে হয়, ঐ সময়ে ঐ অবস্থায় এ বাক্য ছাড়া অন্য কিছুই এঁদের মুখে মানাতো না, বলতে ইচ্ছে করে, 'ধন্য ধন্য যুগ্ম-কবি যাঁরা দম্ভকে বিনয়, লজ্জাকে শ্লাঘায় পরিণত করতে পারেন।') সেটা ঢাকবার প্রয়াস আজো ইরানে-তুরানে সহজেই চোখে পড়ে। সকলেই জানেন, মুসলমানধর্মে মদ খাওয়া মানা আর সেই মদও যদি খাওয়া হয় তন্বঙ্গী তরুণী সাকীর সঙ্গে—যার সঙ্গে 'বে-থা' হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও কবিরা বড় মারাত্মক স্মৃতিশক্তিহীন—তাও আবার ঝরণা তলায়, নির্জনে, সাঁঝের ঝোঁকে, যখন কিনা 'মগরিবের আইন ওকৃতে' নামাজ পড়ার কথা, আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ করার আদেশ—এবং মনে মনে আওড়ানো,

"মত্ত, মাতাল ব্যসনী আমি গো আমি কটাক্ষ বীর"

তা হলে অবস্থাটা কি রকমের হয় ?

কথা সত্য, মোল্লারা সুবো-শাম ভালো ভালো কেতাবপুঁথি পড়েন, কিন্তু মাঝে-মধ্যে, নিতান্ত কালে-কস্মিনে দু'একখানা কাব্যগ্রন্থের পাতাও তো তাঁরা ওলটান। কবি হাফিজ অবশ্য বিস্তর চলাচলির পর ওকীবহাল হয়ে অভয়বাণী বলেছিলেন,

"মোল্লার কাছে কোরো না কিন্তু মোর পিছে অনুযোগ,
তারো আছে, জেনো, আমারি মতন, সুরামত্ততা রোগ।"

তবু, এ-কথাও তো অজানা নয় যে, মোল্লারাই নীতিবাগীশ সাজে আর পাঁচজনের তুলনায় বেশী।

এবং কার্যতঃ দেখা গেল তারা এবং তাদের চেলাচামুণ্ডার দল ঝোপে-ঝাপে বসে আছে, শরাব-কবাব জান-কী-সাকী সুদ্ধ কবিদের বমাল গ্রেফতার করার জন্য।

কবিরা এবং বিশেষ করে আমাদের মতো তাঁদের গুণগ্রাহীরা উচ্চকণ্ঠে তখন বললেন, এ-সব কবিতা রূপকে নিতে হয়। মদ্য অর্থ ভগবদ প্রেম, সাকী অর্থ যিনি সে প্রেম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, অর্থাৎ পীর, গুরু, মুরশীদ, পয়গম্বর। এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাফিজ, আত্তার, এমন কি ওমর খৈয়ামের বহু কবিতার কোনো অর্থই করা যায় না, যদি সেগুলো রূপক দিয়ে অর্থ না করা হয়। কিন্তু বাদবাকীগুলো ?

আমাদের পদাবলীতেও তাই। এবং বিস্তর সব পদ আছে যাতে মর্ত্য আর অমর্ত্য প্রেম এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, দুটোকে আদৌ আলাদা করা যায় না—সমস্ত হৃদয়-মন এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় নবরসে আপ্লুত হয়ে যায়।

তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসী
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।

মর্ত্য প্রেমই যদি হবে তবে তো 'পরাণে' 'পরাণে' প্রেমের কাঁসা লাগবে। 'পরাণে' আর 'চরণে' প্রেমের বাঁধ বেঁধে দিয়ে কী এক অপূর্ব অতুলনীয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে—যার অনুভূতি এ-জগতে আরম্ভ, আর পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেই অমর্ত্যালোকে, 'ব্যর্থ নাহি হোক এ-কামনা।'

কিন্তু মাঝে মাঝে দ্বিধা জাগে, সর্বত্রই কি রূপকের শরণাপন্ন হতে হবে? যথা:—

অদ্যাপ্য-শোক-নব-পল্লব-রক্ত হস্তাং
মুক্তাফল প্রচয়চুম্বিত-চুচুকাগ্রাম্।
অন্তঃস্মিতেন্দুসিত পাণ্ডুর গণ্ডদেশাং,
তাং বল্লভাং রহসি সংবলিতাং স্মরামি॥

বিদ্যাপক্ষে

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে।
কুচাগ্র শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥
অন্তরে ঈষৎ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরতের চন্দ্র যেন ত্রিলোক-মোহিত॥
নির্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥

দ্বিতীয়ার্থ কালীপক্ষে

রুধির-খর্পর হস্তে দিবানিশি যার।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার॥
উচ্চ পয়োধরপরি বান্ধিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী॥
অন্তরে গভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্য কালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে॥
অন্তর জগতে দেখি আলোক বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে॥

স্ববলভ সংবলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জনে স্মরি তারে গো তারিণী॥

(চৌরপঞ্চাশৎ, ভারতচন্দ্র, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৮)

পূর্বোল্লিখিত এই সব তাবৎ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ওমরের বিদ্রোহ।

* * * *

গিয়াসউদ্দীন আবুল্ ফৎহ্, ওমর ইবন্ ইব্রাহীম অল-খৈয়াম ইরান-দেশের নিশাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিন কিংবা সন ঠিকমত জানা যায়নি, এমন কি তাঁর মৃত্যুর সনও মোটামুটি ১১২৩ খ্রীস্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

খৈয়াম শব্দের অর্থের অর্থ তাম্বু নির্মাতা। এ ওজনের শব্দ বাঙলায় আরো আছে। 'কত্তাল' থেকে বাঙলা কোতয়াল, এবং 'খম্মার' থেকে 'খোঁয়ারী' (ভাঙা) শব্দ এসেছে। রান্নার মশলা-বিক্রেতা অর্থে বক্কাল শব্দও একদা বাঙলাতে সুপ্রচলিত ছিল—আরবীতে শব্দটির অর্থ 'মুদী' বা 'মশলা-বিক্রেতা।' ত্রিবর্ণের মূল ধাতুতে—যথা 'দ-খ-ল' 'দখল করা' 'ক-ত-ল' 'কোতল করা' দ্বিতীয় ব্যঞ্জন বর্ণকে দ্বিত্ব করে তাতে দীর্ঘ 'আ'-কার যোগ করলে যে কর্তাবাচক শব্দ উৎপন্ন হয় তার অর্থ 'ঐ কর্ম সে পুনঃ পুনঃ করে থাকে।' তাই 'খম্মার' অর্থ 'যে ঘন ঘন মদ খায়' (বাঙলায় তাই সে সকালবেলা খম্মারী বা খোঁয়ারী ভাঙে) অর্থাৎ 'পাইকারী মাতাল', 'মদ খাওয়া তার ব্যবসা'। 'কতল' করা যার ব্যবসা সে কোতয়াল ('কত্তাল'), 'জল্লাদ'ও ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। 'খয়য়াম' অর্থ 'যে পুনঃ পুনঃ তাম্বু নির্মাণ করে'—'তাম্বু-নির্মাণকারী'। বাঙলায় 'খইআম', 'খইয়াম' বা 'খৈয়াম' লিখলে মোটামুটি মূল উচ্চারণ আসে। অবশ্য 'খ'-র উচ্চারণ বাঙলা মহাপ্রাণ 'খ'-র মতো নয়—আমরা বিরক্ত হলে যে রকম 'আখ'-এর 'খ' অক্ষরটি উচ্চারণ করে থাকি অর্থাৎ ঘৃষ্ট্য কণ্ঠ্যব্যঞ্জন। স্কচের 'লখ' ও জর্মনের 'বাখ'-এর 'খ'-এর মতো। আসামীতে 'অহমিয়া'র 'হ' অনেকটা সেই রকম।

কিন্তু কবি ওমর তাঁবুর ব্যবসা করতেন না। ওটা তাঁর বংশের পদবী মাত্র। আজকের দিনের কোনো সরকার যে-রকম রাইটারজ বিল্ডিঙে চীফ সেক্রেটারী (সরকার) নন কিংবা কোনো ঘটক-পদবীধারী যে-রকম সমাজে কুলাচার্যের কর্ম করেন না। ওমর কিন্তু তাঁর পরিবারের এই উপাধিটি নিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি—

জ্ঞান-বিজ্ঞান ন্যায়-দর্শন সেলাই করিয়া মেলা
খৈয়াম কত না তাম্বু গড়িল ; এখন হয়েছে বেলা
নরককুণ্ডে জ্বলিবার তরে। বিধি-বিধানে কাঁচি
কেটেছে তাম্বু—ঠোক্কর খায়, পথ-প্রান্তের ঢেলা।

(লেখকের এমেচারী অক্ষম অনুবাদে রসিক পাঠক অপরাধ নেবেন না। অন্য কারো অনুবাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে-মধ্যে এ-ধরনের 'অনুবাদ' ব্যবহার করতে হয়েছে।)

এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন রুবাঈ জাতীয় শ্লোকে প্রায়শঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মিল থাকে—তৃতীয় ছত্রান্ত স্বাধীন। ইরানী আলঙ্কারিকরা বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষ মিলে বেশী ঝোঁক পড়ে এবং শ্লোক সমাপ্তি তার পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতা পায়। কথাটা ঠিক, কারণ আমরাও তেতাল বাজাবার সময় তৃতীয়ে এসে খানিকটা কারচুপি করলে সম মনকে ধাক্কা দেয় আরো জোরে। পাঠককে এই বেলাই বলে রাখি, তৃতীয় ছত্রে মিলহীন এই জাতীয় শ্লোক পড়ার অভ্যাস করে রাখা ভালো। নইলে নজরুল ইসলামের ওমর-অনুবাদ পড়ে পাঠক পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ কাজী আগাগোড়া ক ক খ ক মিলে ওমরের অনুবাদ করেছেন। কান্তি ঘোষ করেছেন বাঙলা রীতিতে, অর্থাৎ ক ক খ খ।

ভাগ্যক্রমে ওমরের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাকাপাকি শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি গণিতশাস্ত্রে

অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং অবসর কাটাবার জন্য দৈবেসৈবে চতুষ্পদী লিখতেন—তাঁর নামে প্রচলিত গজল, মসনবী বা অন্য কোনো শ্রেণীর দীর্ঘতর কবিতা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এইটুকু সংবাদ ছাড়া বাদবাকী কিংবদন্তী। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যাঁর জন্মের তারিখ কেন, সন পর্যন্ত জানা নেই, যাঁর পরলোক গমনের সন পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণাধীন, তাঁর সম্বন্ধে যে প্রচুর কিংবদন্তী প্রচলিত থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

তবে তিনি যে উত্তম গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। স্মরণ রাখা ভালো যে, ছাপাখানার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত অল্প লোকই গুরুর সাহায্য বিনা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কথিত আছে, বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম মুওয়াফফকের কাছে একই সময়ে তিনজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র শিক্ষালাভ করেন। এঁদের ভিতর খেলাচ্ছলে চুক্তি হয় যে, এঁদের কোনো একজন পরবর্তী জীবনে প্রভাবশালী হতে পারলে তিনি অন্য দু'জনকে সাহায্য করবেন। এঁদের একজন কালক্রমে প্রধান মন্ত্রী বা নিজাম-উল্-মুল্ক-এর পদ প্রাপ্ত হন। খবর পেয়ে দ্বিতীয় বন্ধু হাসন বিন্ সব্বাহ তাঁর কাছে এসে তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উচ্চ রাজকর্ম চান। বন্ধুর কৃপায় আশাতীত উচ্চপদ পেয়েও হাসন তাঁকে সরিয়ে নিজে প্রধান মন্ত্রী হবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কিন্তু শেষটায় ধরা পড়ে বাদশার হুকুমেই রাজপ্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত হন। হাসন প্রতিশোধ নেবার জন্য এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গোপন আততায়ী দিয়ে অনেক লোককে হত্যা করিয়ে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ক্রুসেডের একাধিক খ্রীস্টান নেতা এইসব গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন। এরা ভাঙ জাতীয় এক প্রকার হশীশ্ সেবন করতো বলে এদের নাম হয়েছিল 'হুশীশীয়য়ুন' এবং ইংরিজী 'এ্যাসাসিন'—গুপ্তঘাতক—এই শব্দ থেকেই অর্বাচীন

লাতিন তথা ফরাসীর মাধ্যমে এসেছে। অনেকে বলেন, পরবর্তী-কালে নিজাম-উল্-মুল্ক যে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন, সেও হাসন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের সম্বন্ধে লেখকের 'অরিজিন অব দি খোজা' পুস্তক লেখকের বাল্য রচনা বলে দ্রষ্টব্যের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

ওমরকে যখন নিজাম-উল্-মুল্ক উচ্চপদ দিতে চাইলেন তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নির্জনে অনটনবিহীন জীবনযাপনের সুবিধাটুকু মাত্র চাইলেন। এ তো জানা কথা। যে ব্যক্তি স্বর্গ-সুখ বলতে বোঝে,

> সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
> খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়
> মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু স্বর—
> সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।
>
> (কান্তি ঘোষ)

কিংবা—

> আমার সাথে আসবে যেথায়—দূর সে রেখে শহরগ্রাম
> এক ধারেতে মরু তাহার, আর একদিকে শষ্প শ্যাম।
> বাদশা-নফর নাইকো সেথা—রাজ্য-নীতির চিন্তা-ভার;
> মামুদ শাহ?—দূরে থেকেই করব তাঁকে নমস্কার।
>
> (কান্তি ঘোষ)

তার রাজপদ নিয়ে কি হবে? নিজাম-উল্-মুল্ক বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন, ওমরের খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রত্যাখ্যান মৌখিক বিনয় নয় এবং তাঁর জন্য সচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। কবিও কখনো তাঁর মত পরিবর্তন করেননি। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যের মূল সুর ঐটিই।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ডাক পড়লো রাজদরবারে—পঞ্জিকা সংশোধন করে দেবার জন্য। ইরানীদের 'নওরোজ' বা নববর্ষ আসে বসন্ত ঋতুতে, কিন্তু বহু শত বৎসর লীপ ইয়ার গোনা হয়নি

বলে তখন আর নববর্ষ বসন্ত ঋতুতে আসছিল না। ওমর ঐ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দিলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে কবিরূপে যে ব্যক্তি বিশ্বজগতে বিখ্যাত তিনি আসলে ছিলেন বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, ফিটস্জেরাল্ডের মাধ্যমে ইয়োরোপে প্রচারিত হবার পূর্বেই ওমরের বিজ্ঞানচর্চা ফ্রান্সে অনূদিত হয়ে সেখানে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান লেখক এসব লেখা দেখবার সুযোগ পায়নি, তাই এনসাইক্লোপিডিয়ার 'কোনিক্ সেক্শন' অনুচ্ছেদ থেকে ইয়োরোপে ওমরের বৈজ্ঞানিক যশ সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"Greek mathematics culminated in Apollonius. Little further advance was possible without new methods and higher points of view. Much later, Arabs and other Muslims absorbed the classical science greedily; it was the Persian poet Omar Khayyam, one of the most prominent mediaeval mathematicians, with his remarkable classification and systematic study of equations, which he emphasized, who blazed the way to the modern union of analysis and geometry. In his "Algebra" he considered the cubic as soluble only by the intersection of conics, and the biquadratic not at all."

শেষ ছত্রটির বাঙলায় অনুবাদ মূল ইংরিজি, এমন কি আধুনিক বাঙলা কবিতার চেয়েও শক্ত হয়ে যাবে বলে গোটা টুকরোটাই অতি অনিচ্ছায় ইংরিজিতেই রেখে দিতে বাধ্য হলুম। বৈজ্ঞানিক পাঠক বিনা অনুবাদেই এটি বুঝতে পারবেন, প্রাঞ্জল অনুবাদেও আমাদের মতো অবৈজ্ঞানিকের কোনো লাভ হবে না।

ইরানের অধিকাংশ গুণীই একমত যে, ওমর তাঁর জীবনের প্রায় সব সময়টুকুই কাটিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চায় এবং অতি অল্প সামান্য সময় 'নষ্ট' করেছেন কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায়। তাই দীর্ঘ কবিতা লেখবার ফুরসৎ তাঁর হয়ে ওঠেনি—এমন কি রুবাঈগুলোও গীতিরস দিয়ে সরস করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি।

গণিত এবং বিশেষ করে জ্যোতিষচর্চার ফল ওমরের কাব্যে পদে পদে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গ্রহ-নক্ষত্র যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে চলে তার থেকেই তিনি দৃঢ় মীমাংসায় উপনীত হন যে, মানুষেরও কোনো প্রকারের স্বাধীনতা নেই, তার কর্মপদ্ধতি স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকারই সে পায়নি। তাই—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।

(সত্যেন দত্ত)

পৃথ্বী হ'তে দিলাম পাড়ি, নভঃগেহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিদ্যাটা মোর উঠলো কেঁপে কাটলো কত ধাঁধার ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্যলিখন—ওইখানে গোল রইল মোর।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু এস্থলে আমি ওমর-কাব্যের মল্লিনাথ হবার দুরাশা নিয়ে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইনি। ওমরের নামে প্রচলিত প্রায় ছ'শটি রুবাইয়াৎ ইরানী বটতলাতেও পাওয়া যায়—পার্টিশনের পূর্বে কলকাতার ফার্সী বটতলা তালতলা অঞ্চলেও পাওয়া যেত। তার অতি অল্পই অনুবাদ করেছেন ফিটস্‌জেরাল্ড এবং সেই ছ'শ-র কটি কবিতা ওমরের নিজস্ব, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা এখনো শেষ হয়নি—আমার বিশ্বাস কখনো হবে না। সেই ছ'শ চতুষ্পদীর টীকা পড়ার উৎসাহ ও ধৈর্য রসিকজনের থাকার কথা নয়—পণ্ডিতের থাকতে পারে। আমি রসিকের সেবা করি।

তাই আমিও ওমরের সামান্যতম ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করার চেষ্টা করছি এবং তাও শুধু ওমরের বিদ্রোহী মনোভাব দেখাবার জন্য—কারণ ঐখানেই নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

ওমরের প্রধান বিদ্রোহ ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে :—

খাজা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জি এই
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো, ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।

(কাজী সাহেবের অনুবাদ)

O master ! grant us only this, we prithee ;
Preach not ! But mutely guide to bliss,
we prithee !
"We walk not straight"—Nay,
it is thou who squintest !
Go, heal thy sight, and leave us in peace,
we prithee !

(কার্পের অনুবাদ)

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক রাজা-রাজড়ার শৌর্যবীর্য নিয়ে যে-সব কবি ফিরদৌসীর ন্যায় আস্ফালন করে বর্তমানের আনন্দকে অবহেলা করতেন তাঁদের সম্বন্ধে বলছেন—

ভাগ্য-লিপি মিথ্যা সে নয়—ফুরোয় যা' তা ফুরিয়ে যাক্,
কৈকোবাদ আর কৈখসরুর ইতিহাসের নামটা থাক।
রুস্তম আর হাতেম-তায়ের কল্পকথা—স্মৃতির ফাঁস—
সে-সব খেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে আজকে এস আমার পাশ।

(কান্তি ঘোষ)

দরবেশ-সূফীরা করতেন কৃচ্ছ্রসাধন এবং যোগচর্চা। পূর্বেই নিবেদন করেছি, তাঁরা নৃত্যের সঙ্গে চিৎকার করতেন নাম-জপ, তাঁদের বিশ্বাস, ঐ করেই ভগবদ্‌প্রেম এবং চরম মোক্ষ পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটি তার না জানি কতই গুণ—
জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর দরবেশী সাঁই যাই বলুন—
গগনভেদী চীৎকারে তাঁর খুলবে নাকো মুক্তিদ্বার,
অস্থিতে এই মিলবে যে খোঁজ সেই দুয়ারের কুঞ্চিকার।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু সবচেয়ে বেশী চতুষ্পদী তিনি রচনা করেছেন দার্শনিক এবং পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে। সেখানে তিনি জ্যোতির্বিদ ওমরকেও বাদ দেননি।

অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান
বীজগণিতের সূত্র-রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান ;
বিদ্যারসে যতই ডুবি, মনটা জানে মনে (মানে ?) স্থির—
দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রসজ্ঞানে নেই গভীর।

অর্থহীন, অর্থহীন, সমস্তই অর্থহীন। তাই ওমরের বার বার কাতর রোদন, দরদী ফরিয়াদ—

হেথায় আমার আসাতে প্রভু হননি তো লাভবান
চলে যাবো যবে হবেন না তিনি কোনো মতে গরীয়ান।
এ কর্ণে আমি শুনিনি তো কভু কোনো মানবের কাছে
এই আসা-যাওয়া কি এর অর্থ—খামখা পোড়েন টান।

(লেখক)

তাই ওমরের শেষ মীমাংসা—একবার মরে যাবার পর তুমি আর এখানে ফিরে আসবে না। অতএব যতটুকু পারো, যতক্ষণ পারো দর্শন-বিজ্ঞান-সাঁই-সূফীদের ভুলে গিয়ে সাকী সুরা নিয়ে নির্জন কোণে আনন্দ করো।

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব—লাও ঝটপট—রাঙানো গোলাপী রাগে।
হায়রে মূর্খ ! সোনা দিয়ে মাজা তোর কি শরীর খানা—?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই
কি কাজে লাগে।

(লেখক)

কিন্তু একটা জিনিস ভুল করলে চলবে না। ওমর খাঁটি চার্বাকপন্থী এবং ঐ জাতীয় লোকায়তীদের মতো নন। 'ঋণ করে ঘি খাও, কারণ দেহ ভস্মীভূত হলে ঋণ তো আর শোধ করতে হবে না,' অর্থাৎ ইহসংসারে কিংবা পরলোকে অন্য কারো প্রতি তোমার

কোনো নৈতিক দায়িত্ব—মরাল রেসপনসিবিলিটি নেই—এ তত্ত্বেও ওমর বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর একমাত্র উপদেশ—

কারুর প্রাণে দুখ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর-আশিস্ লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি স'য়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।

(নজরুল ইসলাম)

গুণীরা বলেন, 'কুরানই কুরানের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা।' তরুণদের আমি প্রায়ই বলি, 'রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা—ঐ কাব্যই বার বার অধ্যয়ন করো, অন্য টীকার প্রয়োজন নাই।' ওমরই ওমরের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লিনাথ এবং কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।

নলিনীর দলে শিশিরের মত মোদের জীবন, হায়—
শূন্যগর্ভ বাতাহত হয়ে চলিছে সমুখ পানে।
আমার জীবন তেমনি কাটিল, এবার হয়েছে শেষ
কাঁপন লেগেছে আমার শিশিরে—চলে যাবে কোন্‌খানে।

গভীর দুঃখে হৃদয় আমার সান্ত্বনা নাহি মানে
এ মহাপ্রয়াণ দুর্দমনীয় বেদনা বক্ষে হানে।
সাধনায় জানি, জীবন মৃত্যু প্রভেদ কিছুই নেই
তবুও কাতর বিদায়ের ক্ষণ সমুখে আসিল যেই।

রক্তপদ্মপত্রের মত মানব জীবন ধরে,
একে একে সব খসে পড়ে ভূমি পরে
ঝরার সময় লাগে তার গায়ে যে ক্ষুদ্র কম্পন
সেই তো জীবন।

(শ্রমণ রিয়োকোয়ান)

কবিতা

মার্জারনিধন কাব্য

ইন্দ্রলুপ্ত

নন্দলালের দেয়াল-ছবি

ইরানের অত্যধিক আদবকায়দা

ক্রিকেট

নববর্ষ, ১৩৬৮

প্রবাসীর চিঠি

মার্জারনিধন কাব্য

কোন্ দেবে পূজা করি কোন্ শীর্নী ধরি ?
গণপতি, মৌলা-আলী, ধূর্জটি, শ্রীহরি ?
মুশকিল্-আসান্ আর মুর্শীদ মস্তান্
কোম্পানি কি মহারানী, ইংরেজ, শয়তান ?
হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, যেবা আছ যথা
ইস্পাহানী, ডালমিঞা—কলির দেবতা।
সবারে স্মরণ করি সিতুমিঞা ভনে
বেদরদ বেধড়ক ভয় নাহি মনে॥

ইরান দেশের কেচ্ছা শোনো সাধুজন
বেহদ্ রঙীন কেচ্ছা, বহুৎ বরণ।
এস্তার তালিম পাবে করিলে খেয়াল
রোশনী আসিবে দিলে ভাঙিয়া দেয়াল।
পুরানা যদিও কেচ্ছা তবু হর্বকৎ
সমঝাইয়া দিবে নয়া হাল হকীকৎ॥

ইরান দেশেতে ছিল যমজ তরুণী
ইয়া রঙ, ইয়া ঢঙ, নানা গুণে গুণী।
কোথায় লায়লী লাগে কোথায় শিরীন
চোখেতে বিজলী খেলে ঠোঁটে বাজে বীণ।
ওড়না দুলায়ে যবে দুই বোন যায়
কলিজা আছাড় খায় জোড়া রাঙা পায়।
এ্যাসা পীরিতি তোলে ফকিরেরও জানে
বেহুঁশ হইয়া লোক তারীফ বাখানে।
দৌলতও আছিল বটে বিস্তরে বিস্তর
বাপ দাদা রাখি গেলা চাকর-নফর।

ধন জন ঘর বাড়ি তালাব খামার
টাকা কড়ি জওয়াহের এস্তারে এস্তার।
তাই দুই নারী চায় থাকিতে আজাদ
কলঙ্কের ভয়ে শুধু বিয়ে হৈল সাধ।
তখন করিল শর্ত সে বড় অদ্ভুত
সে শর্ত শুনিলে ডর পায় যমদূত।
বলে কিনা প্রতি ভোরে মিঞার গর্দনে
পঞ্চাশ পয়জার মারি রাখিবে শাসনে।
এ বড় তাজ্জব বাৎ বেতালা বদ্‌খদ্‌
এ শর্ত মানিবে কেবা হয় যদি মর্দ?
দুল্‌হা বরেতে ছিল পাড়া ছয়লাপ
শর্ত শুনে পত্রপাঠ হয়ে গেল সাফ।
সিতু মিঞা বলে সাধু এ বড় কৌতুক
মন দিয়া কেচ্ছা শোনো পাবে দিলে সুখ॥

শীত গেল বর্ষ গেল আসিল বাহার
ফুলে গুলে ইস্‌ফাহান হৈল গুলজার।
শীরাজ তব্রীজ আর আজরবৈজান
খুশীতে ভরপূর ভেল জমিন আসমান।
শুধু দুই ভাই নাম ফিরোজ মতীন
পেটের ধান্দায় মরে দুঃখে কাটে দিন।
অবশেষে ছোট ভাই বলে ফিরোজেরে
"কি করে বাঁচিবে বলো, কি হবে আখেরে
তার চেয়ে জুতা ভালো চলো দুই জনে
শাদী করি পেট ভরি দু মেয়ের সনে।"
দুআভুআ ফিরোজের মন মাঝে হয়
শাদীতে আয়েশ বটে জুতারও তো ভয়।

হদীসের লাগি ঘাঁটে কুরান পুরাণ
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান ॥

মজলিস জৌলুস করি দুনিয়া রওশন
জোড়া শাদী হয়ে গেল খুশ ত্রিভুবন।
চলি গেলা দুই ভাই ভিন্ন হাবেলিতে
মগ্ন হইলা মত্ত হইলা রসের কেলিতে।
পয়জারের ভয়ে নারি করিতে বয়ান
সিতু ভণে চুপিসারে শুনে পুণ্যবান ॥

তিন মাস পরে বুঝি খুদার কুদ্রতে
আচম্বিতে দু ভায়েতে দেখা হল পথে।
কোলাকুলি গলাগলি সিনা কলিজায়
মরি মরি মেলামেলি করে দুজনায়।

"তোমার মাথায় টাক নাই কেন?"
শুধায় ফিরোজ ভাই
মানিয়া তাজ্জব উত্তরে মতীন
"টাক কেন বলো তাই?"
কাঁচুমাচু হয়ে পুছিল ফিরোজ
"জোরে কি মারে না চটি?"
"আরে দুত্তোর হিম্মত কাহার
আমি কি তেমনি বটি?
বাখানিয়া বলি শোন কান পেতে
তরতিব কাহারে কয়
আজব দুনিয়া আজব চিড়িয়া
মামেলা ঝামেলা নয়।

তাই বসিলাম তলওয়ার হাতে
বীবী দিলা খানা আনি
কোর্মা পোলাও তন্দুরী মুর্গী
ঢাকাই বাখরখানী।
খানা আইল যেই বীবীর পেয়ারা
বিড়াল আসিল সাথে
যেই না করিল মরমিয়া 'ম্যাঁও'
খাপটা না তুল্যা হাতে,—
খুল্যা তলোয়ার এক কোপে কাট্যা
ফালাইনু কল্লাডারে
তাজ্জব বীবী আক্কেল গুড়ুম
জবানে রা'টি না কাড়ে।
গুস্‌সা কৈরা কই 'এসব না সই
মেজাজ বহুৎ কড়া
বরদাস্ত নাই বিলকুল আমার
তবিয়ৎ আগুনে গড়া।'
তার পর কার ঘাড়ে দুইডা মাথা
করিবে যে তেড়িমেড়ি?"
সিতু মিঞা কয় নিশ্চয় নিশ্চয়
বাঘিনী পরিল বেড়ি।

"ক্যাবাৎ," "ক্যাবাৎ" বলি হাওয়া করি ভর
চলিলা ফিরোজ মিঞা পৌঁছি গেলা ঘর।
মিলেছে দাওয়াই আর আন্দেশা তো নাই
খুদার কুদ্রকে ছিল তালেবর ভাই।
তার পর শোনো কেচ্ছা শোনো সাধুজন
ঠাস্যা দিল সেই দাওয়া পুলকিত মন।

সে রাত্তে খানার ওক্তে খুল্যা তলোয়ার
কাট্যা না ফালাইল মিঞা কল্লা বিল্লিডার।
চক্ষু দুইডা রাঙ্গা কর্য্যা হুঙকারিয়া কয়
“ভবিষ্যৎ আমার বুরা গর্বড় না সয়।
হুশিয়ার হয়ে থেকো নয় সর্বনাশ।”
সিতু মিঞা শুনে কয়, শাবাশ, শাবাশ॥

হায়রে বিধির লেখা, হায়রে কিস্মৎ
জহর হইয়া গেল যা ছিল শর্বৎ।
ভোর না হইতে বীবী লয়ে পয়জার
মিয়ার বুকেতে চড়ি কানে ধরি তার।
দমাদম মারে জুতা দাড়ি ছিঁড়ে কয়
“ভবিষ্যৎ তোমার বুরা, বরদাস্ত না হয়?
মেজাজ চড়েছে তব হয়েছ বজ্জাৎ?
শাবুদ করিব তোমা শুনে লও বাৎ।
আজ হৈতে বেড়ে গেল রেশন তোমার
পঞ্চাশ হৈতে হৈল একশ’ পয়জার।”
এত বলি মারে কিল মারে কানে টান
ইয়াল্লা ফুকারে সিতু, ভাগ্যে পুণ্যবান॥
কোথায় পাগড়ী গেল কোথায় পাজামা
হোঁচট খাইয়া পড়ে কভু দেয় হামা।
খুন ঝরে সর্ব অঙ্গে ছিঁড়ে গেছে দাড়ি
ফিরোজ পোঁছিল শেষে মতীনের বাড়ি।
কাঁদিয়া কহিল “ভাইয়া কি দিলি দাওয়াই
লাগাইনু কামে এবে জান যায় তাই।”
বর্ণিল তাবৎ বাৎ, মতীন শুনিল
আদর করিয়া ভায়ে কোলে তুলি নিল।

বুলাইয়া হাত মাথে বুলাইয়া দেহ
"বিড়াল মেরেছ" কয়, "নাই তো সন্দেহ।
ব্যাকরণে তবু, দাদা, কৈলা ভুল খাঁটি।
বিলকুল বরবাদ সব গুড় হৈল মাটি।
আসল এলেমে তুমি করোনি খেয়াল
শাদীর পয়লা রাতে বধিবে বিড়াল।"
বাণীরে বন্দিয়া বান্দা বান্দিলো বয়ান
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান॥

*　　　*　　　*

মল্লিনাথস্য —
স্বরাজ লাভের সাথে কালোবাজারীরে
মারনি এখন তাই কর হানো শিরে।
শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল
না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল॥*

করি শেষ সোক্রাতেস যৌবনের পঞ্চাশ বৎসর
উদ্বাহু হইয়া প্রৌঢ় তোলে তার প্রীত কণ্ঠস্বর
দেবালোকে সম্বোধিয়া 'হে অমর্ত্য সুরলোকবাসী
লহ মোর ধন্যবাদ। আসক্ত লিপ্সার মোহ নাশি
দিয়েছ যে শান্তি হৃদে তারি তরে জানাই প্রণাম
এইবারে দেবগণ পূর্ণ কর শেষ মনস্কাম—
এই যে দেহের রক্তে এখনো রয়েছে যৌন-ক্ষুধা
নির্মূল করিয়া ফেলো, পাবো শেষ শান্তি রস সুধা॥'

* ইরানে এ কাহিনী সবিস্তর বলা হয় না। শুধু বলা হয়, 'গুরবে কুশতন, শব-ই-আওওয়ল'। অর্থাৎ গুরবে=বিড়াল, কুশতন্=মারা, শব=রাত্রি, আওওয়ল=প্রথম। সোজা বাঙলায়, 'পয়লা রাতেই মারবে বেরাল।'

ইন্দ্রলুপ্ত

(আবু সয়ীদ আইয়ুবকে)

ঘরের দাওয়ায়, তেঁতুলের ছাওয়ায় মাঠের হাওয়ায়
খাওয়া-দাওয়ায়
শান্তি নেই, গরমেরও ক্লান্তি নেই।
সবুজ ঘাস হল হলদে, তারপর ফিকে।
দস্যি কাল-বোশেখী বাঁশের বনে ত্রিবিক্রমের বিক্রমে
তাদের কোমর ভেঙে নামল মাঠে।
লাথি মেরে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল তার শুকনো শেকড়
বেরিয়ে পড়ল শুভ্র, উষ্ণ, নগ্ন মৃত্তিকা।
মাঠের টাক—
আমার টাকের মতো।

কলনের ঘন বনে
নিদাঘের তপ্ত কাফে কোণে
তুমি বসে আনমনে।
—আমার চুলের ঘুঙুর তোমার নাচাল নয়ন নীল
কালোতে নীলেতে নাৎসি হারাতে পেল কি গোপন মিল ?-
রাইনের ওয়াইনের মৃদু গন্ধ,
অন্ধ ভিখারীর ছবি দেয়ালেতে ডাইনে,
একচোখা রেডিয়োটা করে কটমট
ভয়ে ভয়ে বললাম, 'ফ্রলান, Gruess Gott !
বেতারের সুরটা টাঙ্গো না ফক্‌স্ট্রট ?'
চট করে চটে যাও পাছে।
তুমি রূপসিনী বন্দিনী
নরদিশী নন্দিনী।

তোমার প্রেম এল যে
শ্রাবণের বর্ষণের ধারা নিয়ে
চারিদিকে টেনে দিয়ে
ঘনকৃষ্ণ সজল যামিনী যবনিকা।
সে বিরাট বিলুপ্তির বিস্মরণে
শুধু আমার চেতনার ছয় ঋতু
আর তোমার চেতনার চার ঋতুর বিজড়িত নিবিড় স্পর্শ—

লাল ঠোঁট দিয়া বঁধুয়া আমার
পড়িল মন্ত্র কাল
দেহলি রুধিয়া হিয়ারে বান্ধিল
পাতিয়া দেহের জাল।
মুখে মুখ দিয়া হিয়ায় হিয়ায়
পরশে পরশ রাখি
বাহু বাহু পাশে ঘন ঘন শ্বাসে
দেহে দেহ দিল ঢাকি।
হঠাৎ দামিনী ধমকালো
বিদ্যুৎ চমকালো
দেখি, নীল চোখ
কাতরে শুধাই একি
তোমার নয়নে দেখি,
আমার দেশের নীলাভ আকাশ
মায়া রচিছে কি ?
তোমার বক্ষতলে
আমার দেশের শ্বেতপদ্ম কি
ফুটিল লক্ষ দলে ?

রাত পোহাল। বর্ষণ থেমেছে।
কিন্তু কোথায় শরতের শান্তি, হেমন্তের পূর্ণতা?
ঋতুচক্র গেল উলটে—
যমুনার জলও একদিন উজান বয়েছিল।
কোন্ ঝড় তোমাকে নিয়ে গেল ছিনিয়ে
কোন্ ঝড় আমাকে নিয়ে গেল ঝেঁটিয়ে?
বেরিয়ে এল মাঠের টাক,
আমার টাক।
আমার জীবনে ইন্দু লুপ্ত
আমার কপালে ইন্দ্রলুপ্ত॥

১৯৩৯

দেশের পাথর সুলেমান শার
তখতের চেয়ে বাড়া,
বিদেশের ফুল হার মেনে যায়
দিশী কাঁটা প্রাণ কাড়া।
মিশর দেশের সিংহাসনেতে
বসিয়া ইসুফ রাজা
কহিত, 'হায়রে, এর চেয়ে ভালো
কিনানে ভিখারী সাজা।'

সন্‌গে ওতন্ অজ্‌ তখতে সুলেমান বেশতর,
খারে ওতন্ অজ্‌ গুলে রেহান বেহতর,
ইউসুফ কি দর মিস্‌র্ পাদশাহী মীকরদ
মীগুফ্‌ৎ 'গদা বুদনে কিনান খুশতর।'

নন্দলালের দেয়াল-ছবি

তুর্কী-নাচন নাচেন নন্দবাবু
চতুর্দ্দিকে ছেলেরা সব কাবু।
তুলির গুত্তো ডাইনে মারেন, মারেন কভু বাঁয়ে
ঘাড় বাঁকিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে, দাঁড়িয়ে এক পায়ে।
অষ্টপ্রহর চর্কীবাজী কীর্ত্তি-মন্দিরে
ছেলেরা সব নন্দলালকে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে।

হচ্ছে 'নটীর পূজা'
রানীর সঙ্গে হল নটীর পূজা নিয়ে যুঝা।
বরাঙ্গনা ভিক্ষু নটীর নৃত্যচ্ছন্দ ধূপ—
তুলির আগুন পরশ পেয়ে নিল আবার সেই অপরূপ-রূপ
—বহু যুগের পরে—
চৈত্যভবন ভরে।

গানের আসর পারা
—সন্ধ্যাকাশে ফোটে যেন তারার পরে তারা—
হেথায় সেতার কাঁপে ভীরু, হোথায় বীণার মীড়
আধাফোটা গুঞ্জরণের ভিড়
তার পিছনে মৃদু করুণ-বাঁশি
গুমগুমিয়ে থেকে থেকে উঠছে ভেসে খোল-মৃদঙ্গের হাসি।

এ যেন সুন্দরী—
প্রথমেতে নীলাম্বরী পরি,
সর্ব অঙ্গে জড়ায় যেন অলঙ্কারের জাল ;—
তিলোত্তমা গড়েন নন্দলাল।

চিত্রপটে কিন্তু নটী ফেলে অলঙ্কার
শুনি যেন বলে চিত্রকার,—
"তথাগতের দয়ায় যেন তেমনি ঘুচে তোমা সবার সকল অহঙ্কার।"

সাদামাটার রক্তবিহীন ঠোঁটে
লজ্জা সোহাগ ফোটে,
পাংশু দেয়াল আনন্দে লাল নন্দলালের লালে
তুলির চুমো যেই না খেলো গালে ॥*

আমি তুমি হনু, তুমি আমি হলে, আমি দেহ তুমি প্রাণ,
এর পরে যেন কেহ নাহি বলে তুমি আন আমি আন।

'মন্ তু শুদম্ তু মন্ শুদী, মন্ তন্ শুদম্ তু জাঁ শুদী
তা কসী ন গোয়েদ্ বাদ্ আজ্ ঈঁ মন্ দিগরম্ তু দিগরী।'

যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম ॥

* শ্রীযুত নন্দলাল বসুর বরদারাজ্যের 'কীর্তি-মন্দিরে' রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র ফ্রেস্কো ছবি আঁকিবার সময় লেখক কর্তৃক এক বান্ধবীকে আসিয়া দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র।

ইরানের অত্যধিক আদবকায়দা

খুদা তুমি দিলে বহুৎ জ্ঞান,
শেষ রহস্য এই বারেতে কর সমাধান।
ইরান দেশের লোক
কসম খেয়ে বলতে পারি নয় এরা উজবোক্।
বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, সাহস আছে ঢের
সিঙি লড়ে, মোকাবেলা করে ইংরেজের।
তবে কেন ঢুকতে গেলেই ঘরে
সবাই এমন ঠেলাঠেলি করে ?
দোরের গোড়ায় থমকে দাঁড়ায় ভিতর পানে চায়,
'আপনি চলুন', 'আপনি ঢুকুন', দাঁড়িয়ে কিন্তু ঠায়।
হাসি-খুশী বন্ধ হঠাৎ গল্প যে যায় থেমে
ঠেলাঠেলির মধ্যিখানে উঠছে সবাই ঘেমে।
অবাক হয়ে ভাবি সবাই কেন এমন করে,
দিবা-দ্বিপ্রহরে
কি করে হয় ঘরের মাঝে ভূত ?
তবে কি যমদূত ?
সলমনের জিন্ ?
কিম্বা গিলটিন ?
ঢুকলে পরেই কপাৎ করে কেটে দেবে গলা,
তাই দেখে কি দোরে এসে বন্ধ সবার চলা ?

কয়লাওয়ালার দোস্তী ? তওবা !
ময়লা হতে রেহাই নাই
আতরওয়ালার বাক্স বন্ধ
দিলখুশ তবু পাই খুশবাই।

ক্রিকেট

হুজুগে মেতে ক্রিকেট খেলা দেখিতে যদি যাও
—মাথাটি মোর খাও—
গাড়োলপানা প্রশ্ন মেলা ঝেড়ো না খালি খালি
খেলাটা যদি না বোঝো তবে দিয়ো না হাততালি
এলোপাতাড়ি বেগর মোকা ক্যাবলা হাবার মত।
রয়েছে শত শত
কায়দা কেতায় ওকীবহাল খেলার সমঝদার
শুধিয়ো নাকো ওদের মিছে প্রশ্ন বেশুমার।
শুধাও যদি মানা না শুনে কি হবে ফল, বলি,
ট্যারচা-মুখো জবাব দিয়ে থামাবে ঢলাঢলি।

যেমন ধরো, জানো না কিছু, শুধালে ভয়ে ভয়ে
যে গুণী পাশে আছেন বসে 'দিন তো মোরে কয়ে
মনে না যদি করেন কিছু, এক্‌স্‌ক্যুজ মি স্যর,
কাঠের ঐ ডাণ্ডাগুলো কি নাম হয় তার?'

পাশের যিনি হইবে মনে রাগত হন যেন,
ঘ্যানর ঘ্যান লাগিবে ভালো কেন!
বলেন তিনি, মিনিট তিন থাকিয়া নিশ্চুপ
'উইকেট কয়'। গলাতে যেন রয়েছে বিদ্রূপ।
হকচকিয়ে দিলে তো তুমি অনেক ধন্যবাদ;
খানিক পরে তবুও মনে হইল তব সাধ
এলেম নব হাঁসিল লাগি। কিন্তু তাতে ভয়
তেড়ে না যান এবার তিনি—গুণীতো নিশ্চয়—
থাকিয়া চুপ, ভাবিয়া খুব, গলাটি সাফ করে
চুলকে ঘাড় শুধালে মৃদুস্বরে

'উইকেট কয়? বেশক্ কথা; লেকিন কন্ স্তর,
এসবগুলো হোথায় কেন, কি হয় উপকার?'
কটমটিয়ে এবার গুণী তাকান তব পানে
বাসনা যেন প্রাণটি তব হানেন আঁখি বাণে—
হুঙ্কারিয়া হাঁকেন শেষে 'ওগুলো কার তরে?-
খেলাড়ি সব বসিবে বলে ক্লান্ত হ'লে পরে।'

গঙ্গার পার— মধুর গন্ধ ত্রিভুবন আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

(হাইনে)

আম্ গাঙ্গেস্ ডুফ্‌টেট্‌স্ লয়েস্টট্‌স্
উনট্ রীসেন্‌বয়মে ব্লুয়েন,
উনট্ শ্যোনে স্টিলে মেনশেন
ফর্ লটসব্লুমেন ক্লিয়েন।

কোথা হায় সেই আনন্দনিকেতন?
স্বপ্নেই শুধু দেখি সে ভুবন আমি,
রবিকর এল, কেটে গেছে হায়, থামী
ফেনার মতন মিলে গেল এ স্বপন।

(আইটেল শাউম্)

আখ, ইয়েনেস লান্ট ডের্ ভনে,
ডাস্ জে ইষ্ অফ্‌ট্ ইম্ ট্রাউম;
ডখ্ কম্‌ট্ ডী মর্গেন্‌জনে,
ফেরফ্লীস্‌ট্‌স্ ভী আইটেল্‌শাউম্।

নববর্ষ, ১৩৬৮

স্নেহের মুকুল,

তুমি তো আক্কেল ধরো, বলতো আমারে
নববর্ষ লয়ে কেন ফাটাফাটি প্রতি বারে।
পুরনো বছরটারে বাতাস কুলার
দিয়ে কেন ঝাঁটা দিয়ে করে দেয় বার ?
কি দোষ করেছে, কও, পুরানো বছর
তারেই তো নিয়ে, বাবা, করে নিলে ঘর
তিনশ পঁষট্টি দিন। গেল কি খারাপ
উঠেনি কি সূর্য বুঝি, দেয়নি কি তাপ ?
উঠেনি বাজারে মাছ ভালমন্দ যাই,
ব্লেডেতে কাটিয়া মাছ দিন কাটে নাই ?
মত্ত খেয়ে চাচা বুঝি হয় নাই টং
পুপু পুটু মীরা মাই করে নাই ঢং
যার যাহা অভিরুচি ? টেটেন পটের
বীবী সেজে বেরয়নি ? মেজদা ঘটের
বুদ্ধিটি খরছ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
মাথায় বুলায়ে হাত এনেছে এস্তের
খরছ করেনি তারো বেশী ? পদিপিসী
করেনি ক্যাটের ক্যাট ? ভাঙ্গা ফাটা শিশি
করেনি কি বিক্রি, রামা, টুপাইস তরে
বৌদি চষেনি মাঠ চক্করে চক্করে
টাট্টু ঘোড়া যেন হায়! যাবে অলিম্পিকে।
বড়দা করেনি রাঙা কড়িটারে পিকে ?
পাকু মাম গুড়গুড়ি বাবুজী জামাই
করোনি কি দিবারাত্রি শুধু খাই খাই ?

রকেতে দুজনা বসি করিনি কি প্ল্যান
টুপাইস কামাবো বলি—খুদা যদি দ্যান।
কে জানে জর্মনি বসে হয়তো ভাইয়া
করে রেখে আছে ব্রণ্ড গণ্ডা দুই বিয়া।

২

তবে কি পুরানা সাল ছিল দিশী সস্তা
তাহারে বিদায় দিয়া ভরি বস্তা বস্তা
আনিবে জর্মন মাল কিংবা সে বিলাতি
নববর্ষ—গ্যারান্টিড পাকা সে বেসাতি।
চলিবে দশটি সন এক নববর্ষে
কই, দিদি, বলে নাতো চোখেতে সরষে—
দেখি যবে, বলে কিনা এরেও বিদায়
দেওয়া হবে। বারো মাস হয়ে গেলে, হায়!

৩

তুমি তো সেয়ানা মেয়ে চালাও সংসার
বলো দেখি তবে কেন এ হেন ব্যাভার?—
বাজে খর্চা একদম—পুরানাটা যবে
দিব্য কাজ দিয়ে যায়; নয়া আনা তবে?

অমরাবতীর সওগাত এই ফুল এল ধরাতলে,
ফুলের পুণ্যে পাপী-তাপী লাগি স্বরগের দ্বার খোলে।
ওগো ফুলওয়ালী, কেন ফুল বেচো তুচ্ছ রূপার দরে?
প্রিয়তর তুমি কি কিনিবে, বলো, রূপো দিয়ে তার তরে?

"গুল্ নিমতীস্ত্ হিদ্য়া ফিরিস্তাদে আজ্ বেহেশ্ৎ,
মরহুম্ করীম্তর্ শওদ্ আন্দর্ নইম্-ই গুল্;
আয় গুল্-ফরূশ গুল্ চি ফরূশী বরায়ে সীম?
ওয়া আজ্ গুল্ অজীজ্তর চি সিতানী বি-সীম-ই-গুল্?"

প্রবাসীর চিঠি

শ্রীমান খসরু বাবাজীউ,

"সুবুদ্ধি গোয়ালার কুবুদ্ধি হইল
ভাঁড়েতে রাখিয়া দুধ পীরকে ফাঁকি দিল
মাণিক পীর ভবনদী পার হইবার না—"

আমার হ'ল তা ;—

ছিলাম সুখে সিলেট জেলায় ঢুকল মাথায় পোকা
কাণ্ড দেখে বুঝল সবাই লোকটা গবেট বোকা।
বহুত দেশ তো দেখা হ'ল খেলাম মেলাই ঘোল
চোখের জলে ভাসি এখন, খুঁজি মায়ের কোল।

চক্ষু বুজে বসে যখন ভাবি বরদায়
—দেহখানা বন্ধ ঘরে—দেশ পানে মন ধায়
মেলাই ছবি আঁকি, মনের পটে বুলাই তুলি
দুঃখ কষ্ট এই ফিকিরে অনেক কিছুই ভুলি ॥

মনে হ'ল যেন আমি পেরিয়ে বছর কুড়ি
ফিরে গেছি সিলেট আবার চড়ি, খেয়াল-ঘুড়ী।
বড়দিনের ছুটীর সময় নাইব নদীর জলে
বালুর চড়ায় বসে আছি, গামছা নিয়ে গলে।
লাল্লুমিয়ার দোকান থেকে খানিকটা নুন নিয়ে
ডান হাতে কুল, বাঁ হাতে নুন তাই মিলিয়ে দিয়ে
পঞ্চ সুধার সৃষ্টি যেন। নাই কিছুরই তাড়া
পরীক্ষা বা অন্য বালাই সামনেও নেই খাড়া।
অলস চোখে দেখছি চেয়ে এপার ওপার যাওয়া
খেয়া নায়ের চিরন্তনী ঢিমে তেতাল বাওয়া।
মহাজনী নৌকা চলে গদাই লস্করি
কমলানেবু বোঝাই করা, লোভ করে ফস্ করি

গণ্ডা দুয়েক সরিয়ে নেব, কিন্তু চাচা, শোনো
চেষ্টা কভু কোরো নাকো লাভ তাতে নেই কোনো।
ব্যাটারা সব লক্ষ্মীছাড়া খায় না কেন গুলি,
কোনো বাঙাল নেইকো বসে চোখে দিয়ে ঠুলি।
যতই কেন বাড়াও না হাত মহা সন্তর্পণে
ব্যাটারা সব চালাক অতি বৈঠার ঘা অর্পণে।
থাক্ সে কথা, গামছা কাঁধে নাওয়ার বেলা যায়
আবার বলি বদ্ধ ঘরে দেশ পানে মন ধায়।
খসরু-পূর্ব বছর সাতেক বসন্তে কি শীতে।
তোমার মাইজ্‌লা ফুফুর বিয়া হৈল চৌকিতে।
চৌকি আছে নবীগঞ্জের গায়ের সঙ্গে মিশে
সেখান থেকে কই পাঠালেন তোমার মেজ পিসে।
বাপরে সেকি বিরাট বপু উদর আগুাময়
মুখে দিলে মাখন যেন—জঠর ঠাণ্ডা হয়।
তোমার মা তো সেই দেশেরই যেথায় শুনি লোক
মাছ না পেলে ব্যাঙ-ভাজাতে ভোলে মাছের শোক।
শুধালে কি পাবে খবর তুমি তাঁহার কাছে
নউজ বিল্লা সত্যি খবর তোমার বাবার আছে।
তামাম জাহান খোদার কাছে সব কিছু নেয় মাগি
আমার পেটের আঁকুপাঁকু কই মাছেরই লাগি।
আরো একটা জিনিস খসরু সত্যি তোমায় বলি
যার লাগিয়া তৈরী আমি জানটা দিতে বলি
ভাবনা শুধু জানটা দিলে খাব কেমন করে
পেট আর জান তো একই দেহে আছে একই ঘরে
তোমার মায়ের দেশের জিনিস বড়ই চমৎকার
অর্ধ জগৎ ঘুরে আমি পাইনি জুড়ি তার—

চোঙ্গা-পিঠা আহা চাচা বোলব তোমায় কী?
যখন ভাবি ইচ্ছা হয় যে, 'রেজিগনেশন' দি।
ধ'রে সোজা পয়লা গাড়ী দেওর আইলে দি ছুট
চাকরি-বাঁধন রাজার শাসন সব কিছু ঝুট্‌মুট।
নামটা সত্যি হ'লে পরে খতির পাব মেলা
খানা-পিনা ধুম-ধামেতে কাটবে সারা বেলা।
চোঙ্গা-পিঠার সঙ্গে মলাই দেবে তোয়াজ করে
নয়তো দেবে হরিণ-শিকার হয়তো আছে ঘরে।
করিমগঞ্জের হরিণ সে যে বড়ই খান্‌দানি
খোরাক তাদের আমলকি ফল, ঝরণা-মিঠা পানি।
মহীমিয়ার বাবা ছিলেন বাঘা শিকারী
নুন আর মরিচ সঙ্গে নিয়ে—হাতীর সোয়ারী—
পাহাড় ঘেঁষে চলে যেতেন গভীর বনের পাশ
হরিণ শিকার খেতেন স্রেফ ঝাড়া তিনটি মাস।
সঙ্গীবিহীন অন্ধ ঘরে আসন্ন সন্ধ্যায়
সুর্মা নদীর দেশের পানে উদাসী মন ধায়।
চটছো হয়তো মনে মনে ভাবছ একি হ'ল
চাচার যে সব কাব্যি ছিল সব বুঝি আজ মল।
খাবার কথা কয় যে খালি আর কিছু নেই
তাও আছে ; তোমার পাতে সন্তর্পণে দেই।
সিলেটের উত্তরেতে সোজা গিয়ে চলে
চৈত্র মাসে, মিঠা রোদে, উজায়ে সুরমা,
গেয়ে সারি গান—
ধরিয়া পালের দড়ি করিবারে বারুণীর স্নান
মেলা দৃশ্য দেখিয়াছি।
স্তূপীকৃত ধান মণ মণ
দুই পারে

তার পরে
কী রুপালী ঝিলিমিলি সোনালী ধানের
যেন সে হীরার মালা হাজার হাজার
—কাতার কাতার
হেমাঙ্গীর স্বর্ণবক্ষে।
দীর্ঘ শর্বরীর
শিশিরে করিয়া স্নান এলায়েছে দেহ
আতপ্ত কিশোর রৌদ্রে॥
অগভীর স্বচ্ছ জল
বালুর বুলায় দেহ।
সে জলে ডুবায়ে পা
দেখিয়াছি
তালহীন শব্দহীন মাছের নাচন।
জলের নিচেতে।
উপরেতে নাচে রবিকর
হীরার নূপুর পরে।
হঠাৎ
কেন না জানি—
তলা থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ওঠে ছোট মাছ
কটিখানি কাঁপাইয়া নটরাজ দোলে
জলের উপরে মারে ঘা—
যেন কোন্ খেয়ালী বাদশা
টাকা নিয়ে খেলে ছিনিমিনি।
কখনো বা দেখিয়াছি
দ'য়ে মজে গিয়ে
একপাল ছোট মাছ চক্রাকার ঘুরপাক খেয়ে
—গরবা নাচের ছাঁদে—

ইচ্ছা-অনিচ্ছায়
অলখ মাদলে মেতে অজানা
সে কিসের নেশায়
ক্রমে ক্রমে উঠে উপরেতে ;—
মাছরাঙা ষ্ট্রিক্ট ডাইভার
পার্ফেক্ট টাইমিঙ
পড়িল বিদ্যুৎ বেগে হ'ল বজ্রাঘাত।
ছড়মুড় করে
এ ওর ঘাড়েতে পড়ে
মুহূর্তেই হ'ল অন্তর্ধান।
হয়তো বলিতে তুমি
তাতেই বা কী ?
এ সবের বর্ণনার কি বা আছে বাকি ?
হক্ কথা
তবু যতবার
বসিয়া বিদেশে
চোখ বুজে মনে করি যেন আমি স্থর্মা উজিয়ে
বরদার অবিচার অত্যাচার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
চলিয়াছি
তখনই
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে,
মনে হয় জানি জানি ঠিক জানি আমার দেশে
স্নিগ্ধ শান্ত শ্যামল বনানী
পশ্চাতে যাহার নীলগিরি যবনিকা
তাহার উপরে লিখা
শুভ্রতার শিখা
রূপার ঝরণা

নীলের উপরে সে যে কী বিচিত্র মিনা

পদমূলে

প্রস্তরে উপলে

কলকল উচ্চহাস্য

হাসিছে খাসিয়া নারী পাঁচশো সাতশো।

মধুরের ধ্যানে আমি বার বার ডুবে

যে রাগিণী দেখিয়াছি চতুর্দিকে যার স্বপ্রকাশ—

কাব্যে ছন্দে রূপ তার মূর্তি তার হ'ল না বিকাশ।

একি বিধাতার লীলা ?

রূপে গন্ধে রসে শ্বাসে পরিপূর্ণ এ রমণী হল মূক শিলা

তাই কি শিলেট ?

কাব্যে তার মাথা হেঁট !

কিন্তু চাচা মাফ করো, আজ কাজ আছে মোর মেলা

কাব্য-সাগর সেদিক পানে যায়নি জীবন-ভেলা—

চড়ায় লেগে আটকে আছে জোয়ার নাহি আসে

পুব হাওয়াও দেয়নি ঠেলা নৌকা নাহি ভাসে।

আগাগোড়া ভুলে ভরা জগা-খিচুড়ি

বয়স হ'ল হিসেব করে দেখি যে দুই কুড়ি।

চহল্ সালে উম্‌রে আজীজম্ গুজশ্‌ৎ

কালাপানির গারদ মাঝে ভালে হানি দস্ত।

তাই বলি

সুবুদ্ধি গোয়ালার কুবুদ্ধি হইল

ভাঁড়েতে রাখিয়া দুধ পীরকে ফাঁকি দিল

মাণিক পীর ভবনদী পার হইবার লা।

সেই পীরেরে স্মরণ করে তোমার

ছোট চাচা ॥

বরদা, গুজরাট ; ১৯৪৩

বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর
—খাটে, খেলে, যারা মধুর স্বপ্ন দেখে—
থাকিতে আমার নেই তো অরুচি কোনো।
তবুও এ-কথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নির্জনতার মাঝে
—শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা—
সেইখানে মম জীবন আনন্দঘন॥

আমার ক্ষুদ্র কুটীরের চারি পাশে,
বেঁধেছিল বাসা ঝরা পাতা দলে দলে—
নৃত্যচটুল, নিত্য দিনের আমার নর্ম-সখা
কোথা গেল সব? আমার আতুর হিয়া
সান্ত্বনা নাহি মানে।
হায় বলো মোর কি হবে উপায় এবে
জলে গিয়ে তারা করিত যে মোর সেবা,
এখন করিবে কেবা?

হেথায় হোথায় যেখানে যখন আমি
তন্দ্রামগন,—সুপ্তির কোলে আপনারে দিই ছাড়া
সেই পুরাতন নিত্যনবীন স্বপ্নের মায়া এসে
গুঞ্জরে কানে, চিত্ত আমার সেই ডাকে দেয় সাড়া।
এ স্বপ্ন নয়, ক্ষণেকের খেদ, উড়ে-যাওয়া আবছায়া
এ স্বপ্ন হানে আমার বুকে অহরহ একই ব্যথা
ছেলেবেলাকার স্নেহ ভালোবাসা, আমার বাড়ির কথা।

(শ্রমণ রিয়োকোয়ান)